সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক অন্বেষণ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আলিপনুর আহমেদ

তত্ত্বাবধায়ক

আশিস রায়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০২১

Curiginal

Document Information

Analyzed document	Alipnur Ahamed_Bengali.pdf (D103955985)
Submitted	5/6/2021 8:47:00 AM
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

ঘোষণা

আমি সৈয়দ **মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক অন্বেষণ** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আশিস রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণা পত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধীর জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

আলিপনুর আহমেদ

তাং : ১১.০৫.২০২১

(আলিপনুর আহমেদ)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE 'A'
ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩ । পশ্চিমবঙ্গ । ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর ....

তারিখ ....

CERTIFICATE

This is to certify that, Alipnur Ahamed has prepared his Ph.D. thesis entitled **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক অন্বেষণ** under my supervision for the award of Ph. D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the said thesis.

I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal.

Date : 11.05.2021

(Ashis Roy)
Supervisor
Department of Bengali
University of North Bengal

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক অন্বেষণ

বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)। তাঁর সৃষ্টির মূলে ছিল নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত দর্শন ও প্রকৃতি। মানুষ যেমন তার ছায়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনই ভাবে কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে হলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এসে পড়ে সমকালীন সমাজ বা দেশকালের কথা। এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে যন্ত্রণা, বেকারত্ব, কামনার নগ্ন প্রকাশ, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা বোধ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি ছিল সিরাজের এক স্বপ্নের দেশ, তাঁর মানস ভূমি। অদূরে দ্বারকা নদী, বিশাল এক নদী অববাহিকা। আর তারই পাশ থেকে হিজল ও উলুকাশের জঙ্গল এবং রাঢ়ের লালমাটি। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু—প্রকৃতি যেন ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে তাঁর শৈশবের পৃথিবীকে। তিনি প্রকৃতি থেকে নিয়েছিলেন জীবনের শিক্ষা। সাহিত্যিক সিরাজকে অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখেছি 'শিল্পী' সিরাজ তাঁর জীবনের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতি তাঁর ভালোলাগা ও ভালোবাসা। এই ভালোলাগাই তাঁর কিশোর মনে জন্ম দেয় গ্রামীণ শিল্প ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী হতে। বানক কুঠিতে রেশম শিল্প, তাঁত শিল্প তাছাড়াও বিভিন্ন কুটির শিল্পের কথা জানতে পারি। মাঠে-ঘাটে মেলায় পার্বণে ঘুরতে ঘুরতে সিরাজ আলকাপ দেখেছেন। আলকাপের প্রতি এক দুর্নিবার টান অনুভব করেছেন তিনি। আর কৌতুকভরা আলকাপকে মানুষ উপভোগ করতে ভালোবাসে কিন্তু মর্যাদা দেয় না। আলকাপের দলকে থাকতে হয় গরুর গোয়ালের সমগোত্রীয় জায়গায়। খেতে দেয় নিকৃষ্টমানের খাবার। রাত জেগে অভিনয় করা শিল্পীদের বরাতে জোটে নাম মাত্র মজুরি। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা নতুন কিছু প্রত্যাশা করেছিল আলকাপ গোষ্ঠীর কাছে। আসর ও দর্শকের মতিগতি বুঝে মুস্তাফা সিরাজ নতুন আঙ্গিকের কাপ রচনা করতেন ও নতুন

ভাবে তা পরিবেশন করা আরম্ভ করলেন। নতুন ধারার কাপ দর্শকরা প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে উৎসাহ ভরে গ্রহণ করল। সে সময় মুস্তাফা সিরাজ অন্য মানুষ। আলকাপ তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওস্তাদ ঝাঁকসু সিরাজকে আলকাপের পরিমণ্ডলে পেয়ে বেজায় খুশি। 'আল' কথার অর্থ বন্ধনী, 'কাপ' মানে নাটক। যে নাটক দর্শকের বন্ধনীর মধ্যে শুরু হয়, তাকে বলা হয় আলকাপ। আলকাপ জীবনের এই অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচনা করেছেন কালজয়ী উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ'।

'কিংবদন্তির নায়ক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সিরাজের পথ চলা আরম্ভ। যদিও 'নীল ঘরের নটী' (১৯৬৬) তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতার অমেয় স্বাক্ষর লক্ষ করি। যেমন—'অলীক মানুষ', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাসে চলে আসে আলকাপের স্মৃতির অনুষঙ্গ। এখানকার চরিত্রেরা যেন এক জীবন্ত বর্ণমালা। 'তৃণভূমি' উপন্যাসে দ্বারকা নদী গ্রাম বাংলার জীবন প্রবাহ রূপেই দেখা দিয়েছে। লৌকিক পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ গ্রাম জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতীকরূপেও নদীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা এই উপন্যাসে শিল্প স্বীকৃতি পেয়েছে। 'হিজল কন্যা' উপন্যাসেও সমাজ চেতনার নিদর্শন পাই। এখানে 'এক নয়া আবাদের কিসসা'-র কথা শোনাতে চেয়েছেন লেখক। সিরাজ উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের প্রকৃতির কাছে ফিরে না গেলে উদ্ধার নেই। প্রকৃতি থেকে যে যতদূরে যাবে ততোই তার সর্বনাশ। তাই 'বন্যা' উপন্যাসের নায়িকা লীলাও প্রকৃতির কোলেই বেড়ে উঠতে চেয়েছে। জটিলতা, গভীরতা, বিশ্লেষণ, চরিত্রের আত্মসমীক্ষা, বিষণ্ণতা, নানা রহস্যময় মুহূর্ত ফুটে উঠেছে 'বাসস্থান' উপন্যাসে। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীণ হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। এখানে সেইসব চরিত্রকেই দেখা পাই যারা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে চেয়েছে জীবনের স্বাধীন ভূমিতে। আসলে সিরাজ প্রত্যক্ষ করেছেন সময়ের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষকে। তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে বদলে যাওয়া মানসিকতাকে। তাই নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসে।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ হল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আলোচনা। সমকাল এবং প্রধান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা অগ্রসর হবে। গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়কে ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কথা ভেবেছি। গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা দানের জন্য ভূমিকা ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি

একজন স্রষ্টার জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যে জীবনবোধ গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সৃষ্টিতে। সেজন্য একজন সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন জানাটা খুব জরুরি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরে। পারিবারিক জীবনে সাহিত্যের আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা, আলকাপ দলে ঘুরে বেড়ানোর জন্য জীবনকে বিচিত্রভাবে অনুভব করতে শিখেছেন। প্রকৃতি তাঁর ভালোলাগা এবং ভালোবাসা। এই ভালোলাগা ও ভালোবাসার অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করলো, তা তাঁর উপন্যাস পাঠেই বোঝা যায়। উপন্যাস সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কীভাবে তাঁর জীবনবোধকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন—তা আলোচ্য অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : ইতিহাস ও রাজনীতি

সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ইতিহাস একটা গতিপথ তৈরি করে দেয়। একজন সাহিত্যিক ইতিহাস ও রাজনীতির নানা ঘটনা সাহিত্যের অঙ্গনে এনে তাকে সাহিত্যগুণে সম্পন্ন করে তোলেন। সৈয়দ

মুস্তাফা সিরাজ বিশ শতকের দুটি মহাযুদ্ধের পরিণতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, ফরাসি-ওয়াহাবী আন্দোলন ও দেশভাগের ছবি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই বিষয় সমূহ তাঁর উপন্যাসে অনায়াসেই উঠে এসেছে। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতির প্রসঙ্গ এনে যে একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের অবদান রেখেছেন-এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : নানা প্রসঙ্গ সন্ধানে

বিশ শতকের পঞ্চাশ বা পাঁচের দশক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে যন্ত্রণা, বেকারত্ব, কামনার নগ্ন প্রকাশ, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। এখানে আমরা বিষয়গুলিকে তুলে ধরবো নিম্নলিখিত ভাবে—

ক. দ্বন্দ্বময় জীবনের রূপকার : উপন্যাসের পালাবদলের আবহ সংগীতে উঠে এসেছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, বিষয় সবই আলাদা ধরনের। একদিকে তিনি যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অন্যদিকে তেমনই লোকনাট্য দল 'আলকাপ' দলের মাস্টারও ছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও যে মানুষ, তাদেরও এক প্রবল জীবন আছে, যা প্রেমে-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে, লোভে-ঈর্ষায় দ্বন্দ্ব মথিত তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এই ধরনের উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'তখন কুয়াশা ছিল', 'অরূপ রতন', 'বিভ্রান্ত' 'প্রেম-ঘৃণা-দাহ', 'একান্ত গোপনে', 'রেশমির আত্মচরিত' প্রভৃতি। আলোচ্য অনুচ্ছেদে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মানুষের জীবনকথামূলক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. রাঢ় জীবনের রূপকার : বাংলা উপন্যাসে লোককথা, লোকজ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং শিল্পসম্মতভাবে। বঙ্কিম পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাস নানাভাবে বাঁক পরিবর্তন

করেছে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে এসেছে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এরই প্রেক্ষিতে সিরাজের উপন্যাসে উঠে এসেছে রাঢ় ভূমির কথা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম, বেড়ে ওঠা রাঢ়ের মাটি-পাথর, নদী-ল্যান্ডস্কেপ, বিশ্বাস-সংস্কারে, মন্ত্রে-তন্ত্রে, আদিম কামনা-বাসনায়, খিধে-ক্ষুৎ পিপাসায় ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে আছে উপন্যাসে। প্রকৃতি ও মানুষের আদিম সত্তার টানে রাঢ় ভূমির মানুষদের প্রেম ও যৌনতা, স্নেহ বা মাতৃত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্য, আত্মপ্রাধান্য ও আত্মরক্ষা বা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে যায় সিরাজ তাই দেখাতে চেয়েছেন উপন্যাসে। 'বাসস্থান', 'নদীর মতন', 'জানমারি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাস তার উদাহরণ।

গ. প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষ : নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা 'ইবলিশ' তথা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্মভূমি ও সেই বাংলার প্রকৃতির প্রতি ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই প্রকৃতির টানেই বারবার ফিরে এসেছেন নিজস্ব পরিচিত জগতে তথা মাতৃভূমির মাটিতে। আর সেই পরিচিতির মধ্য থেকেই কিছু বিস্ময়কর ঘটনা আবিষ্কার করেছেন ও পাঠককে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। আবার একেবারে সাধারণ ঘটনাকেও তিনি জীবন্তরূপ দিয়েছেন। 'গোপনে নির্জনে', 'নির্জন গঙ্গা', 'জনপদ জনপথ', 'নিষিদ্ধ অরণ্য', 'নিলয় না জানি' প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রকল্পের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. মিথ ও ইতিহাস : সিরাজের কথাসাহিত্যের সমগ্র বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে সত্যই অনন্য। শিল্পকলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কোনো কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। মিথ ও লোককথা স্বাভাবিকভাবেই মিশে গেছে সিরাজের কিছু সেরা উপন্যাসের সাথে, তাঁর জীবনের সাথেও বলা যায়। এই অনুচ্ছেদে 'অলীক মানুষ', 'নীল ঘোড়া', 'নিষিদ্ধ অরণ্য', 'রেশমির আত্মচরিত', 'বাসস্থান' প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হবে মিথ ও লোককথার অনুষঙ্গ।

ঙ. নিম্নবর্গের অবস্থান : বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদে ব্রাত্য-জীবনের চিত্র বেশ গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ব্রাত্য সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পে ব্রাত্য-জীবনের রূপরেখা নানাভাবে অঙ্কিত। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্রাত্য-মানুষ এলো ব্যাপক ভাবে। তারা পেল মানুষের মর্যাদা। তাদের প্রতি শতাব্দী-পুঞ্জিত অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের

বিরুদ্ধে লেখকরা সোচ্চার হলেন। আর্থ-সামাজিক এই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ উপন্যাসে ব্রাত্য-জীবনকে যেভাবে তাঁর দৃষ্টিতে দেখেছেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিক

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দু-দুটি মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ভারতবর্ষেরও এযাবৎ স্বাভাবিক জীবনচর্যাকে বিধ্বস্ত করে। এছাড়াও দেশ ভাগ বাঙালি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাই এই সময়কার উপন্যাসে অবধারিত ভাবে উঠে আসে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। তাই সিরাজের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের অবদান যেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—তেমনই তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনাধারাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল বাশার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র প্রমুখ। লেখক হিসেবে সিরাজ সমসাময়িক লেখক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এঁদের পাশাপাশি তিনি তাঁর উপন্যাসে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি নির্ণয় করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলী অন্বেষণ

সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখার একটা নিজস্ব শৈলী আছে। প্রত্যেক লেখকই লেখার মধ্যে নিজস্ব আঙ্গিক ও শৈলী ব্যবহার করে থাকেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শৈলী ব্যবহার

করেছেন, সিরাজের উপন্যাসের শৈলী তার থেকে আলাদা। আবার লেখক নিজস্ব মতামত অনুযায়ী দীর্ঘ জীবনের লেখনীর মধ্যেও ভিন্ন শৈলী ব্যবহার করেও থাকেন। বঙ্কিমের যেমন 'রজনী' আর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শৈলী পৃথক, তেমনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' আর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের শৈলী আলাদা। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে যে ভাবনা ব্যক্ত করতে চান তা প্রকাশের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলী প্রয়োজন। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে দেশ কালের বিস্তৃত পরিসরে বৃহত্তর জীবন সত্যকে ভাব-প্রধান বক্তব্যে উপস্থাপন করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীর গদ্য শৈলী ব্যবহার করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসগুলি থেকে তাঁর ভাবনা উপস্থাপনের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলী নিয়ে আলোচনা করে দেখাবো।

উপসংহার

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের এক সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনেই উপসংহারের পরিকল্পনা। ঔপন্যাসিক হিসেবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কতখানি সফল তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়ে।

নিবেদন

গবেষণার প্রায় অন্তহীন অন্বেষণ পথে হেঁটে চলা জীবনের অন্যতম শিক্ষণীয় এক অধ্যায়। দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত থেকেছে নানা প্রতিকূলতা, নানান চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘতর হয়েছে পথ, সমৃদ্ধ হয়েছি অভিজ্ঞতায়। দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত থেকেছেন সুজনেরা। বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। যাঁদের সাহায্য ছাড়া, আরম্ভ থেকে পরিণতির পথে এই যাত্রা কখনোই সম্ভবপর হয়ে উঠত না। আজ ক্ষণিকের এই যাপন সেই সমস্ত স্বজনকে স্মরণ করে, যাদের সাহচর্যে মুহূর্তগুলি হয়েছে শিক্ষণীয়, যাঁদের সহযোগিতায় গবেষণা হয়েছে ঋদ্ধ, যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন আরও দুটি পা—তাঁদের সবাইকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয়ের জন্যই আজ আমার উচ্চশিক্ষার পথকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক ইচ্ছার ফলই আমার এই গবেষণা পাঠ। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার সুবিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের তীরে আমি বরাবর থেকেছি মগ্ন দর্শক হয়ে। তিনি চিনিয়েছেন সাহিত্য সমুদ্রের নানান মণিমাণিক্য। তাঁর জ্ঞানগর্ভ নিরলস আলোচনা আমাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে, স্বাধীন গবেষণায় উদ্দীপ্ত করেছে। আজ এই সুবাদে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

প্রদীপ জ্বালাবার আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। এক নগণ্য শিক্ষার্থীকে সলতে করে তুলবার কাজটি যাঁরা যত্ন করে করেছেন আভূমিনত শ্রদ্ধা জানাই, আজ এই অবসরে, সেই মানুষগুলিকে। আমার স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষক ড. রেজাউল করিম মহাশয় এবং ড. দীপক কুমার রায় মহাশয় আমাকে প্রথম দিন থেকেই জ্ঞানলাভ, বিশ্লেষণ ও অন্বেষণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সর্বদাই কৃতজ্ঞতা ভাজন করেছেন। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, অধ্যাপক ড.

নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. ঊর্বী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, অধ্যাপক ড. সূর্য লামা মহাশয়, অধ্যাপক ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা পাল মহাশয়া প্রমুখ আমার সকল সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার দীর্ঘ গবেষণা কর্মের শরীক হয়ে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে গবেষণা কর্মটিকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়ে আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছেন।

নাম গোত্রহীন ছোট্ট চারাগাছটি প্রতিদিন বেড়ে ওঠে প্রকৃতির রূপ আর রসকে সম্বল করেই। প্রকৃতির সেই দানেই বেড়ে ওঠে চারাগাছ। জন্মের পর থেকেই প্রতিমুহূর্তে আমাকে লালন করেছেন আমার যে জন্মদাতা-জন্মদাত্রী; আমাকে আগলে রেখেছেন শত প্রতিকূলতা থেকে, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আমাকে এগিয়ে চলতে সক্ষম করেছেন, আমার সেই বাবা-মা'কে জানাই আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আমার জীবনে বেড়ে ওঠা, শিক্ষালাভ ও স্বীকৃতির পথে তাঁদের ত্যাগস্বীকার নিরন্তর আলোকবর্তিকা হয়ে আমাকে সাহায্য যুগিয়েছে। স্ত্রী মাম্পি খাতুন নীরবে সাংসারিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রাত্যহিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না পারলে গবেষণার দুরূহ পথে আমার পথ চলা সম্ভবপর হতো না। সে যুগিয়েছে সাহস, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তাকে আমার অন্তরের ভালোবাসা জানাই।

আমার কর্মস্থল পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অর্ণব বন্দোপাধ্যায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমার গবেষণার অগ্রগতি, ফলাফল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সাহস যুগিয়েছেন, বিভিন্ন সুপরামর্শ দানে বাধিত করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। কলেজের সহকর্মী ড. বিশ্বজিৎ রায়, পূর্বা চক্রবর্তী সকলেই আমার কাজে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পারস্পরিক আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অনন্ত কৌতূহল আর নিরন্তর প্রশ্নবাণ আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাবার অন্যতম পাথেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে আলোচনা আমায় সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন খোঁজ ও বিশ্লেষণ বিবিধ নতুন পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান যুগিয়েছে। সমস্ত কিশলয়কে তাই আজ এই অবসরে আমার তরফে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই নকশালবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সমীরেন্দ্র সরকার মহাশয়, অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার পালুয়া মহাশয়, ড. নমিতা চক্রবর্তী মহাশয়া প্রমুখ। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। বিবিধ প্রতিকূলতা পেরিয়ে, উজান ঠেলে মোহনায় উপস্থিত হবার এই যাত্রায় তাঁরা আমাকে যুগিয়েছেন নিরন্তর উদ্দীপনা। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের খোঁজ-খবর হোক বা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—সর্বদাই তাঁরা আমাকে করেছেন সমৃদ্ধ, করেছেন কৃতজ্ঞতা ভাজন। ভাই গোলাপ হোসেনকে জানাই আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। দীর্ঘ গবেষণা কর্মের বাঁকে বাঁকে তারা উপস্থিত থেকেছেন একান্ত সুহৃদ হয়েই। তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং নিরন্তর উৎসাহ ছাড়া আমার এই গবেষণা কর্ম কখনোই সম্পূর্ণ হয়ে উঠত না। তাদের ভবিষ্যত জীবন হয়ে উঠুক সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সার্থক।

সভ্যতার পিলসুজ বহন করে চলেন যে মানুষগুলি, সততই থাকেন যারা অন্ধকারে, গবেষণা কর্মের এই কাজে, আজ আমার ঋণ স্বীকার-অস্বীকৃতির অন্ধকার আর আড়ালেই থেকে যাওয়া সেই সমস্ত মানুষগুলির প্রতিও। গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতে হয়েছে বহু গ্রন্থাগারে। তথ্যের সন্ধানে জ্বালাতন করতে বাধ্য হয়েছি বহু কর্মী আধিকারিককে। বিরক্তি নয়, অনায়াস দক্ষতায় আর পরম মমতায় সেই সমস্ত মানুষগুলোর কাছ থেকে পেয়েছি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য, গ্রন্থ প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, নকশালবাড়ি কলেজের গ্রন্থাগার এবং কর্মস্থল পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কথা। রাশি-রাশি প্রতিকূলতার মধ্যেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও কর্মীরা প্রতিনিয়ত তাঁদের সাহায্যের হাত হাসিমুখে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বঞ্চিত করেননি কোনো দিন। তাঁদের সকলের সাহায্য সহযোগিতার ফসল আমার এই গবেষণা কর্ম। তাঁদের জানাই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। এছাড়াও সাহায্য পেয়েছি সমকালের জিয়ন কাঠি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নাজিমুল ইসলাম মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। গবেষণাপত্রটির মুদ্রণ কাজে ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার এর পরিশ্রম স্মরণীয়। তাকে জানাই ভালোবাসা, জানাই শুভেচ্ছা।

দীর্ঘ এই গবেষণা কর্মের যাত্রাপথ সম্পূর্ন নয়, সমাপ্তির দিকে যাত্রা নয়। বরং এই দীর্ঘ যাত্রাপথ আমাকে চিনিয়েছে পথ চলার আনন্দ, চিনিয়েছে আলোর সন্ধানে পথ চলার নিরন্তর

আবাহনকে। আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি চরৈবতি মন্ত্রকে। গবেষণা কর্মের এই যাত্রাপথ থেকে আমার প্রাপ্তি এটুকুই। অভিজ্ঞতা আর সহযোগিতার দানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথে, ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে চলার এই পথে রয়ে গেল কিছু ব্যক্তিগত ত্রুটি, রয়ে গেল কিছু অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি, বহু মানুষ রয়ে গেলেন উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উর্ধ্বে, তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আজকের এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব শেষ করছি।

সকলের কাছে প্রার্থনা করছি শুভাশিস ও আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

আলিপনুর আহমেদ

তারিখ : ১১.০৫.২০২১

(আলিপনুর আহমেদ)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:	১-৪
প্রথম অধ্যায়	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি	৫-৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : ইতিহাস ও রাজনীতি	৫৫-৭৯
তৃতীয় অধ্যায়	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : নানা প্রসঙ্গ সন্ধানে	৮০-১১৫
চতুর্থ অধ্যায়	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিক	১১৬-১৪২
পঞ্চম অধ্যায়	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলী অন্বেষণ	১৪৩-১৮০
উপসংহার	:	১৮১-১৮৭
পরিশিষ্ট-১	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনপঞ্জি	১৮৮-১৯০
পরিশিষ্ট-২	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রন্থতালিকা	১৯১-২০৫
পরিশিষ্ট-৩	: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বংশতালিকা	২০৬-২১০
গ্রন্থপঞ্জি	:	২১১-২৪২

ভূমিকা

আমার এই গবেষণা কাজে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যচর্চা, রাঢ়ের সামাজিক অবস্থান, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষ, মিথ ও ইতিহাস, নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনকথা বিষয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। আমরা জানি বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। জীবৎকালেই তাঁকে তারাশঙ্করের সার্থক উত্তরসূরি বলে অনেক সমালোচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে হয়েছে সিরাজ স্বভাবে এবং মেজাজে ছিলেন ভিন্ন ধরনের লেখক; তাঁর সৃষ্টির মূলে ছিল নিজস্ব অভিজ্ঞতা-জাত দর্শন ও প্রকৃতি। বিশ শতকের পঞ্চাশ বা পাঁচের দশক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে যন্ত্রণা, বেকারত্ব, কামনার নগ্ন প্রকাশ, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। যে অদৃশ্য তাঁতি আমাদের জীবনের তাঁতে সাদা-কালো বা রঙিন সুতো বুনে চলেছেন তার খবর সিরাজ দিয়েছেন। কখনো তিনি নিজে বক্তা, কখনো উপন্যাসের চরিত্রের ঘটনার ব্যাখ্যাতা। শেষপর্যন্ত সিরাজ উপন্যাসে মানুষগুলির রক্ত মাংসের চেহারাকে, হৃদয়ের রক্তমাখা শিরাকে ধরতে চেয়েছেন।

পেশায় সাংবাদিকতার কারণে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তব পটভূমি, জীবন-যন্ত্রণা; আর শিল্পীসুলভ সংবেদনশীল মন থাকার কারণে তিনি জীবন-যন্ত্রণার বা জনজীবনের মর্মমূল পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলেন। তাই লোকায়ত জীবন ও গ্রামজীবন তাঁর রচনায় প্রাণ পেয়েছে। পল্লি জীবনও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। সিরাজের উপন্যাসে মুসলমান সমাজ ও জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ প্রকৃতি, গ্রামীণ মানুষ জীবন্তরূপ ধারণ করেছে তাঁর উপন্যাসে। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপাদান ব্যবহার করেছেন। রহস্য কাহিনী ও রোমান্সধর্মী কথাসাহিত্য রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সিরাজের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সাহিত্যিক আবুল বাশার লিখেছেন—“সিরাজদা এবং আমি, দুজনই মুর্শিদাবাদী। তবে সিরাজদার মুর্শিদাবাদ রাঢ়—মুর্শিদাবাদ আর আমার মুর্শিদাবাদ

রাঢ় বরেন্দ্র তথা ভড়—মুর্শিদাবাদ। ভড় হচ্ছে নিম্ন পদ্মা-ভূমি অঞ্চল। সিরাজদার গঙ্গা। আমার ভৈরব-পদ্মা। সিরাজদার রাঢ় হিন্দু-প্রধান। আমার ভড় মুসলিম-প্রধান। ফলে লোকাচার ও সংস্কৃতির দিক থেকে এই দুই মুর্শিদাবাদের পার্থক্য আছে। সিরাজদাই একমাত্র লেখক; যিনি এই পার্থক্য বুঝতেন। কারণ, সারা মুর্শিদাবাদ চষেফেরা মানুষ তিনি।"[১]

মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাকে অনেকে ভাগীরথীও বলে। এই নদীর জলধারা মিশেছে সেখানকার অনেক নদীতে এবং জেলার উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানা এই নদীদ্বারা বেষ্টিত। গঙ্গার আর এক স্থানীয় নাম পদ্মা। পদ্মার ওপারে একসময় ছিল পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ। তাঁর উপন্যাসেও পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান দেখার দৃশ্য আছে—"বলে, হুই পাকিস্তান।"[২] মুর্শিদাবাদের প্রধান নদী ভাগীরথী। পদ্মার মতো ভাগীরথীও গঙ্গারই ধারা—একই নদীর দুটো নাম। সিরাজ সাহেব লিখেছেন—"জেলার ভূগোলে লেখা আছে ভাগীরথী, লোকে বলে গঙ্গা।"[৩] মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তম নদী জলঙ্গি। এছাড়াও আছে ময়ূরাক্ষী, ভৈরব, বাঁশলই, পাগলা, বাঁকি, দ্বারকা বা বাবলা, শিয়ালমারি ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচীন জনপদগুলিতে প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনো পিরের সমাধি রয়েছে; মাজার, দরগা, আস্তানা নামে এগুলি পরিচিত। সিরাজ লিখেছেন—"হেই বাপ পির মাদারশা, মিলিয়ে দিস। এক পেছে বাতাসার শিন্নি দেব তোর দরগায়।"[৪] এইসব মাজার বা দরগার সাথে অনেক কিংবদন্তি, অলৌকিক মাহাত্ম্য জড়িয়ে থাকে। পিরের মাজার ঘিরে মৃত্যু বার্ষিকীতে উরস বা মেলা হয়; ফকির দরবেশরা আসেন। মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের মানুষরাও মাজারে মানত করে; এসবও এক ধরনের সম্প্রীতির ল্যান্ডমার্ক। পির-ফকিরদের সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ হল আঠারো শতকের সুফি সাধক ও কবি সৈয়দ মুর্তজা। প্রকাশ দাস বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"ভৈরবী আনন্দময়ীকে সাধন সঙ্গিনী করায় তাঁর নাম হয়ে যায় সৈয়দ শাহ মুর্তজা আনন্দজি। মুর্তজার সমাধি ছিল ছাপঘাটিতে। পরে সেটি ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হলে ভক্তেরা ছাপঘাটির স্মৃতিবিজড়িত মাটি এনে সুতি ১ নং ব্লকের গ্রাম হারুয়ায় প্রতীকী সমাধি নির্মাণ করেন। প্রতিবছর হিজরি রজব মাসে সেখানে এই সাধক কবির স্মরণে উৎসব পালিত হয়।"[৫]

প্রথম অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পারিবারিক জীবন; তাঁর বাবা-মায়ের সাহিত্যচর্চা এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছি। সিরাজের বিচিত্রমুখী কাজের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে। তিনি সংস্কৃতি জগতেও যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। বিশেষত ‘আলকাপ’-এ যোগদান করে সেখানে তিনি ‘সিরাজ মাস্টার’ হিসেবে জনখ্যাতি পেয়েছিলেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য দলের কর্মী হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পারি। তাঁর সাহিত্যচর্চাকে আমরা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গোয়েন্দা গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ পর্যায়ভুক্ত করে তুলে ধরেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সিরাজের উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতির কথা তুলে ধরেছি। সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ইতিহাস একটা গতিপথ তৈরি করে দেয়। সিরাজ ইতিহাস ও রাজনীতির নানা ঘটনা সাহিত্যের অঙ্গনে এনে তাকে সাহিত্যগুণে সম্পন্ন করে তুলেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশ শতকের দুটি মহাযুদ্ধের পরিণতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ফরাসি-ওয়াহাবী আন্দোলন ও দেশভাগের ছবি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর তা তাঁর উপন্যাসে অনায়াসেই উঠে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সিরাজের উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ সন্ধান করা হয়েছে। এখানে আমরা তুলে ধরেছি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনার কথা। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে রাঢ় বাংলার জীবন, সেখানকার মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। প্রেম-প্রকৃতি মানুষের চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে মানুষের ছিন্ন স্বপ্ন, রক্ত, ঘামের কথা। মিথ ও ইতিহাস প্রসঙ্গে এসেছে মানুষ কীভাবে মিথের ডানায় ভর করে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে। ব্রাত্য জীবনের প্রসঙ্গ এনে আমরা তুলে ধরেছি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের চরিত্রের ব্রাত্য জীবনকে। তারা শুধুমাত্র সামাজিক দিক থেকেই ব্রাত্য নয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকেও।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে প্রবেশ, ঘটনার ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে তাঁর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যিকদের

থেকে তাঁর স্বতন্ত্রতা দেখানো হয়েছে উপন্যাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল বাশার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়ে সিরাজের উপন্যাসের শিল্পরূপ তুলে ধরেছি। সেখানে উঠে এসেছে তাঁর সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শিল্পজাল। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে দেশকালের বিস্তৃত পরিসরে বৃহত্তর জীবন পথকে ভাবপ্রধান বক্তব্যে উপস্থাপন করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীর গদ্য শৈলী ব্যবহার করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসগুলি থেকে তাঁর ভাবনা উপস্থাপনের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিশিষ্ট-১ এ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনপঞ্জি তুলে ধরা হয়েছে। পরিশিষ্ট-২ এ তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্যিকের গ্রন্থ তালিকা। পরিশিষ্ট-৩ এ তুলে ধরা হয়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বংশতালিকা। এই সব দিকগুলি তুলে ধরাই আলোচনার উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র

১. বাশার, আবুল : সম্প্রীতি, স্মরণ সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১২, পৃ. ৩১

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৮৬

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৬১

৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'হিজল কন্যা', সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ৮

৫. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদ চরিতাভিধান, আকাশ, ২০১৪, পৃ. ২০৭

প্রথম অধ্যায়

“সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি”

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি লেখাপড়ার মানুষ। মা আনোয়ারা বেগমও ছিলেন লেখিকা। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে সুদূর প্রসারী। সিরাজের ঠাকুরদাদা ছিলেন মৌলবি। মৌলবি সাহেব বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত পুরোপুরিভাবে খোশবাসপুর গ্রামের বাসিন্দা হয়ে পড়েন। এই গ্রামটিই ছিল সিরাজের স্বপ্নের দেশ, তাঁর মানসভূমি। তিনি প্রকৃতি থেকে নিয়েছিলেন জীবনের শিক্ষা। দ্বারকা নদী, নদীর বিশাল অববাহিকা আর তারই পাশ থেকে হিজল ও উলুকাশের জঙ্গল এবং রাঢ়ের লাল মাটি। আর এই প্রকৃতির মায়াই তাঁকে মায়ের মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব করেছে–“ওই বয়সেই মায়ের মৃত্যু হল। কিন্তু এ মৃত্যু আমাকে ছুঁল না। প্রকৃতি আমাকে কেড়ে নিয়েছেন কবে আমার আসল মা যে তিনিই!”[১]

সিরাজের ছোটবেলা থেকেই নানা ধরনের বই-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। এভাবে পড়তে পড়তে তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহ জাগে। তিনি ‘অঙ্কুর’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকাও করেছিলেন। যদিও এই পত্রিকাটি বের করতে সহায়তা করেছিলেন তাঁর পিতৃ-বন্ধু জগদ্বন্ধু দাশ মহাশয়। পত্রিকাটিতে সিরাজ নিজেই ছবি আঁকতেন এবং লিখতেন। পরবর্তীতে নিখিল ভারত পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল ‘অঙ্কুর’। কিন্তু সিরাজের বন্ধু কিরীটিভূষণ দত্ত যে তথ্য দিয়েছেন তার সাথে কিছুটা অমিল রয়েছে–“১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গোকর্ণ শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির পাঠাগার কর্তৃপক্ষ একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করার আয়োজন করে। পত্রিকাটির নামকরণ হয় অঙ্কুর। সিরাজ স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে।”[২] শৈশব থেকেই তিনি যে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন–একথা বলাই বাহুল্য। সিরাজের স্ত্রী হাসনে আরা সিরাজের কথায় আমরা জানতে পারি সিরাজ সাহেব চমৎকার বাঁশি বাজান। তিনি দীর্ঘদিন আলকাপ দলে ছিলেন। নাচ-গান ও অভিনয়ে গ্রামের পর

গ্রাম মাতিয়ে রাখেন। অনেকের মতে, কলকাতার তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলতে তিনি আলকাপে মগ্ন হয়ে যান। এই সময়কালেই হাসনে আরা সিরাজের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও বিবাহ হয়। স্ত্রীর কাছে সাহিত্যিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে তিনি পুনরায় লেখালিখি শুরু করেন। 'ইবলিস' ছদ্মনামে লিখলেন 'কাঁচি' নামক ছোটগল্প। গল্পটি বেরিয়েছে বহরমপুর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পত্রিকা 'সুপ্রভাতে'; এখান থেকেই তাঁর সাহিত্যের জয় যাত্রা আরম্ভ। আলকাপ অনুরাগী শিক্ষিত যুবক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঝাঁকসু ওস্তাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং তিনি আলকাপ দলের প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেছেন। সিরাজের গান বাঁধা, সুর করা ও আলকাপের তাৎক্ষণিক সংলাপ ও ছড়া বানানোর দক্ষতা দেখে ওস্তাদ তাঁকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আসর ও দর্শকের মতিগতি বুঝে সিরাজ নতুন আঙ্গিকের কাপ রচনা করেছেন এবং তা নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। নতুন আঙ্গিকের 'আলকাপ' দর্শকেরা প্রবল উৎসাহভরে গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে আলকাপ সিরাজের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে আলকাপের এই পরিমণ্ডলে পেয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসু অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। 'আল' কথার অর্থ 'বন্ধনী'; 'কাপ' মানে 'নাটক'। অর্থাৎ যে নাটক দর্শকের বন্ধনীর মধ্যে শুরু হয়, তাকে বলা হয় আলকাপ। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী বলেই সিরাজ প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানকার জনগোষ্ঠীর বিচিত্ররূপ। বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ; আর ছিল মুসলমান চাষি-বাগদি-গোয়ালাদের মধ্যে সংঘাত। লক্ষণীয় বিষয় মেয়েরাও এই বিবাদে জড়িয়ে যায়। নারীর উপর অধিকার নিয়ে একই অঞ্চলে দুজন দাপুটের অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষও ঘটত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর জেলায়, গ্রামে এসব দেখেই বড়ো হয়েছেন, অভিজ্ঞ হয়েছেন। আর এই অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে।

সিরাজ সাহেব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ সর্বত্রই তাঁর পদধ্বনি লক্ষ করা যায়। আমরা গবেষণার কাজে তাঁর কিছু কবিতার সন্ধান পেয়েছি। তাছাড়াও কিছু কবিতা হয়তো আছে, সেগুলি গ্রন্থাকারে এখনও প্রকাশ পায়নি। আমরা যে ১৪টি কবিতা হাতে পেয়েছি, সেগুলির মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো তাঁর কবিপ্রতিভা ও গঠন প্রক্রিয়া।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘শেষ অভিসার’ কবিতাটি ১৯৫০ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটির প্রকাশভঙ্গীতে লক্ষ করা যায় কবি জীবনানন্দের পদধ্বনি। এখানে সিরাজ তাঁর স্বপ্ন-সাধ পূরণ না হওয়ার কথা বলেছেন। পৃথিবীর হরেক বিপন্নতায় মানুষের বিশ্বাসের জগতে যখন চিড় ধরে; তখনই কবি মনে ‘শেষ অভিসার’ মতো কবিতার জন্ম নেয়। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর অসুখের সময় যখন রণ-রক্ত-সংগ্রাম সবকিছু আনন্দ–প্রাপ্তিকে নাশ করতে উদ্যত; তখন সমকালীন অস্থির জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কবি চোখ ফেরান তাঁর বিশ্বাসের ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে; শেষ অভিসার সেই বিশ্বাসের অন্য আর এক নাম। কবিতাটি শুরু হয়েছে–

“তারও মনে সাধ ছিল স্বপ্ন রচনার।”[৩]

আবার কিছুক্ষণ বাদে জানিয়েছেন–

“যে এলো সবার শেষে জীবনের শিল্প রচনায়।” (ঐ)

কবিতাটিতে প্রকৃতির বিবরণ এসেছে এইভাবে–

“এ মাঠের ধানে তবু
এ পাখির গানে
এখনও রঙিন মেঘে লেগে আছে ইতস্তত।” (ঐ)

কবি সিরাজ জন্ম বর্ষ উপলক্ষে রচনা করেন ‘পল রোবসনকে’ কবিতাটি। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। কবিতাটিতে নানাভাবে এসেছে জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র–প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ ক্ষুধা, আহত নর-নারী, বন্যা, শ্বেত পারাবত, জনগণ অপরাজিত। কবিতাটি শুরু হয়েছে রোবসনের একটি গানের উদ্ধৃতি দিয়ে–

‘All of us in one heart’

আবার কবিতাটি অন্তহীনতার দিকে হাত বাড়িয়ে শেষ হয়েছে–

"সত্যি আমরা এই নতুন জন্মের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছি
বলছি পরস্পরকে, ভয় নেই।"[৪]

এই কবিতাটি পাঠ করে খুব সহজ ও মোটা দাগের ছবি মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতাটির মধ্য দিয়ে সিরাজের সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকবার স্পৃহা ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

'নির্গতিক' কবিতাটি সিরাজ রচনা করেছিলেন ১৯৫৯ সালে। কবিতাটিতে তিনি দেখিয়েছেন একরাশ ফুল শুকিয়ে বা পড়ে গেছে, তার জায়গায় সরু সরু অনেক কীট পোকা নড়ছে। আবার এর সাথে তিনি দেখিয়েছেন একটি বাইশ বছরের ছেলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে অচরিতার্থ প্রেমের জন্য। কবির উপলব্ধি—

"ছাদের নীল আকাশের নিচে আলিসায় ভর করে
দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমাকাংখিনীদের।"[৫]

সিরাজের 'বুড়ো হাতিটা' কবিতাটি বেরিয়েছে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দেওয়ালে একটি বুড়ো হাতির ছবি দেখে কবিতাটি রচনা করেছেন। তাঁর বুড়ো এবং রুগ্ন ছবি দেখে কান্না পেয়েছিল। কবিতার মধ্য দিয়ে সেই হাতির ছবি নেমে এসে সেই ঘরের মেঝেতে শায়িত মানুষের শরীরে মিশে গেছে। হাতির প্রাণ আর মানুষের প্রাণ—সবটাই আসলে প্রকৃতির প্রাণ। এই হাতির ছবির পাশে ছিল একটি তীরবিদ্ধ টিকটিকি। শেষপর্যন্ত সেখানে তিনটি ছবি ঠাঁই পায় হাতি, টিকটিকি এবং মানুষ।

'মেয়েটি' শীর্ষক কবিতাটি বেরিয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে 'একক' পত্রিকায়। কবি মেয়েটির মধ্যে যেমন একটি নারী ব্যক্তিত্ব এনেছেন তেমনই অন্যদিকে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ কবিতাটি জুড়ে রয়েছে প্রকৃতিময়ী মেয়েটির কথা। কবিতাটির বিষয় উঠে এসেছে এইভাবে—

"মেয়েটির নিঃশ্বাসের সুদগ্ধ বাতাস
অনেক ঘুম ফুলের ভাঙায় দোলায় কি বিপর্যয়ে দ্যাখো।"

কিংবা

"অবশেষে নদীর উজানে হেঁটে আকাশকে পাশে পাশে এনে
মেয়েটি দাঁড়ালো দ্যাখো, করবী ফুলেই গোছা গোছা চুল
দু কাঁধে বাতাসে দোলা রাত্রি দু'টি-যে পদ্ম দিনেই
সততই ফুটে থাকে মুখে তার। পায়ের পাতায় আলতো
পথ চলা ধুলোর নিবিড় রঙ আলতাকে ঢেকেছে খানিক।"[৬]

সিরাজের 'যাবার ইচ্ছে ছিল' কবিতায় দেখি নীল দেওয়ালের উপর এঁকে রাখা ময়না ডাঙার মাঠের ছবি। পুরনো সময়, হারানো শৈশব, পুতুল ও ভাঙা রেলগাড়ি। জীর্ণ বাড়ি ভেঙে গেলে নীল দেওয়ালের উপরের ছবিও ভেঙে পড়ে; তবুও সে ছবি অক্ষত থেকে যায়।

লোকনাট্য আলকাপের স্মৃতি নিয়ে সিরাজ রচনা করেছেন 'এখনো ভাবতে অবাক লাগে' কবিতাটি। কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। কবিতাটিতে উঠে এসেছে নানারূপ, নানা অনুষঙ্গ। এই কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং তা পরিবেশিত হয়েছে মুখের কথায়–

"মধ্য রাতে দরজা নড়ে গাঁ-গেরামের দোহারকিরা
আকাশ মুখো চুল ঝাঁকিয়ে সেই ধুয়ো গায় ভালোবাসি।"

কিংবা

দীর্ঘ কেশী আফ্রোদিতি বানিয়েছিলাম যত্ন করে
বলেছিলাম ভালোবাসি এখন ভাবতে অবাক লাগে।"[৭]

সিরাজের 'বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে' কবিতাটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের শারদ সংখ্যার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির বিষয়বস্তু একটু অন্যরকম–

"বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে
নদীর পোলের নীচে হাহাকার।"

কিংবা

নদীটা খুবই গভীর, ভগ্ন সেতু , ট্রেনের কঙ্কাল
এ সবই নিসর্গে প্রতিসারিত এবং
অপর্ণার অর্পিত শরীর।”[৮]

‘বৈদ্যুতিক’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। কবিতাটিতে স্বপ্নের মতো এসেছে নানা স্মৃতি, নানা অনুষঙ্গ–

“মগজের বিজলী পাখা হওয়া ঘর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব
মগজে কোথাও চুপ প্রভুভক্ত বাদামী কুকুর
রেকর্ড ঘুরছে অবিশ্রাম
এবং ইস্তিরি ঘোরে ধোবিখানা লম্বা টেবিলে
পাটকরা শাড়ি ও চাদর
তথাপি কোথাও
কাঠের কারখানা আছে ঘূর্ণমান বিজলী করাত।”[৯]

কবিতাগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা গেল যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কবি প্রতিভা উচ্চমার্গের নয়। তবে সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বাভাস হিসেবে এই কবিতাগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত এগুলোর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তাঁর শব্দ চয়ন, ভাষার সরলতা, সহজ উপস্থাপন ভঙ্গির গুণে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে উপভোগ্য; যা সহজেই পাঠকের হৃদয়কে আকর্ষণ করে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কোনো নাটক রচনা করেননি। তাঁর রচিত ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য ‘মায়া’ নামে। কলকাতায় ‘বহুরূপী’ ৫০ নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত নাটক ‘মায়া’ মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির মঞ্চাভিনয় সিরাজ দেখেছেন। ‘মায়া’ নাটকের সফলতা সিরাজের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ‘মায়া’ নাটকের নায়ক আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ ঝাঁকসুকে দেখা যায় পথ চলতে চলতে জীবনের মূল মন্ত্রের মতো গেয়ে উঠতে–

"আমার এমন জনম আর কি হবে
মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।"[১০]

নাটকে দেখতে পাই শিল্পী সত্ত্বার মায়ার মোহেই নায়ক সত্য সন্ধানে ব্যস্ত কিন্তু সংসার অবহেলিত। কাজের জন্য শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে আসে বাঁধা। মায়া জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া বাস্তব অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। শিকড়ের টানে এবং বয়সের ভারে ওস্তাদ ঝাঁকসু ফিরে আসতে চায় নিজস্ব সংসার আশ্রয়ে, কিন্তু সংসারে তার জায়গা হয় না। তাই নিঃসঙ্গ ঝাঁকসু গেয়ে ওঠেন—

"শিমূল তোর গুণের বালাই নাই
বিষের কাঁটা অঙ্গে গাঁথা গন্ধ মধু নাই।"[১১]

কবিতা এবং নাটক আলোচনার পরে এখন আমরা সিরাজের কথাসাহিত্যের দিকে আলোচনায় অগ্রসর হব। তাঁর কথাসাহিত্যে মাটি ঘেঁষা জীবন তথা মানুষের জীবনের কথা শুনতে পাই। সিরাজের যাত্রা শুরু হয়েছে 'কিংবদন্তির নায়ক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' (১৯৬৬)। আমরা আলোচনায় জেনেছি সিরাজ সাহিত্য রচনার আগে দীর্ঘ সময় ধরে আলকাপের দলে গান ও অভিনয় করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। 'অলীক মানুষ', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে আলকাপের জীবন কথা। এখন আমরা তাঁর উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে সিরাজের সাহিত্যকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সিরাজের একটি অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হল 'তৃণভূমি' (১৯৭০)। লৌকিক পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ গ্রাম জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। হিজরোল গ্রাম ছাড়িয়ে সোনাটিকুরির মাঠ, ব্যানাকাশের বন আর বিল অঞ্চল এখানকার মানুষ—এই তৃণভূমির আশ্রয়ে পালিত। এখানে দেখতে পাই প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কথা; তথা চাষের পুরাতন পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। আধুনিকতার ছোঁয়া হিসেবে চলে আসে বুলডোজার, ট্রাক্টর। এছাড়াও ফার্ম

বানানো কিংবা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা আদিবাসী মানুষদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। মেষ পালক, গোয়ালা, মাঠ চরানী, জোত মজুর—এদের রুজি-রোজগার বন্ধ হবার উপক্রম হয়। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতীক রূপেও নদীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা এই উপন্যাসে শিল্প স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই সঙ্গে অসন্তোষ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠতে থাকে—এই আদিবাসী গ্রামে তাঁদের শিক্ষার প্রসার লক্ষ করা যায়। মানুষ সচেতন হয়েছে ক্রমশ। চন্দনার নেতৃত্বে আদিবাসী সাঁওতাল, বেদে, পাখি ধরা, ক্ষেত-মজুর, গোয়ালা, মাঠ চরানীরা একত্রিত হয়ে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানায়। লড়াই হয় দ্বারকা নদীর ধারে তৃণভূমিতে। পাশাপাশি তিনি 'তৃণভূমি' উপন্যাসে রাখাল কবিরাজ, চন্দনা, আদিনাথ, নিশানাথ, শুভেন্দু, সীতা ঝুমরি ইত্যাদি চরিত্রের সুখ-দুঃখকে দেখিয়েছেন। এইসব মানুষেরা সিরাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

সিরাজ উপন্যাসটির সূচনাতেই প্রান্তিক জনজীবনের কথা বলেছেন। এখানে দেখা যায় সোনাটিকুরির মাঠে 'মৎস্য গন্ধা'-র (হাঁপানির ঔষধ) সন্ধানে রাখাল কবরেজের নিশিযাত্রা এবং তারপরেই রহস্যময় মৃত্যু। কেউ কেউ বলেছেন খুন, আবার অন্য কারও মতে কাল সাপের দংশন। ছোটবাবু আদিনাথ তার যুবতী বউ চন্দনাকে ভোগ করতে মরিয়া বলে অনেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। আদিনাথের প্রথম পক্ষের ছেলে নিশানাথ জানায় সে তার বাবাকে চন্দনার ঘরে রাত্রে টোকা মারতে দেখেছে। এই ঘৃণ্য অপকর্মের সাজা দিতে নিশানাথ তাকে গুলি করে মারতে চায়। কিন্তু সৎমা সরযূর কথায় আর মারা হয় না 'কুকুরটাকে'। অপমানে নিজের গুলিতে আত্মবলিদান দেন আদিনাথ।

নিশানাথের পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে গৃহবিবাদ লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সৎ মা এবং মামা সঞ্জয় নিশানাথের সম্পত্তি নিজেদের নামে করে নিতে চায়। হতাসাগ্রস্থ নিশানাথ তার পক্ষে কেউ কথা না বলায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পেতে সোনাটিকুরির নির্জন তৃণভূমিতেই বাসাবাঁধে। তার মামা পরাশর চৌধুরী তৃণভূমিতে বাঁধ দিয়ে চাষ করে, ক্যাম্প বসায়। সঙ্গে যুক্ত হয় বহিরাগত শুভেন্দু পালিত। তৃণভূমির মৃত্যু ঘটিয়ে তারা মর্গানাইজ ফার্ম বসাতে চায়। শুরু হয় আরও এক বৃহত্তর সামাজিক সংঘাত। যারা তৃণভূমির দোসর হয়ে বেঁচে আছে, তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বারকা তীরবর্তী সোনাটিকুরির তৃণভূমিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক সংঘাত। উপন্যাসে দেখা যায় বাংলায় কমিউনিস্ট উত্থানের স্পষ্ট চালচিত্র। পরাশর ও পালিতের তৃণভূমিতে আধিপত্য কামিতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে মানিক, গঙ্গুঁ, শম্ভু, চন্দনারা। সোনাটিকুরির মাঠ দখল করে নেয় কমিউনিস্ট পার্টি। অথচ এই তৃণভূমি অমৃতের পসরা নিয়ে বসে আছে। মাঠ চরানী মেয়ে, বাথানওয়ালা কিংবা ক্ষুধিত মানুষেরা অন্নের সন্ধানে এখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। জলাভূমির বিলে কেউ মাছ ধরে, কেউ গুগলি, কাঁকড়া ধরে আবার কেউ শামুক তোলে, পদ্মমূল তুলে খায়। সিরাজ তাদের জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—“চোখের উপর ভাসছিল সেইসব ক্ষুধার্ত রাখাল ছেলেদের দৃশ্য—এক মুঠো চাল নালার হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে চারপাশে বিরাট যারা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব কুনাই বাউরি মেয়েদের কাঠকুটো শাক-মাছ-গুগলি-কাঁকড়া সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা, আর কতো মরিয়া চাষাভুষোর রক্ত জল করা ফসলের ক্ষেত ডুবিয়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর বন্যা; কতো যুগ যুগান্ত কালের বার বার স্বপ্নভঙ্গের জীর্ণ চলচ্ছবি বুকে নিয়ে এই তৃণভূমি নিষ্ঠুর আর নির্বিকার হয়ে আছে।”[১২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রাঢ় বাংলার একজন দক্ষ কথাকার। রাঢ় বাংলার নিসর্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসে। যেমন—“হলুদ বেলে মাটি—উঁচু শুকনো খয়েরী ঘাসে ঢাকা অসংখ্য আল, ধাপে ধাপে নেমে গেছে দিক চিহ্নবিহীন বিলাঞ্চলের দিকে। কাঁটা ঘেরা আবাদি ক্ষেতে কোথাও পাকন্ত গম, ছোলা বা খেসারির হলুদ ছোপ। আলে কেয়া কি ফণীমনসার ঝোপ, কোথাও একটা বাবলা কি তাল গাছ। বহুদূর অবাধ দৃষ্টি চলে যায় খোলামেলা তৃণভূমির দিকে। তাকে ধূসর বা কিছু খয়েরী দেখায়। দূরে কেচক করে বিলের জল; কিনারায় বোরো ধানের ঘন সবুজ ছোপ। সোনাটিকুরিতে এক বিশাল সমুদ্রের আভাস।”[১৩] আগেই বলেছি যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কমিউনিস্ট আদর্শে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁর বাবা আব্দুর রহমান ফেরদৌসি ছিলেন কমিউনিস্ট। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা জানা যায়। সিরাজ কলেজ জীবন থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গণনাট্য সংঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির গভীরে ডুব দিতে গিয়ে ‘আলকাপ’ দলের ‘সিরাজ মাস্টার’ হয়ে উঠেছেন। এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ডামাডোল যে মুর্শিদাবাদের দ্বারকা তীরবর্তী হিজল বনের মানুষকেও

প্রভাবিত করেছিল সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অধ্যাপক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অশান্তির ছায়া দীর্ঘতর হয়ে মুর্শিদাবাদের ব্যানাকাশের বনে ছায়াসঙ্গী আর বিল অঞ্চলের গ্রাম সমাজের উপর পড়েছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক বিক্ষোভ আর ভাঙনের তরঙ্গে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তৃণভূমি অঞ্চল।"[১৪]

'তৃণভূমি' উপন্যাসে বর্ণিত সংঘাতের চিত্র ও তার প্রতিফলিত রূপগুলি আলোচনায় দেখাব। সংঘাতময় চিত্রগুলি নিম্নরূপ—

ক. প্রকৃতি ও মানুষের সংঘাত।

খ. যান্ত্রিকতা ও মানবিকতার সংঘাত।

গ. বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের সংঘাত।

ঘ. জোতদার ও কৃষকের সংঘাত।

ঙ. ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘাত।

এই সংঘাতগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সোনাটিকুরির মাঠ—বিস্তীর্ণ তৃণভূমি খড়ের বন। অন্নদাত্রী তৃণভূমি যখন ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখনই এসেছে প্রবল প্রতিবাদ নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজদের পক্ষ থেকে। পালিত সাহেবকে ছেড়ে কথা বলে না বিল বাঁওড়ের মাঠ চরানী মেয়েরাও। এই মাঠের জমিতে যেমন গৃহবিবাদের সূচনা হয় তেমনই রাজনৈতিক সংঘাতেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কমিউনিস্ট উত্থানের পটভূমি তৈরি করে দেয় এই তৃণভূমির প্রান্তর। তাই উপন্যাসে 'তৃণভূমি' নামান্তরে প্রকৃতিই মৌল চরিত্র হিসেবে প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'ব্রত + ষ্ণ্য' (হীনার্থে) হল—'ব্রাত্য'। কিন্তু অন্যত্র দেখি 'ব্রাত্য' (ব্যাধাদি) + য' সাদৃশ্যে হল—'ব্রাত্য' কিংবা 'ব্রাত্য + ত্য' (বেদগ্রতচ্যুত অর্থে) হল—'ব্রাত্য' (বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অর্থ : ব্রতভ্রষ্ট, আচার-সংস্কারহীন। বর্ণচ্যুত পতিত। অর্থাৎ

নিন্দিত-অর্থে, হীনার্থে, সংকুচিত ছোটো অর্থে, নীচ অর্থে 'ব্রাত্য' শব্দটি বর্তমানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে এই ব্রাত্য বা নিম্নবর্গীয়দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। হিজরোল-সোনাটিকুরি-ময়নাডাঙা-ধুলোউড়ি-মরাডুংরির আঞ্চলিক বৃত্তে বড়ো হওয়া রাখাল-গয়লা-ডোম-বাগদি-বাথানওয়ালা-পাখিওয়ালা-মাঠকুড়ানী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে 'তৃণভূমি' উপন্যাসে। সিরাজের এই চেতনা আধুনিক মনস্কতারই ফসল। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা আঞ্চলিকতা রক্ষা করেছেন। কুনাই–বাউরি–সাঁওতাল–আদিবাসীদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা 'তৃণভূমি' উপন্যাসে সাবলীলভাবে খাপ খেয়েছে। দৃষ্টান্ত–

মানিকের ভাষা ব্যবহার :

১. "কত সুন্দর লেছ হে নিশু, চিন্যে উঠতে পান্নে। বিহা করেছে? কর নি? ক্যানে হে? কলেজে তো অনেক মেইয়া পড়ে।"[১৫]

২. "ইটা তুমার বাপের জায়গা নিশু। ই বাথানে পিকিত মালিক তো তুমি। তুমার জিম্মা আমার হাতে। আর দ্যাখো, কেউ বেশি শুধলে বুলবে, আবাদের জন্যে ইখেনে পড়ে আছো!"[১৬]

লক্ষ্মণ বাউরির ভাষা ব্যবহার :

"কবরেজ দিদি, আপনিই আমাদের মা জননী। ওগে-শোকে দুদ্দিনে আপনাকে আমরা মোনোবেথা জানাই। আপনার মান বাঁচাতে পেলে জেবনটা ধন্যি।"[১৭]

শৈলর ভাষা ব্যবহার :

"হা দিদি। এখন ও মোনের কুটো বেল না। ওই লোকটা কি গুণ করে এখেছে তুকে? ... আজ্যি জুড়ে তুর জয় জয়াক্কার দিদি গো, তুম তুর মনের ভরমাটি ঘুচল না।"[১৮]

মুর্শিদাবাদের কথ্যরীতির ভাষা, বিহার ও সাঁওতাল পরগনার সঙ্গে স্থান বিনিময়ের সূত্রে হিন্দি ও সাঁওতালির মিশ্রণও চোখে পড়ে। যেমন–

১. 'বট' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন–'ইত মানুষ মারা ঠাঁই বটে।'

২. অতীতকালে ক্রিয়াপদের মধ্যে 'ল' ব্যঞ্জনটির আগমন। যেমন : হয়েছিল > হোলছিল।

৩. এখানকার কথ্য ভাষায় এ > এ্যা রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : ছেলে > ছেল্যো।

৪. এই কথ্য ভাষায় 'ও' এর বিকৃতি উচ্চারণ দাড়ায় 'উ'। যেমন : তোকে > তুকে, তোর > তুর।

৫. কখনো কখনো এ > ই রূপেও উচ্চারিত হয়। যেমন : এটা > ইটা, এখানে > ইখেনে।

ইত্যাদি আঞ্চলিক সম্প্রদায়গত কথ্যভাষার প্রয়োগ 'তৃণভূমি' উপন্যাসটিকে আরও বেশি জীবন সম্পৃক্ত করে তুলেছে। সিরাজের ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ বরাবরই ব্যঞ্জনাধর্মী।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিলয় না জানি' উপন্যাসটি শারদীয়া বেতার জগতে বেরিয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন শৈব্যা প্রকাশন সংস্থা ১৯৭৬ সালে। দে'জ উপন্যাস সমগ্র-৩ এর অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম উপন্যাস। দীর্ঘ এই উপন্যাসের শুরুতেই আত্মকথনের ভঙ্গিতে সিরাজ জানিয়েছেন–"তখন রাঢ় বাংলায় জনপ্রিয় লোকনাট্যকার আলকাপের সঙ্গে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। দলের লোক আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখনো আসরে আবেগে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নাচিয়ে ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনো বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অভাজন শ্রোতাদের তাক লাগয়ে দিই। আদাড় গাঁয়ে শেয়ালরাজা মাস্টার।"[১৯] অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই তিনি ব্যক্তি-জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত আউল বা ফকিরদের জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে সরাসরি সুফিবাদী দর্শনের প্রভাব রয়েছে। এখানে দেখা যায় চিশতী মদনচাঁদ ফকিরের মেয়ে মরজিনা ও ফকির আবদুল্লার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, প্রেম-বিচ্ছেদ বেদনার করুণ সংগ্রামের কথা। এই

ঘটনাটি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল বলে মনে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রবিবারে সিরাজ মাদার পিরের মেলায় গিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। তিনি বলেছেন—"ধু ধু বিশাল মাঠে চলেছি তিনটি মানুষ। বীরভূমের সীমানা ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলাম মাঠের মাঝামাঝি। চলেছি পুবে। পিছনে খরার সূর্য চলেছে ততক্ষণে। হু হু বাতাস বইছে। রোদের তাপ ততোটা পাচ্ছি না।"[২০] তাঁর উপস্থাপনের রীতিতে বোঝা যায় তিনি উপন্যাসটির সংলাপ পরিবেশন করেছেন উত্তম পুরুষে; কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব জবানীতে। আখ্যানের মধ্যে রয়েছে তৎকালীন দেশকালের পরিচয়। এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আউল-ফকিরদের কথা। 'আউল' শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"আগে ভাবতুম, আউল হয়তো বাউলেরই মুসলিম প্রতিশব্দ। কথাটা ভুল। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা এক জাতেরই মানুষ। কিন্তু আউল কথাটা এসেছে আরবি ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পবিত্র মানুষ বা সাধুসন্ত। আবার আউল মানে আদি।"[২১] এখানে তিনি মারফতি তত্ত্ব এবং চর্যার সাধনতত্ত্বের মেল বন্ধনে দেখিয়েছেন প্রকৃতি ত্যাগ করে নিবৃত্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা। মদন চাঁদ ফকিরের গাওয়া গানে এই তত্ত্বই লুকিয়ে রয়েছে—

"তিরপিণীর ঘাটেতে এক মরা ভাসতেছে
মরার বুকে সর্পের ডিম্ব
হরিণ চরতেছে। ..."[২২]

অর্থাৎ সাপের বাসনার মতো ডিম। এই ডিমের মধ্যে পরম রূপবান ও রূপবতী হরিণ-হরিণীর বাস। তাদের মিলনেই জীবন আবার বিরহে মৃত্যুরূপ নেয়। এই বিষয়টিই উঠে এসেছে আবদুল্লার প্রতি বিবাহিতা মরজিনার প্রবল আকর্ষণ, তার স্বামী মনসুরের প্রবল রাগ, আবদুল্লার এক রাত্রের ঘটনায় পদস্খলন, তাদের দাম্পত্য জীবনের টানাপড়েন, শেষে আবদুল্লা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ির বাইরে থাকা—অর্থাৎ আবদুল্লার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির ইঙ্গিতে তত্ত্বটি যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী।

উপন্যাসে দেখা যায় মদনচাঁদ ফকির এবং আবদুল্লার যৌথ আকর্ষণে লেখক মাদার পিরের মেলা দেখতে ইন্দ্রাতে যান। সেখানে তিনি আশ্রয় নেন ফকির মদনচাঁদের বাড়িতে। ফকিরের অভাবের সংসারে আতিথেয়তা গ্রহণ করে তিনজনে পিরের মেলায় যান। এই মেলা হল ফকিরদের মিলন মেলা। মেলার শুরুতেই লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলিম বা গাঁজার নেশায় আধ্যাত্মিক গান। নিম্নোক্ত গানগুলি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সিরাজের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

ক. 'তিরপিনীর ঘাটের এক মরা ভাসতেছে'

খ. 'পড়ে গৌর লীলার বাজারে'

গ. 'মানুষ রতন চিনলি না মন'

ঘ. 'দেখি এলাম আজব বিক্ষ'

ঙ. 'ভাবে-ভাবে ভাব লাগাচে'

চ. 'সহজ ভাব দাঁড়াবে কি যে রে' ইত্যাদি।

উপন্যাসটিতে লেখকের সুগভীর অন্বেষণ ও জীবনদর্শনের পরিচয় লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি পির, ফকিরদের আধ্যাত্মিকতার দিকটি যেমন তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনই ভাবে সমান্তরালে উঠে এসেছে লোকায়ত জীবনের উচ্চ আদর্শ ভোগবাদে পরে ক্লেদাক্ত রূপ গ্রহণ করার কথা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে লোকনাট্য দল আলকাপের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেছেন। আলকাপ দলে তিনি সিরাজ মাস্টার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি হারমোনিয়াম, বাঁশি বাজানো থেকে শুরু করে 'কাপ', 'ছড়া', 'কবিয়ালী' রচনা ও প্রয়োগ এবং ছোকরাদের নৃত্য শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার মতো নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। লোকজীবনের মূল সন্ধান করতে গিয়ে লেখক লাভ করেছেন হিন্দু বাউল-বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য।

তিনি দেখেছেন হরিপদ বাউলের বোষ্টমী কাঞ্চনের পরিণতি। স্থূল লালসার কামনায় দগ্ধ হয়ে তার শেষ আশ্রয় হয়েছে শহরের বাগান বাড়ির পতিতা পল্লিতে। কাঞ্চন পতিতা আর মরজিনা নিজের ঘরকেই করে তুলেছে বারবনিতার গৃহ। সিরাজ হিন্দু-মুসলমান দেহবাদী বাউল বৈষ্ণব, ফকির দরবেশের বিলাস-বৈভব আর প্রচারের হাতছানিতে আকৃষ্ট হওয়ার করুণ পরিণতির ছবি অঙ্কন করেছেন উপন্যাসটিতে।

লোকনাট্য দল আলকাপের সঙ্গে সিরাজের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে। উপন্যাসটি অধুনালুপ্ত দুটি সিনেমা পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দু-ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশ করেন দে'জ পাবলিশিং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটির আখ্যান গড়ে উঠেছে দুই ছোকরা শান্তি আর সুবর্ণকে নিয়ে। নারীরূপী কিশোর অভিনেতাদের ছোকরা বলা হয়। এরাই দলের মূল আকর্ষণ। বাহ্যিক অবয়বে তারা পুরুষ হলেও অন্তরে নারী। এই আলকাপ দলের সঙ্গে সিরাজ যৌবনের ছয়-সাত বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় সিরাজ জানিয়েছেন—"প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভবনাপূর্ণ ছ-সাতটা বছর—তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণা কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।"[২৩]

এই উপন্যাসে সিরাজ আলকাপের উন্মেষ, গঠন ও তার পরিণত রূপের সার্থক প্রতিনিধি ধনঞ্জয় ওরফে ওস্তাদ ঝাঁকসুর কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায় 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটিতে লোকনাট্য আলকাপের ঐতিহাসিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়। আলকাপের নামকরণ প্রসঙ্গে সিরাজ লিখেছেন—"আলকাপের পালার নাম 'কাপ'। ওস্তাদ ঝাঁকসু বলে, সংস্কৃত-মূলে কাপট্য থেকে কাপ—ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটক। আর আল-আল মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে।"[২৪]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে পাশাপাশি দুটি কাহিনী এগিয়ে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। একটি আখ্যানের নায়ক আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসু, অন্যদিকে আলকাপের তরুণ মাস্টার সনাতনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এদের দুজনের জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে

দলে 'ছোকরা' হিসেবে পরিচিত শান্তি ও সুবর্ণকে কেন্দ্র করে। ওস্তাদের জীবনে ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে শান্তিকে নিয়ে এবং সনাতনের জীবনের দোলাচলের মূলে রয়েছে সুবর্ণ।

সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে উঠে এসেছে চরিত্রের জটিলতা, গভীরতা, বিষণ্ণতা, আত্ম-সমীক্ষা এবং নানা রহস্যময় মুহূর্ত। মানুষ ও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সিরাজ এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে, যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আদিম কামনা-বাসনার কথা। সেইসব চরিত্রেরা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন জীবনের স্বাধীন লীলা ভূমিতে। অর্থাৎ এককথায় এই উপন্যাস স্বাধীনতা অভিলাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার উপাখ্যান। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে—"রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়ড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচ্যাঁয়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডাঠো ভয় পেয়েছে।"[২৫]

লেখক মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে প্রতীকের ব্যবহার আমাদের আলোড়িত করে তোলে। এই উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে শরীরী অনুষঙ্গ। লেখকের বর্ণনায়—"মাগীরা এতকাল চোখঠার, এক ঝিলিক হাসি, দদুল্যমান বক্ষ এবং পশ্চাৎদেশ দেখিয়েই কতমন লাক্ষ্য ছিঁড়েছে বলা নয়।"[২৬] দিয়ড়িরা যখন নবাব গঞ্জের বাজারে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে তার বর্ণনা দিয়েছেন সিরাজ নিখুঁত ভাবে—"ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টি-জনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন তৃষ্ণার দিনে নিটোল তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।"[২৭]

ডুমুর-মামুনের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিরাপত্তাহীন জীবনে জৈব তাড়নাই বড়ো কথা; সেখানে মনের টান সেভাবে নেই। দিনের দীনতা এবং রাতের লিবিডোর সহজ যোগফলেই সচল থাকে জীবন প্রবাহ। তাই মামুনের অন্তরের চরম সত্য উদ্‌ঘাটনে সিরাজ লিখেছেন—"ডুমুর তার বউ হবে কি! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্থ মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে। বড়ো জোর একটা শারীরিক কিছু ঘটানো যায়—কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগানো কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।"[২৮]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রথাগত ঘটনার বাইরেও কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। 'তখন কুয়াশা ছিল' এবং 'হেমন্তের বর্ণমালা' উপন্যাস দুটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'তখন কুয়াশা ছিল' উপন্যাসে দেখি এক সরল, লাজুক ছেলে; যাকে গ্রামের সবাই নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছে। পরবর্তীকালে ঘটনাক্রমে দেখা যায় ছেলেটি একটি মেয়ের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে গেলে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেই সরল, লাজুক ছেলেটির মনে জেগে ওঠে পৌরুষ; শুরু হয় নতুন রাস্তার অন্বেষণ। লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের অন্ধকূপে নিমজ্জমান গ্রামবাংলার কথা তুলে ধরেছেন। সিরাজ দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের অন্তহীন সফলতার যুগে গ্রামের মানুষের কাছে নেই জাগতিক আলো। চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যায় হেমন্তের ঝরা পাতার মতো। অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে সিরাজ গ্রামকে ভিত্তি করে নিজ কণ্ঠস্বরটি শুনিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্তন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) আধুনিক বাংলা উপন্যাস একটি উজ্জ্বল মাইলস্টোন। চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হল—উনিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলমান পির পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক জীবনের কাহিনী। উপন্যাসে টুকরো টুকরো কোলাজ মিলে জন্ম নিয়েছে এক অপরূপ চিত্রলিপি। সিরাজের বাক্যতত্ত্বের অন্বয়ে রয়েছে অসাধারণ কুশলতার পরিচয়। গতির মাঝখানে সংগ্রামী মানুষ কেমনভাবে অলীক মানুষ হয়ে ওঠে তাই বর্ণিত হয়েছে 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র—ধর্মগুরু বদিউজ্জমান এবং তার নাস্তিক পুত্র শফিউজ্জমান। বদিউজ্জমান মনে করেন মানুষের ভাগ্য বিধাতা ঈশ্বর কিন্তু শফিউজ্জমান মনে করেন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে কেবল মুসলিম জীবন ভাষ্য নয়; একদিকে যেমন মুসলিম ধর্মগুরু, তেমনই অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের পটভূমি সংযোজিত হয়েছে। কাহিনীর অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান আন্ত-সম্পর্কের উদ্ভাসন। এই উপন্যাসে সিরাজ শফিউজ্জমানকে অবলম্বন করে উনিশ-বিশ শতকের চলচিত্র রচনা করেছেন। এখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

বাংলা ভাষী মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলিও সিরাজের তীক্ষ্ণ, সাবলীল গদ্যের ভেলায় চড়ে এগিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। বাংলা ভাষী মুসলমানদের মুখের ভাষা 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বদিউজ্জমানের এক বিশেষ মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে সিরাজ লিখেছেন—"চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসজিদ সুদ্ধ তাঁকে যেন 'গয়রত' (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন।"[২৯] আবার প্রবৃত্তি বশীভূত বদিউজ্জমানের পরাভূত হওয়ার ঘটনাটি সিরাজ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন—"জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিসফিস ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জাম বাটিটি তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাস ঢাকা মাটিতে বিঁধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগল। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পুরোপুরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে করতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।"[৩০] নিসর্গ আর মানুষ এখানে একাকার; এখানেই সিরাজের বিশিষ্টতা।

সিরাজের জীবনবোধের গভীরতা ভাষায় রূপ পেয়েছে 'নিশিলতা' (১৯৬৭) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। রানিচকের রুদ্রদেবের মেলাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি। এই মেলাতেই দেখতে পাই পান বিক্রেতা বিনোদিনী ও তার সদ্য যুবতী ভাইঝি নিশিলতার। মেলার করুণ পরিণতি নিশিলতাকে দীর্ণ করে। এই উপন্যাসে নিশি ও গোবরা নির্মম একাকীত্বের শিকার। চরিত্রগুলি অন্তর্বাস্তব থেকে উঠে আসে বিপন্ন অস্তিত্বের অসহায় ক্রন্দন। তাদের জীবনে সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। তারা মনে করেছে জীবনের চেয়ে মরণ ভালো। কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারে না কেউ। যে মানুষের দল নিজেদের গভীরতম সংকটময় দুটি সত্ত্বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে—গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা তো নিশ্চিতভাবেই জীবন প্রেমিক। সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতার ছবি এঁকে সংগীতের রণনে তুলে আনলেন নিশির অন্তর্বাস্তবকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শহুরে জীবনবোধ সম্পর্কিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'প্রেম-ঘৃণা-দাহ'; যার পরিবর্তিত নাম 'লাল নক্ষত্র'। এই উপন্যাসের প্রথমেই পাই চারজন নারী

চরিত্রের কথা–রুচি, অশ্রু, বিবি বা বৈজয়ন্তী ব্যানার্জী এবং ঋতু। রুচি সম্পর্কে সিরাজ জানিয়েছেন–“রুচির বয়সের গাছপাথর নেই।”[৩১] ঋতু মুসলমানের মেয়ে, অশ্রু অর্থাৎ অশ্রুকণা খ্রিস্টানের মেয়ে অথচ সে মাথার কাছে যীশু বা মেরির ছবি রাখে না, গির্জায় যায় না। অশ্রু নরম ও চাপা স্বভাবের; কেউ কখনো তাকে ভারি বা ভিজে মুখে দুঃখিত হতে দেখেনি। ঋতু আর রুচি মনে করে–“ওর পেছনের জীবনে কিছুটা রহস্য আছে।”[৩২] এই চারটি চরিত্রের অন্তর্বাস্তবে রয়েছে নব-পদ্ধতির বিন্যাস। ঋতু বা অশ্রুও ভাবে রুচির পেছনের জীবনটা যত স্বল্প পরিসর হোক, তা কোনো সাংঘাতিক রহস্যে ভরা। কিন্তু তারা কেউ-ই সেটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাদের মনে হয়েছে–“সবার সব রহস্যের চাবিকাঠি বিবির হাতে। যেন বিবি সবই জানে...বিবির ভূমিকা যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মতো।”[৩৩] বিবি সম্পর্কে সিরাজ রুচির অনুভবে জানিয়েছেন–“বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তার বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে। অত সুন্দর করে কেউ কথা বলতে জানে না, কেউ অমন সুখে কিংবা দুঃখে বাঁচতে জানে না। রুচি তার আঠারো বছরের জীবনে–যে জীবন অনেক পোড় খাওয়া, অনেক গোপন কদর্যতার ক্ষত চিহ্নে ভরা–এমন মানুষ দেখেছি। রুচির এত বল এসেছে বুকে, এত সুখ!”[৩৪] –বিবির ঝলমলে রং, একরাশ আলুথালু চুল, ছন্দিত শরীর রুচির পাশে ফ্যাঁকাসে লাগে–“এই মহিলা মেসে রুচি একটা শান্ত সৌন্দর্য।”[৩৫]

‘লাল নক্ষত্র’ উপন্যাসের চারটি চরিত্রের মধ্যে তিনটি চরিত্রের (রুচি, অশ্রু এবং ঋতু) চিন্তা স্রোত ধারাই ঘটনাকে গতিদান করেছে। চেতনা প্রবাহরীতি বা Stream of Conciousness-এর অবাধ যাতায়াত এখানে। তাই অশ্রুর নিভৃত অবচেতন স্তরের মানসিক স্তর ক্রমশ ফুটে ওঠে। রুচির চাকরিটা অশ্রু খুব ভালো মনে করে না। যেমন সে বরাবর রুচিকেও খুব একটা নির্ভেজাল মেয়ে মনে করে না; আবার সে ভাবে–“রুচি যখন বাসায় থাকে, তখন তার মধ্যে একটা কেমন যেন বিষণ্ণতা, বালিকা সুলভ ছন্দ আর অসহায়তার আমেজ থাকে যা–রুচির সাত খুন মাফ করতো ওস্তাদ।”[৩৬] এই দ্বৈত সত্ত্বার দ্বন্দ্বে উপন্যাসের চরিত্রগুলি আলোড়িত হয়েছে। সিরাজ মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে তুলে ধরেছেন।

অশ্রু কেবলই ভাবে যে আর টিউশনি করবে না। তার মতো হিসেবি মেয়ের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয়। আবার পর-মুহূর্তেই অশ্রুর মনে হয়েছে—"কঠিন নয়-কিন্তু...কিন্তু তারপর? জীবনে তার পরেরটা কি? ...কোথায় পৌঁছোতে চায় সে। একইরকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে অর্থাৎ নিছক বেঁচে থেকে? তবে পৌঁছোবার একটা জায়গা কেন সে খুঁজে পাচ্ছে না?"[৩৭] মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, নিরাপত্তার অভাব থেকেই অশ্রু গড়ে নিয়েছে স্বপ্ন-অবচেতন-অনুভবের একটা অন্য ভুবন। অশ্রুর মনের ভেতরে ভেসে ওঠে—"সে একটা ছোট্ট পোকার মতো এক জায়গা আটকে থেকে এই স্ফীতি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছে।"[৩৮]

ঋতুর একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতা তার চরিত্রের অন্দর মহলেই সম্ভাবিত ছিল। লেখকের বর্ণনায়—"তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব? সে যদি হিন্দু মেয়ে হত, তাহলে কি প্রচুর গভীরতার সঙ্গী পেত তাকে ভালোবাসার মতো? হিন্দু-মুসলমান কোনো পুরুষই ঋতুর বিদ্রোহী ভাবটা মেনে নিতে পারেনি। তারাও যেন বলতে চেয়েছে, ঋতু তুমি নিজে মুসলমান মেয়ে। এতখানি তোমার সাজে না! স্মৃতিপ্রবাহ ও চেতনা প্রবাহ বেয়ে নির্বাচিত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মনের নানা স্তরে চলেছে তার অশান্ত অন্বেষণ। ঋতু তাই বলেছে; মানুষ এটা কেন বোঝে না সে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তারপর ধর্ম বা সম্প্রদায়?"[৩৯] এক অদৃশ্য জীবন সংগ্রামে আপাত শিথিল মুহূর্তের সমাহারে ঋতুর মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাচারের আড়ালে নগ্ন হয়ে রয়েছে তার আত্মকথন। ঋতুর মনোগহনের জটিল আঁধারে সিরাজ আলো নিক্ষেপ করে বলেছেন—"মনে মনে বিবিদি মিঠে হাসছে; নিঃশব্দে এবং স্নেহে, তার উজ্জ্বল মুখে পৃথিবীর ময়লা ও অসুখ-বিসুখের কোনো ছায়াই পড়ে না। রুচি...হ্যাঁ, তার পক্ষে সম্ভব। ...রুচি খুব স্বার্থপর টাইপের মেয়ে, কুচুটে, সারাক্ষণ তার মনে অন্য এক চালাক চতুর মন নিয়ে সে থাকে—কাকেও জানতে দেয় না।"[৪০]

সিরাজের শহুরে জীবনবোধের আর একটি অন্যতম উপন্যাস হল 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি'। এই উপন্যাসে আছে শহরের কথা, নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বোবা অন্ধকারের কথা। স্কুল শিক্ষক ননী আর কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে কাহিনী এগিয়েছে। মানব চরিত্রের জটিল, অন্ধকার,

রহস্য সম্পর্কে সিরাজ আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন। ঘটনার যথাযথ বিবরণ, চরিত্র বিন্যাসের পারম্পর্য, ঘটনার দ্রুতগতি ঔপন্যাসিককে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। উপন্যাসে দেখা যায় ননী মানুকে ভালোবেসেও বিবাহের পথে পা বাড়ায়নি। একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার। কিন্তু কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ও অপমৃত্যু ননীকে বাক্যহারা করে দেয়। মানু তার ভাই জনের অ-পরিণাম দর্শীতায় লজ্জিত হয়ে ননীর পদতলে আশ্রয় নেয়; আরম্ভ হয় তাদের নতুন দিগন্তের অন্বেষণ। ননীর মর্ত্যলোকে আলোড়িত হয় এক অমোঘ সত্য। লেখকের ভাষায়—"সেক্স মানুকে মেরে ফেলে। ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।"[৪১] এই অন্তর কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জগত ও জীবনের চলার গতি। এই উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রের নামই দু-অক্ষর বিশিষ্ট—ননী, কৃষ্ণা, মানু ও জন। সিরাজ সাহেব এইসব চরিত্রগুলিকে চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখেছেন; হৃদয়ের গভীরে প্রেমের নিগূঢ় নির্যাসকে নিভৃতে লালন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কুশীলবেরা তাদের মিথ ও ভাবনার জগতে বাস করে। তাই গভীর অন্তর্বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিকতার অন্দরমহলে সিরাজ সহজেই প্রবেশ করেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রায় সব গল্পই রাঢ়ের। রাঢ় ভূমির জীবন ও রহস্য, জৈব জীবনের কামনা-বাসনার আদিম ছন্দ, রাঢ় ভূমির মানুষদের শ্রেণিসংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, খিধে-হতাশা-ব্যর্থতা, তাদের প্রতিহিংসা-হত্যা-ষড়যন্ত্র, সংস্কার-বিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত-অধিদেবতা, দাঙ্গা-রাহাজানি-জুলুম, ধর্ম-ধর্মমোহ সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গভীর অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বন্ধ্যা রাঢ়, রাঢ়ের অবক্ষিত মূল্যবোধহীন সময় ও যৌনতার একটা স্পষ্টরূপ দেখতে পাই, এরকমই একটি গল্প হল 'রানিঘাটের বৃত্তান্ত'। গল্পটি উত্তম পুরুষে শুরু হয়েছে। গল্পের কথককে বাসের সহযাত্রী ভদ্রলোক সাবধান করে জানায়—দেখবেন মশাই, মহা ত্যাঁদড় জায়গা। কথকতার ঢঙে এভাবেই শুরু হয় গল্পটা। আলোচ্য গল্পে 'সুরেশ্বরী', ঘাট ইজারাদার, মাঝি, দোকানদার, বাস ড্রাইভার, খুনি, মাতাল, ঘাটের আটচালায় আশ্রয় নেওয়া পথিকের পাশবিক অত্যাচার স্বীকার করে নিয়ে আক্ষরিক অর্থে 'সুখদায়িনী' হয়ে উঠেছিলেন।

'ফালতু' সেই পিতৃপরিচয়হীন সুরেশ্বরী পুত্র। জগন্নাথের মেয়ে টুকটুকির সঙ্গে যুবক ফালতুর প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি টুকটুকির বাবার আপত্তিতে। টুকটুকির বাবা জগন্নাথ পিতৃপরিচয়হীন ফালতুর সঙ্গে বিয়ে আটকাতে এক অমোঘ সত্যকথা স্বয়ং ফালতুর কাছেই প্রকাশ করে জানায় তারই ঔরসে এবং সুরেশ্বরীর গর্ভে ফালতুর জন্ম। আপন দাদার সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে—এই পাপবোধে হতভাগী টুকটুকি গিলেছিল বিষাক্ত করবী ফল, কেউ বলে শিলে বাটা ধুতরো। টুকটুকি পেরেছিল নিজেকে আলাদা বর্গের অধিবাসী করতে। যারা পারেনি তারা কেউই পাপবোধে তাড়িত নয়। কামনা-যৌনতার সঙ্গে মিশে থাকে যে লোভ, নীচতা, হিংস্রতা, ছলনা, স্বার্থপরতা তা শেষপর্যন্ত গল্পের অন্যান্য চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই অন্ধকার কালের প্রবাহে ঘূর্ণায়মান মানুষ উঠে এসেছে সিরাজের গল্পে।

'উড়োচিঠি' গল্পের লেখক একটি সময়ের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কালুডিহির বদরুবুড়োর মুখ দিয়ে—"সে অনেক বছর আগের কথা। বিলাঞ্চলের নাবাল মাটির গাঁ কালুডিহিতে যব বিশেক বসতি বড়ো জোর। ...সেই গাঁয়ে এমনকি এক নিম ফুল ফোটা চৈত্র মাসের অবহেলায় হঠাৎ এসে পড়ল একজন ডাকপিয়ন।"[৪২] তখন আমরা কোনো এক সময়ের গল্পে প্রবেশ করি। কালুডিহির সেই জীবন প্রকৃতির সঙ্গে লেপটে থাকা প্রযুক্তিহীন মানুষ। যাদের কাছে ডাকপিয়ন কোনো দিন কোনো খবর নিয়ে আসেনি। কালুডিহির মাঠ-ঘাট, লতা-পাতা, বৃক্ষ, মানুষ, ছাড়া যারা আর কোনো খবর জানে না। জানার কোনো তাগিদও অনুভব করে না। তাদের কাছে—"খবর মানেই সাংঘাতিক কিছু যা তুমি জানো না; ভাবোনি, টেরও পাওনি। যা তোমার ওপর হঠাৎ এসে হামলা করে। ঝড়ের মতো। গাছের ওপর বাজ পড়ার মতো। বন্যার মতো।"[৪৩]

ডাকপিয়ন নিয়ে আসে চৈত্রের ঝরা বটপাতার মতো হলদে চিঠিটা, আমোদ আলীর নাম লেখা। লিখেছে মামোদ আলী। যার কথা বিস্মৃত গায়ের মানুষজন। মামোদ লিখেছে—সে কাল রোগে আক্রান্ত। পত্রে তাকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে, অন্যথায় সে আর বাঁচবে না। এই কঠিন খবর পাঠানো মামোদকে একসময় স্মরণ করা যায় বুড়ি সালমার স্মৃতিতে। গাবতলির পোড়া ভিটেখানা বুধরী বহরির। তার যমজ ছেলেই এক আমোদ আলী আর মামোদ আলী।

ছোটবেলায় কালুডিহিতে যখন প্রথম নবাবের হাতি এসেছিল সেদিন হারিয়ে গিয়েছিল মামোদ আলী। আমোদ আলী একসময় মারা গেছে রোগে ভুগে। সেই মামোদ আলীই এত বছর পর চিঠি পাঠিয়েছে ভাইয়ের কাছে। সে রোগ শয্যায় আছে খড্ডা নামে কোনো এক অচিন জায়গায়। কালুডিহির মানুষ ছুটল তাকে খড্ডা থেকে নিয়ে আসতে। আসমা বললো—"চোখে জল নিয়ে ঘোষণা করল—মামোদ আলী এলে পথ্যির দিন আমার টুকটুকিকে আন্না করে খাওয়াব। শরীলে অক্ত হবে। টুকটুকি তার প্রিয় মুরগির নাম।"[৪৪] মামোদ আলীর আরোগ্য কামনায় দেখা যায় সমাজের একটি বর্ণময় চিত্র—"কালুডিহির পুরুষরা হাঁটু মুড়ে বসে দু-হাত সামনে তুলে মামোদ আলীর আরোগ্য ও আয়ু কামনা করলো। আবেগাপ্লুত কেউ কেউ হেঁড়ে গলায় কেঁদেও ফেলল। এই বাড়তি নমাজ ও ক্রন্দন খরার বছরে বৃষ্টির জন্য দেখা গেছে কালুডিহিতে।"[৪৫]

গাঁয়ের সেরা মোষের গাড়ি সাজিয়ে বিলেতি লণ্ঠন জ্বালিয়ে আলকাটা পথে ধুলো উড়িয়ে খড্ডায় ছুটে যায় কালুডিহির মানুষ। কিন্তু খড্ডা নামের কোনো জায়গার সন্ধান তারা পায় না। তাদের বিশ্বাস খড্ডা জিনের দেশ। সেখানে হীরের গাছে মানিক ফলে। ডাকের পিয়ন সেই জিনের দেশের একটা উড়োচিঠি এনেছিল ভুল করে। এই মিথ বিশ্বাস করেই কবরের দিকে চলছে কালুডিহির প্রাচীন মানুষেরা। এটা আমাদের মানবিক আবেগ, প্রেম, স্পর্শ, আর যৌথ জীবনের কথা, সময় প্রযুক্তি আর পুঁজির কাছে লুপ্ত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের গল্প।

'পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড' গল্পে আমরা প্রাচীন ও নবীন কালের দুই মানুষের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্য দেখি। সম্পর্কে তারা পিতা-পুত্র; ষষ্ঠীচরণ ও নিমাই। ষষ্ঠীচরণ প্রাচীন, পেশায় মালী। নবীন (নিমাই) আধুনিক—সরকারি চাকুরে। গল্পে ষষ্ঠীচরণের বর্ণনা পাই এই রকম—"ঘড়িপরা ঘরিসের মতো উদোম গা, হাঁটু অব্ধি আঁটো ময়লা ধূতি, কাঁধে চিটচিটে গামছা। অনেকটা কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে সে হাঁটে। সেটা বয়সের ভারে নয়, মাটির টানে।"[৪৬] মাটির মানুষ ষষ্ঠীচরণের নিঃসাড় ফ্যাঁকাসে তালু সভ্যতা স্পর্শ করতে জানে না। তার ছেলে নিমাই আধুনিক মানুষ। সভ্য জগতের স্বাদ ও সুখ শোষণ করে গড়ে তুলতে চায় আধুনিক পৃথিবী। সে পৃথিবীর কোনো কিছুই ষষ্ঠীচরণের ধাতে সয় না। ভালো একটা জামা তার গায়ে কুটকুট করে। ভালো ধূতি সে পরতে জানে না। ছেলের আধুনিক পেস্ট ক্রিম মাখতে গিয়ে নষ্ট করে। বাবার

এই প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে বের হতে চায় নবীন, তার চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্বলজ্বল করে। বাবার পুষ্পবাগানের রেখার ফুল সে দেখাতে চায় আভিজাত্য হিসেবে। পুষ্পবাগানের দুর্লভ ফুল আভিজাত্য বহন করে কিন্তু পুষ্পবাগানের মালিকে পিতা পরিচয় দেওয়া মর্যাদা হানিকর–"...অন্ততকাল একটা দিন তোমাকে বাবা টাবা বলতে পারব না। ...তুমি তাহলে বুড়ো শুনে যাও মন দিয়ে। এটা আমাদের বাগান বাড়ি। ...বাড়ি একটু দূরে–ধরো মেমারিতে। আমরা বেশ বড়োলোক–বনেদি ফ্যামিলি। ব্যবসা আছে সেখানে।"[৪৭]

এই কথা শুনে বোঝা যায় লেখাপড়া শেখা কলকাতায় চাকরি করা নিমাই শ্রেণি বদলের স্বপ্ন দেখে, বনেদি পরিবারের নাম লেখাতে চায়। উন্নয়ন চায় সামাজিক অবস্থানের। মাটির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। সভ্য আধুনিক মানুষ মানে কি কৃত্রিমতা? মাটির বিপরীতে কংক্রিটের পৃথিবী? উন্নয়নের চিহ্নই বা কি? উন্নয়ন কি পিতৃত্বকে অস্বীকার করে? উন্নয়ন কি দাবী করে নাম পরিবর্তনের? এই প্রশ্নগুলি নিমাইয়ের মাথায় ঘুরপাক খায়। শেকড়ের প্রতি, বন্ধনের প্রতি নিরাসক্তিই নিমাইকে এই চরিত্রধর্মী করে তুলেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন 'বাগাল' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাগাল' শব্দের অর্থ যে গরু বাগায় বা বশে রাখে অর্থাৎ রাখাল। 'বাগাল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল হরিবোল, মাত্র আট বছর বয়স তার। অল্প বয়সে সে পিতৃহারা হয়। মা–ও তদ্রূপ। অতৃপ্ত যৌবন বাসনাকে চরিতার্থ করতে মা রাঙাদাসী শিশু হরিবোলার ফেলে রেখে পাড়ি দেয় নাগরিক জীবনের উদ্দেশ্যে। এদিকে হরিবোলার আশ্রয় জুটল 'বাগাল' হিসাবে ধানু মোড়লের বাড়িতে। পরগাছার মতো গতানুগতিক জীবন ছন্দে এগিয়ে চলল হরিবোলের জীবন। আর পাঁচটি সাধারণ ছেলের থেকে পৃথক এক জীবন। দ্বারকা নদীর ওপারে কাশফুলের বন, ফাঁড়ি ঘাসের বন, বিল-বাঁওড়, হিজল, বাবলা, ভাঁড়ুলের প্রকৃতি হরিবোলাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে।

বাস্তবে বাগালদের প্রতি কেউ সহানুভূতিশীল নয়। আবার তার বাবা-মায়ের কোনো কলঙ্ক থাকলে তো কথাই নেই। হরিবোলা পিতৃহারা, মা রাঙাদাসী মেদিগঞ্জের দেহ ব্যবসায়ী মধুবালাতে পরিণত। মধুবালার অনুরাগ প্রাপ্ত নরেন্দ্র মাস্টারের ভাই মলিন্দ একদিন লুকিয়ে হরিবোলাকে

নিয়ে যায় তার মায়ের কাছে। নাগরিক জীবনের চাকচিক্য হরিবোলার চোখ বাঁধিয়ে দেয়। লাল শাড়িতে মধুবালা নাম্মী মাকে তার অচেনা মনে হয়।

ধানু মোড়লের ভয়ে মার কাছ থেকে নতুন জামা-জুতো পাওয়া খুশি হরিবোল, তা যোগীবরের কাছে রেখে আবার চিরপরিচিত পোষাকে বাগালদের কাছে ফিরে আসে ও জানতে পারে গম নষ্ট করার জন্য তার গরুর পালকে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেছে। মায়ের দেখা পাওয়ার আনন্দ আকস্মিক কালবৈশাখীর ঝড়ের আঘাতে ওলটপালট হয়ে যায়। শাস্তি স্বরূপ পেয়ারা গাছে গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে ছোট্ট বাগালকে আষ্টপিষ্টে বেঁধে রাখা হয়। যে কোনো বিপদের সময় মায়েরাই শিশুদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। মায়ের কোলকেই শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ স্থান মনে করে। তাই চরম লাঞ্ছনার দিনে ছোট্ট হরিবোলারও তার মাকেই মনে পড়েছে। রাতে অবচেতনায় প্রকৃতি মা ও বাস্তবের মা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

‘বুড়া পিরের দরগাতলায়’ গল্পের প্রথমেই আমরা দেখি কাঠবেরালি, শুকনো পাতা, গাছ-পালা, ঘুঘু, ঘাস ফড়িং একটা ছোট্ট আনমনা ছেলে এবং তার বাবা অন্ধ বেন্দাবন। বেন্দাবন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তার ছেলেকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে ভাবে তার ছেলে একদিন ফিরে আসবে। তাই সে বুড়া পিরের কাছে প্রার্থনা জানায়। নিঃসঙ্গ বনস্পতির মতো জীবনের ভার তাকে বহন করে চলতে হয়েছে।

বাস্তব ও স্বপ্নের সীমারেখা ‘অক্রূরের গল্প’। এখানে চরিত্রের জটিল পথরেখা, অন্তরের গহনে তাদের যাত্রা। ব্যঞ্জনাবহ, সংকেতময় তাদের পরিবেশ। চরিত্রের আত্মবেষ্টন নতুন মাত্রা যোজনা করে। গল্পের নায়ক অক্রূর একদা ছিল সমর্থ-জোয়ান পুরুষ। এখন তার অবস্থা ‘ভূমিসাই জীর্ণ জয় স্তম্ভের মতো’। অক্রূরের বাবু নিঃসন্তান ছিলেন। তার বাবুপত্নী তার সঙ্গে নিবিড় মিলনে প্রমত্ত হলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। অক্রূরের প্রাণবীজে যে সন্তানের জন্ম হয় তার নাম নীলু। অক্রূরের প্রতি নীলুর জন্মদাতার মতো কোনো প্রাকৃতিক টান নেই। কারণ নীলু বড়ো হয়েছে অন্য পরিবেশে। অন্তর্জীবনের নৈরাশ্য, অবসাদ আর জটিলতায় ভরা ভিন্নধর্মী এই কাহিনী আমাদের আপ্লুত করে।

'মৃত্যুর ঘোড়া'—গল্পটি জীবনের অপর একটি অভিজ্ঞতার উপর নির্মিত। জীবনের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মনে প্রথম মৃত্যু চেতনার উদ্ভব হয়। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, লৌকিক-অলৌকিকতার প্রাথমিক সংশয় অপসারিত হবার পর ক্রমশ বিভ্রান্ত মানব মন অনুভব করতে পারে মৃত্যুই জীবনের চরমতম পরিণতি। নয় বছরের বালকের পিতামহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই গল্পের অবয়ব তৈরি হয়েছে।

'আলেকজান্ডার' গল্পে রয়েছে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশ্রণ। এ গল্প একটা গরু এবং কয়েক জন মানুষ নিয়ে। হরিয়ানা থেকে কিনে আনা ষাঁড়। তার বাপ হাঙ্গেরিয়ান, মা ভারতীয়। গল্পের প্রধান চরিত্র শিবু তাকে কিনে আনে; নাম দেয় আলেকজান্ডার। গল্প এগিয়ে চলে তাকে ঘিরেই। শিবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসন্তী, ভাইপো হেমন্ত। ফসল পাহারা দেয় সরলা। একদিন আলেকজান্ডার হারিয়ে যায়। শিবু ষাঁড়ের খোঁজে সরলার ঘরে ঢোকে। সরলার সঙ্গে মিলিত হয়। ফিরে এসে বাসন্তীকে বলে সে পুরুষত্বহীন নয়। শিবুর সঙ্গে বচসা বাঁধে বাসন্তীর। খবর পায় ষাঁড়টা দূরের গ্রামে চলে গিয়েছে। শিবু এবার ভাবতে থাকে, সরলা কি তাকে ব্ল্যাকমেল করছে! সরলার সেজো ছেলেটাকে এবার মেরে ফেলা দরকার। শিবু বন্দুক নিয়ে গেলে সরলা বাঁধা দেয়। শিবু ফিরে আসার পথে অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করে, আকাশের এই বিশালত্বের মধ্যে সে কতো ক্ষুদ্র। কাম পরিতৃপ্ত করার জন্য যে আলেকজান্ডার বেরিয়েছিল সেও ফিরে আসে।

'স্বামীও প্রেমিক' গল্পে মহুয়া নামে এক অসুখী যুবতীর আত্মহত্যা চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। যার শরীর ভোগ করেছে অফিসের বস সুকোমল বসু রায়। আর মহুয়ার স্বামী জ্ঞানেশ মিত্র সব জেনেও স্ত্রীর রোজগারে খাবে বলে চুপচাপ থেকেছে। কিন্তু মহুয়ার মৃত্যু হলে সে ছুটে এসেছে সুকোমলের কাছে কৈফিয়ত চাইতে। স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা স্বামী হিসেবে সে মেনে নিয়েছে এই জন্যই যে তাকে সে ভালোবেসেছিল। মহুয়া ভালোবাসেনি, বরং ভেবেছিল, ব্যাচেলর সুকোমল বুঝি তাকে গ্রহণ করবে। সুকোমল বিয়ের বন্ধন চায়নি; ভোগের আনন্দ খুঁজেছিল। ফলে অসহায় নিরাপত্তাহীন মহুয়া আত্মহত্যা করে। সেই মৃত্যু সংবাদে সুকোমল বিচলিত হয় না। কারণ তার মধ্যে প্রেম নেই, কাম আছে।

'বর্ণপরিচয়' গল্পের ভিতরে আছে জটিল এক বিন্যাস। এক অনুসন্ধানী আলো। অমৃতেন্দু পর্ণাদের বাড়িতে ভাড়া নেয়। সেই ঘরে; যেখানে তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। সে দয়ালবাবুর যে ছেলে কেউ জানত না। বাবার মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটনেই তার আগ্রহ। শেষপর্যন্ত সে তার কাজে সফল হয়। সে ঘরে তার বাবা দেওয়ালে লিখে গিয়েছিল 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' তা সে উদ্ধার করে। আর তা দেখে ফেলে হিমির মা বিব্রত হন। অথচ ঘটনাটা এতদিনে উন্মুক্ত হওয়ায় তার বুকও হালকা হয়। অনেক সময় নিয়ে পর্ণা চা করেন–বুক থেকে কি কষ্ট বা সুখ ঠেলে আসছে শুধু। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে আজ। অপরাধ ও গ্লানিবোধ থেকে মুক্তিই এই কান্নার উৎস।

'তাঁরা চাঁদের হাসি' গল্পে যে তারাচাঁদ অদ্ভুত হাসি হেসে সব কিছু তুচ্ছ করতো, সে বিধবা সুরেশ্বরীকে বিয়ে করার অপরাধে একঘরে হয়। ফলে মৃত্যুর পরে তার দাহকার্য হয় না। শুধু শেষকৃত্য করতে তার স্ত্রী সুরেশ্বরী স্বামীর পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলে। তবু মৃত তারাচাঁদের হাসি অম্লান থাকে ঠোঁটে।

'সাক্ষীবট' ভালোবাসার রক্তাক্ত পরিণতির গল্প। কালীর সঙ্গে বিধবা সরমার গোপন প্রণয় তার বাড়ি মেনে নেয়নি। তাই একরাত্রে কালী খুন হয়ে যায়। সরমা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় কালীর বৃদ্ধ বাবার কাছে। মন্ত্রপড়া বিয়েতে সরমার সুখ আসেনি বলেই বটগাছকে সাক্ষী রেখে সে কালীকে মনে গ্রহণ করেছিল। কালী চোর-ছ্যাঁচোড় বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ভালোবাসা তো জাতি-ধর্ম মানে না। আর কালীর বাবা ছেলেকে বাঁচাতে পারেনি, তাই মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। কেননা তার গর্ভে আছে বংশধর। শোকের মধ্যে ঐটুকু আশা ও সান্ত্বনা।

আদিম রিপু মানুষকে কতো অসহায়, ইতর এবং হাস্যকর করে তোলে, তার ছবি আঁকা হয়েছে সিরাজের 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পে। দুঃখী-দরিদ্র পরিবারের মেয়ে চিরুনি। তবু দরিদ্রের দেহেও যৌবন আসে। তাই চিরুনির মা আদুরী ভয় পায় মেয়েকে নিয়ে। মাঠে-ঘাটে তার ঘোরাফেরা পছন্দ করে না। তবে গাঁয়ের মোড়ল, পৌঢ় ধনহরি যখন তার শালার বাড়ি ধামালিতলা যাবে বলে, চিরুনি তার সঙ্গে মাসির বাড়ি যেতে চায়। আদুরীও অনুমতি দেয়। যেতে যেতে নাতনি-তুল্য চিরুনির সঙ্গে ধনহরি কতো কথা বলে। তার এই অন্তরঙ্গতায় কৃতার্থ হয়ে

যায় গায়ের দুখিনী মেয়েটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে তারা অবশেষে এক মাঠের প্রান্তে, গাছের ছায়ায়, পুকুর পাড়ে আশ্রয় নেয়। জল-মুড়ি-গুঁড় খায়। এরপর বিশ্রামের ছলে মোড়ল চিরুনির বুকে হাত রাখে। তার শাড়ি খুলে শরীরের উষ্ণ স্বাদ নিতে ব্যগ্র হয়। চিরুনি প্রথমে হতবাক হলেও শেষে আপত্তি জানায়। মোড়ল তার থলথলে দেহ, মোটা থাবা নিয়ে চিরুনির হাতে পায়ে পড়ে। গাঁয়ের মাথা যে মোড়ল সে অনায়াসে চিরুনির পায়ে মাথা কোটে। গোটা ছবিটির মধ্যে এত অসংগতি আর ঘৃণ্য কামুতা ফুটে ওঠে; যা পাঠককে শিহরিত করে। পয়েটিক্ জাস্টিসের মতো অবশ্য শেষে এক চাষি এসে বুড়োর হাত থেকে চিরুনিকে রক্ষা করে।

নিষ্কাম কৈশোর প্রেমের বেদনা মূর্ত হয়েছে 'জুলেখা' গল্পে। জুলেখা বা জুলির সৌন্দর্য ছিল প্রচুর চুল। গল্পের কিশোর প্রেমিককে সেই চুলও টানত। প্রায় সমবয়সী তারা। কাজেই দুজনের মধ্যে খুনসুটি নিত্যই চলত। সম্পর্কে যদিও জুলি পিসি। তবু তার বুকের কোমলতায় চুলের অন্ধকারে কিশোরটি খুঁজে পেত এক অজানা মাধুর্য। আর জুলিও ভেবেছিল, জীবন বুঝি এইরকম। তাই ভাইপোকে সে সহজে সারল্যে বলে 'তুমি ছাড়া আর কারুর পাশে আমি শুতে পারবো না'। কিন্তু শেষপর্যন্ত জুলির বিয়ে হয় এক ল্যাংড়া বদরুর সঙ্গে। অনেক জল ঘোলা করেও এই বিয়ে থামানো যায়নি। তাদের এক জাঁদরেল ডেপুটি মামাই এসব ব্যবস্থা করেন। জুলি ভেবেছিল তার কৈশোরের ভালোবাসার পুরুষটি দ্রুত বড়ো হয়ে বুঝি তাকে উদ্ধার করবে। কার্যত তা হয়নি, হয় না। অচরিতার্থ প্রেম নিয়ে জুলি চলে যায়। আর কৈশোর অঞ্জুও উপলব্ধি করে 'আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম।'

ভিন্ন স্বাদের গল্প 'জিঘাংসা' যে ক্রোধ, পাশবিকতা মানুষকে অন্ধ করে, তার প্রকাশ কতো ভয়ঙ্কর হয়, এখানে তার কাহিনী পাই। এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় কয়েকজন নেপালবাবুর শবদেহ দাহ করতে এনেছিল শ্মশানে। হঠাৎ সেখানে এক আগন্তুকের আগমন ঘটে, কথায় কথায় জানা যায় নেপাল বাড়ুয্যে গুণ্ডামি করতেন। এই শ্মশান ঘাটেই একবার একজন পুলিশ খুন করেন। আর জানা যায় আগুন্তুক অন্ধ এবং একালের দুঁদে মণি দারোগা সে। সুরমাকে ঘিরে নেপালবাবু ও মণি দারোগার মধ্যে বিরোধ আর আক্রোশ জন্ম নেয়। এতদিন পরে সেই অন্ধ দারোগা মৃত

নেপালবাবুর চোখ খুবলে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে দেখা যায়। যাকে লেখক ‘শবভোজী আক্রান্ত শেয়ালের মতো’ বলেছেন।

প্রতিশোধ নয়, বঞ্চনার গল্প ‘কাঁটা’। বুড়োশিব এক সাদামাটা সরল গ্রাম্য মানুষ। জমিতে খেটে খায়। হঠাৎ তার পায়ে কাঁটা ফোটে ও সেপটিক্ হয়ে যায়। হাজরাবাবু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসাও হয়। কিন্তু বিষিয়ে যাওয়া ক্ষত সারে না। যেতে হয় শহরে। হাজরাবাবুই সব ব্যবস্থা করে দেন। বিনিময়ে একটা ডেমি কাগজে বুড়ো শিবের টিপছাপ নেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর একটা পা হারিয়ে বুড়োশিব গাঁয়ে ফেরে। তার তেরো ডেসিম্যাল জমির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু জানতে পারে জমি বেদখল হয়ে গেছে। ও মাটিতে আর সে পা ফেলতে পারবে না।

প্রতারণার আরেক রূপ আছে ‘শরীরী-অশরীরী’ গল্পে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশে লেখা এ এক প্রেমের গল্প। যেখানে সুমতি নামের এক যুবতীকে গৌতম প্রতারণা করেছে। যে বাড়িতে লেখক ভাড়া নেন যেখানে নাকি এক অশরীরী যুবতী ঘোরাফেরা করে। মনোরঞ্জন নামে এক যুবক জানায় তাকে নাকি ভূতটা উৎপাত করে। ক্রমে রহস্য স্পষ্ট হয়। সুমতির প্রেতাত্মা জানায় তার স্বামী বন্ধু গৌতম ওরফে মনোরঞ্জন তাকে উপভোগ ও হত্যা করেছিল। তারই প্রতিশোধ ছায়াময়ী নিয়েছে।

‘চম্পাকুমারী’ খুব চেনা জানা গল্প। একালের ছেলেমেয়েরা সিনেমার মোহে ঘরছাড়া হয়, ভুল করে। জনৈক বুড়ো চাষির ছেলেও সিনেমার চম্পাকুমারীকে পেতে চেয়েছিল। সঙ্গী হয়েছিল এক-দুজন বন্ধু। যার সঙ্গে সে হাজির হয় পতিতা পল্লিতে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কষ্টের সব টাকা-পয়সা খোয়া যায়। তবু ঘোর ভাঙে না, মফস্বলে চম্পাকুমারী শুটিঙে এলে সেই চাষির ছেলে আকাশ ছুটে যায়। নদীর সাঁতার কেটে চম্পার পাশে যেতে গেলে পুলিশ ও রক্ষীরা তাকে আঘাত করে। অকালে অতৃপ্ত আকাশের মৃত্যু হয় এই স্বপ্ন নিয়ে–‘বোম্বেওয়ালী হিন্দি ভাষিণী রুপালী মাছের মতো মেয়ে তার বুকে বুক দিয়ে শোয়।’

সিরাজের অজস্র গল্প এভাবেই নানা মানুষের ছিন্ন স্বপ্নে, রক্তে, ঘামে ভিজে যায়। আমাদের চেনাজানা মানুষেরা তাদের হাসি-কান্না-ব্যর্থতা নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে। আর সেই গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়, এসব বানানো নয়, বড়ো করুণ সত্য।

'সূর্যমুখী' কামনাকে সংযমে বেঁধে জীবনের শুভ সুকুমার প্রান্তরকে আলোকিত করার গল্প। এ গল্পে দেখা যায় কামবৃত্তি চরিতার্থ করার চূড়ান্ত সুযোগ পেয়েও কামনা জর্জর পুরুষ শেষাবধি প্রবৃত্তিকে শুভ চেতনার শাসনে বেঁধে জীবনের পাল্টা-রূপকে বড়ো করে তুলেছে। গল্প কাহিনীর অয়ন রেখাটি এই রকম—গ্রামে গ্রামে জামাকাপড় ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করা যুবক নবীন কাপুড়ে চরিত্র বৈশিষ্ট্যে কিছুটা কৃপণ প্রকৃতির হলেও স্বভাবে বেশ রসিক মানুষ। গ্রামে গ্রামে কাপড়, সায়া, ব্লাউজ বিক্রির জন্যে সে নানা ধরণের সরস কথা বলে ব্যবসা জমিয়ে তোলে। আশেপাশে দশ-পাঁচটা গ্রামে নবীনের অনায়াস যাতায়াত যেমন তেমনই গ্রামের কিশোরী, যুবতী, বধূ, পিসি, মাসিদের নির্ভেজাল আস্থা রেখেছে তার প্রতি। সে কারণে ক্রেতা নারীদের সঙ্গে তার পরিহাস রসিকতাকে কেউ খারাপ চোখে নেয় না। বরং সোনামুখী, ঢলঢলমুখী, শশিমুখী, বিধুমুখী, হাসিমুখী, মধুমুখী বলে সে যখন ক্রেতা নারীকে ডাকে তখন একরকম অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে দু-পক্ষই। এহেন নবীন সকালবেলা পুবের সূর্যকে পিছনে রেখে ধুল্লোউড়ির মাঠ পেরিয়ে কাপড় ফেরি করতে যায় আর বিকেলবেলা পশ্চিমে সূর্যকে পিছনে রেখে ব্যবসাপাতি সেরে সন্ধ্যেতে ঘরে ফেরে। বিরাট বিপুল ও ভয় ধরানো মাঠ এই ধুল্লোউড়ি। এ মাঠ যেমন নির্জন তেমনই আকর্ষকও। এ মাঠ নিয়ে লোকসমাজে প্রচলিত আছে হরেক রকমের ছড়া, যার বিষয়বস্তু প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন গান।

ধুল্লোউড়ির মাঠে দিনান্তে ফিরতি পথে নবীনের সঙ্গ নেয় কোনো এক যুবতী গৃহবধূ। সম্ভবত নিজ পিসি গৃহ থেকে শ্বশুর গৃহে যাচ্ছিল বধূটি। তার পিসি তল্লাটের পরিচিত মানুষ নবীনকে দেখে ভাইঝিকে নিশ্চিন্তে নবীনের সঙ্গ নিতে বলে। নবীন পিছু পিছু আসতে আসতে বধূটি তার সঙ্গে আলাপ জমায়। নবীন বধূটির ঠাই-ঠিকানা বলতে পারছে না দেখে মেয়েটি জানিয়ে দেয় নবীন তাকে সূর্যমুখী বলে কোনো একদিন সম্বোধন করেছিল। 'সূর্যমুখী' শব্দটি শুনে নবীন পিছন ঘুরে বধূটিকে ভালোভাবে দেখতে গিয়েই তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ে। নির্জন

ধুল্লোউড়ির মাঠ সেই কামনাকে যেমন প্রগাঢ় করে তোলে তেমনই খুব সহজে নির্ভর ও নিশ্চিন্ত মনে করা বধূটির রসিকতা, আবদার আহ্লাদ নবীনকে নারীটির প্রতি প্রবলরূপে আকৃষ্ট করে তোলে। ফলে নবীন তাকে ছোঁয়ার ছল খুঁজতে থাকে। সে ছল পেয়েও যায়। মেয়েটির এই কথায় যেমাত্র কদিন আগে কেবলমাত্র দু-আনা পয়সার জন্য তার পছন্দের দগদগে জবা রঙের হাতকাটা ব্লাউজটি নবীন তাকে বিক্রি করেনি। পত্রপাঠ নির্জন মাঠের মাঝখানে নবীন তার বোঁচকা খুলে সূর্যমুখীকে জামাকাপড় দেখাতে শুরু করে। কাঙ্ক্ষিত ব্লাউজটি না পেয়ে সূর্যমুখী হতাশা হয়ে পড়লে নবীন আরও অনেক দামি দামি জামা দেখাতে থাকে যে তালে বাড়তে থাকে তার কামনার ঘোরে। এই কামনাকে আপ্রাণ সামলাতেও থাকে নবীন। কখনো সামান্য সংযম হারিয়ে জামার মাপ দেখানোর ছলে সূর্যমুখীর দু-কাঁধ চেপে ধরেও পরখ করে নিতে চায় সূর্যমুখীর মনকে। সূর্যমুখীর সরল ব্যবহার তাকে আরও প্রলুব্ধ করে। সেই প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখী সম্পর্কে আরও খানিকটা নিশ্চিন্ত হবার জন্য নবীন তাকে বিনামূল্যেই ব্লাউজ দিয়ে দিতে চায়। সূর্যমুখী জানায় পছন্দের ব্লাউজটি পেলে সে বিনামূল্যেই নিয়ে নেবে। তবে হাজার খোঁজা-খুঁজির শেষে জানা যায় সূর্যমুখীর পছন্দের ব্লাউজ অন্যত্র বিকিয়ে গেছে। ফলে কিছুটা হতাশ নবীনের কুঞ্চন রেখা ফুটে ওঠে। সূর্যমুখী নবীনের সত্যকার উদ্দেশ্যে এঁচে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। পিছনে ঘোরগ্রস্ত কামনার সঙ্গে লড়াই করতে করতে নবীন শেষপর্যন্ত নিজেকে সংযম করতে সক্ষম হয়।

মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর লোভের বিচিত্র প্রকাশ তার অর্থলোভে; সম্পত্তির লোভে। শরীর-কামনার চেয়ে মানুষের টাকার ও বিষয়ের কামনা কিছু কম নয়। সময় বিশেষে কুড়ি-পঁচিশ টাকার জন্যও মানুষকে খুন করতে পারে মানুষ। এই সত্য প্রচ্ছন্ন রাখেননি সিরাজ তাঁর গল্পে। 'সোনার পিদিম' একটি অনবদ্য উদাহরণ। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ বারিকদের বাড়ির পুরনো চাকর জানাই। গ্রামের পুরনো মন্দির কালীপটের সাধুর চেলা হয়েছিল সে। সেই সাধু অন্তর্ধান হলেন একদিন। জনাইয়ের মধ্যে দেখাদিল পরিবর্তন। তার জটা গজাচ্ছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় সে কালীপটের সাধুর কথা বলে। ক্রমে বারিক বাড়ি ছেড়ে সে কালীপাটে গিয়ে সাধুর মতোই বাস করতে থাকে। বারিকদের বুড়ো কর্তা মন্মথ বারিক মাঝে মাঝে যান তার কাছে। তার কথায় মাঝে মাঝে চমকে ওঠেন। হাওয়ায় ভাসে গুঞ্জন। কোথায় লুকানো আছে সোনার প্রদীপ। তা

খুঁজে পেলে আবার দেবী প্রতিষ্ঠা করবে জনাই। কালীপাট জমজমাট হবে। এক রাত্রে জনাই খুন হয়ে যায়। পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় রহস্য। তিরিশ ভরি সোনার প্রদীপটির জন্য আগের সাধুকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল মন্মথ বারিক ও তার ছেলে সুমন্ত বারিক। জনাইকেও খুন করলো তারাই। প্রদীপ অবশ্য পাওয়া যায়নি। মন্দিরের গর্ভগৃহে নয়, সে প্রদীপ পোঁতা আছে জলের তলায় পাঁকের মধ্যে। দুটি হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সঙ্গেই জড়িত থাকলেও ছেলের হাতে জনাই খুন হয়েছে। জেনে বারিকদের বুড়ো কর্তা বলেন, 'বাড়ির পুরনো লোক ছিল জনাই। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছেরে সুমু।' ছেলে ধমক দিয়ে বলে—'থামুন! রাতদুপুরে আদিখ্যেতা করবেন না তো'। মানুষের লোভের কদর্যতা এ গল্পে অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়। কারণ প্রথমত, বারিকদের কোনো অর্থাভাব ছিল না। দ্বিতীয়ত, প্রদীপটি ঠিক কোথায় আছে না জেনেই খুন করতে হাত কাঁপেনি বারিকদের ভদ্রলোক ছেলের। সে জন্য এতটুকু অনুতাপও নেই তাদের। এখানেই জনাইকে অসাধারণত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। সাধুগিরির সূত্রেই জনাই উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের মুখোশ খুলতে ব্যবহৃত হল।

জুয়ার নেশা নিয়ে আশ্চর্য গল্প লিখেছেন সিরাজ—'জুয়াড়ি'। সীমান্ত এলাকায় আঁধার মাঠে রাতে বসে জুয়ার আসর। নানান অঞ্চলের জুয়ার নেশাগ্রস্ত মানুষ আর পাকা জুয়াড়িরা এসে ভিড় করে সেই মাঠে। জুয়ার নেশা, জুয়ার হিংস্রতা, জুয়ার মোহ—এক অদ্ভুত নকশা তৈরি করেছে গল্পটিতে। সেই সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই বিপজ্জনক সীমান্ত অঞ্চলের বৈধ-অবৈধ'-র বিভাজন রেখা মুছে যাওয়া সত্য ছবি।

গ্রাম বাংলার নিম্নবর্গ মানুষদের মনস্তত্ত্বকে বুঝতেন মুস্তাফা সিরাজ। যে কারণে তাঁর বহু গল্পে স্থান পেয়েছে সেই সব নিম্নবর্গের মানুষজন। বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁদের দুর্দশার জীবনবৃত্তান্ত। মানুষ 'ভূতের গল্প' শীর্ষক গল্পে বটকেষ্টর মৃত্যু হয়েছে কিছুদিন আগে। অথচ সেই বটকেষ্ট বাড়ির পেছনে কাঁপা কণ্ঠে আওয়াজ লাগায়। 'ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম ঘনা রে'। ঘনশ্যাম চমকে উঠলেই সে আবার বলে—'আমি এখন মরা মানুষই বটে। কাজেই চেপে যা। ...আমি যে বেঁচে বত্তে আছি, একেবারে চেপে যা।' গল্পের শুরুতে ভূতের গল্পই মনে হবে। কিন্তু এর গভীর সিরাজ একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করেছেন। তাদের তেঁতুল

তলার জমিটা এখন হরেনের কবজায়। বটকেষ্টর বৌমা এই জমি ছিনিয়ে নিতে জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে দিতে আসে। বটকেষ্টর মৃত্যুর খবরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল হরেনও। কিন্তু জমিতে গিয়ে ঝাণ্ডা দেখে হরেন ভীষণ জ্বলে ওঠে। ঠিক এই সময়ে তেঁতুল গাছের উপর থেকে সেই ডাক—'হন্না নাকি রে। ও হন্না।' আওয়াজ শুনেই হরেন তেঁতুল গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা মূর্তি ডালে বসে দুটো ঠ্যাং দোলাচ্ছে। হরেন বলে ওঠে—'কে কে?' এই গল্পের মধ্যে ভূত থাকতে পারে। কিন্তু যাদের ওই জমিটুকু ভরসা তাদের জমি যে সহজে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না এই বার্তাটাই দিয়েছেন সিরাজ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাজনতলা' গল্পটিতে অন্ত্যজ মানুষ বাগদি, ডোম, কুনাই, বাউরি—সমাজের গোষ্ঠী জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বাবা বুড়ো শিব ন্যাংটেশ্বরের মন্দির তলায় গাজনের উৎসব উপলক্ষে পড়ন্ত বিকেলে সমবেত হয়েছে এই সমস্ত ব্রাত্য মানুষের দল। বছরের প্রতিটি দিনই এদের জীবন দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে কাটে। আনন্দের পরশ বলতে এই গাজনের দিন। এই দিনটাতে ন্যাংটেশ্বরের পুজোপলক্ষে পাঁঠাবলি দিয়ে রাতের অন্ধকার শুরু হতেই উন্মত্ত আনন্দে তারা মেতে ওঠে। কণ্ঠভরে মদ খায় আর বিচিত্র রকমের সং সেজে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। কেউ দারোগা সাজে, কেউ হনুমান, কেউ বাবু, ছড়া কাটে, কেউ তাদের সমাজের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নিয়ে গান ধরে।

বিশ্বাস অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির যে পরিচয় বিভিন্ন গল্পে পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে দেখি, অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার কারণে ব্রাত্য-সমাজ অন্ধ-সংস্কার প্রথায় আমূল বিশ্বাসী। তাদের এই বিশ্বাস তাদের অন্তরেরই বিশ্বাস। তবে অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির যে পরিচয় নানা গল্পে অঙ্কিত তা বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে এ মন্তব্য করা যায়, সাধারণ ব্রাত্য-মানুষ আনন্দানুষ্ঠান প্রিয়। সাধ্য তাদের না থাকলেও, অর্থ-লাঞ্ছিত জীবনে যতটুকু পারা যায় জীবনের আনন্দময় দিকটিকে তারা উপভোগ করে। দুঃখ ক্লিষ্ট জীবনে সুখের সামান্য পরশ তাদের নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে পায়। ব্রাত্য মানুষের সংস্কৃতির এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ যেমন, তেমনই তা এই বিশেষ শ্রেণির মানুষের সামাজিক দলিলও।

এছাড়াও 'ডালিম গাছের জিনটি', 'কালবীজ', 'আরেক গাছের গল্প', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'সাপ বিষয়ে', 'একটি উপাখ্যানে' লেখকের সৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়তা সাহিত্য তেমন কিছু নতুন নয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে থাকে এর অনন্য এক দ্যোতনাময় অনুভব। তার সেরা উদাহরণ তাঁর 'আরেক গাছের গল্প'। তাঁর অনুভবে, এ গাছ 'নিছক উদ্ভিদ' নয়, এমন গাছ, যার 'চরিত্র' থাকে, যার জোরে সে 'গড়ে তোলে' তার নিজস্ব পরিবেশ ও আবহমণ্ডল, যে দাঁড়িয়ে থাকে 'এক অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক আদিম সত্তার প্রতিভূ বা প্রতীক হয়ে' আর 'হাজার হাজার চোখ দিয়ে' মানুষ দেখে। এ গল্পে এমন এক 'চরিত্র'-ময় জনশ্রুতি গাছ আত্মহত্যায় উদ্যত এক শিক্ষিত বেকার তরুণকে বহতা জীবনের ফিরিয়ে দেয়। তার তলায় এক ভূমিহীন খেত-মজুরের বিধবা স্ত্রীর মাতৃস্নেহ, দিন যাপনের সংগ্রাম ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এক ঝলক নমুনা দেখিয়ে। এ নমুনা গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের যাপন-পদ্ধতির নমুনা, যার মাঠ-ঘাট-বিল-নদী থেকে পাখি বা জীবজন্তুর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। খবর রাখে, কেমন মরসুরে শেয়াকুল, বেঁচি, কুল বা 'আঁশতে' নামক লিচুর মতো এক ধরনের ফল ধরে।

'ডালিম গাছের জিনটি' গল্পও ভোট রাজনীতির গল্প হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি গল্প-শৈলীর গুণে। মুর্শিদাবাদের নবানী আমলে কোচোয়ান-বংশধারার শেষ সলতে জনৈক জিরাত মির্জার প্রাইমারি পাশ এক মেয়ে দিলবাহারের গল্প এটি। ভোটের রাজনীতি তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। সেও ব্যবহৃত হয় হৃত সম্পত্তি ফিরে পেতে। তার পিতা জিরাত মির্জা নিহত হয় প্রতিপক্ষের চক্রান্তে। তাই এটা স্বাভাবিক যে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসাও তার রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে প্ররোচিত করে। গল্পে মির্জা বাড়ির উঠোনে একটা ডালিম গাছ রয়েছে, সেখানে নাকি একটি সাদা জিন বাস করে; ডালিম যার প্রিয় খাদ্য, যার জন্য এ গাছের ফল কেউ বিক্রি করে না। তবুও তথাকথিত অলৌকিক মহাজাগতিক প্রাণীটি মির্জা পরিবারের কোনো কল্যাণ করেনি। তার মানে, মানুষের সঙ্গে তার প্রতিপক্ষের তরফে যখন তার প্রাণ নাশের হুমকি আসে, তখন শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় দিশেহারা দিলবাহার ওই জিনকেই পথের দিশা দিতে বলে। তবে ভোট রাজনীতির দুর্গন্ধ থাকলেও এ গল্প রাজনীতির নয়, সংস্কারাশ্রয়ী মনোবিকলন ও

জাগতিকতার টানাপড়েনের জীবন-রহস্য, সাহিত্যে যার প্রতিবর্ণন সহজ নয়। কিন্তু এখানে তাও সম্ভব হয়েছে। কেননা, কলমটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের।

মুস্তাফা সিরাজের গল্পের অন্যতম চরিত্র প্রকৃতি ও মানুষ। জীবন অদ্ভুত ঘোর আর মায়াজাল নিয়ে উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পের প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক শুধু নিবিড় নয়; মানুষ প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির সাথেই বাঁধা তার অস্তিত্ব। তাঁর প্রকৃতি সশব্দ, সরব এবং জীবন্ত। তার প্রকৃতির আদিম নিরাভরণ এবং অকপট—"মাঠে তখন হলুদ হেমন্ত। আকাশের রং হট্টটি পাখির ডিমের মতো নীল ধূসর। ধান খেত থেকে সুদিনের ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এবং চারদিকে কুয়াশা ঘুম ঘুম আলস্যের স্বাদ। রাতের শিশির তছনছ করে দিয়েছে মাকড়সার জাল। উদাসীন লালপোকারা সেখানে বসে রোদ শুষছে। আর সেই বিচ্ছুরিত রোদ, শিশির, লালপোকা ও মাকড়সার জাল দেখে মনে হয় ঝুটা রঙিন পুঁতি বসানো রাঙাতার রাজমুকুট সামিয়ানার তলায় ফেলে সাজঘরে চলে গেছে রাজপুরুষেরা।"[৪৮]

সিরাজের গল্পে বারবার আমরা গাছ দেখি। গাছকে তিনি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। গাছ তাঁর গল্পে প্রধান চরিত্রও বটে। 'গাছটা বলেছিল' গল্পে আমরা একটা গাছের কথা শুনি যে গাছটা মানুষের ভাষায় কথা বলে, যে গাছটা মানুষকে মর মর—আর মানুষ মারা যায়। এরকম একটা গাছের কথা বলতে গিয়ে সিরাজ বলেন—"এ যাবৎ বেশ কয়েকটি গাছের গল্প বলছি। সেই গাছগুলি জৈব চরিত্রের। তাদের কেউ কেউ ভয়াল কি নিষ্ঠুর হলেও কেউ কেউ ছিল দয়ালু, সহৃদয়। কেউ জীবন আর পৃথিবীর একটা চমৎকার মানেও বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। এই গাছটার মতো তারা কেউ-ই মানুষের মানুষের ভাষায় কথা বলেনি।"[৪৯] এ ধরণের বর্ণনা পাঠকের কাছে আরও রহস্যময়, আরও অভিনব এবং বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন বর্ণনা চিত্রময় এবং একটা গাছ চিহ্নিত করে মানবভূমি, মানুষের অধিকার, ধর্ম ও বর্ণ ভেদ এবং স্বার্থের চিকনস্রোত—"এই মারক জৈব উদ্ভিদটি ছিল আমাদের গ্রামের নো-ম্যানস-ল্যান্ড, সদৃশ জমিতে। কারণ একদিকে মুসলমান পাড়া, অন্যদিকে হিন্দু পাড়া, মাঝখানে পোড়া, কাছিমের পিঠের গড়ন, আগাছা ঢাকা একটুকরো মাটি। একপাড়া থেকে অন্যপাড়ায় যাতায়াতের রাস্তাটি ছিল তার নিচের দিকটায়। গাছটা ছিল একেবারে কেন্দ্রে।"[৫০]

সিরাজ যে স্বাধীনতা চান, সেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা চেয়েছিল তাঁর সৃষ্ট নায়িকা লীলা। তারই জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে লীলাকে। তার শরীর নষ্ট হয়েছে; মৃত্যু হয়েছে শোচনীয়। অথচ দেখা যায় গল্পের নায়ক লীলার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারেননি ফলে লীলার মৃত্যুতে অস্বস্তি বোধ করেছে। তার অনুভবে লীলা অনেক সহজে প্রাকৃতিক রাজ্য মিশে যাচ্ছে, জড়িয়ে পড়ছে প্রাকৃতিক সব খেলায়। আর সেই খেলা খেলতে গিয়ে লীলা ভেসে গেছে অথৈ জলে। শৈলী গুণের দিক থেকে সিরাজের 'লীলার জন্য' গল্পটি অন্যতম মাত্রা পেয়েছে। তাই শেষে লেখক গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন। গল্পটিতে পুরনো আঙ্গিক ব্যবহার করলেও বাংলা ছোটগল্পে তিনি সংযোজন করেছেন এক বিশেষ মাত্রা।

মৃত্যুবাণী, তার সাথে আশ্চর্যজনক ভাবে কিছু মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দুর্দান্ত রহস্য আর অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গাছটা যখন কিংবদন্তি এবং ভয়াল, তখনই দেখা যায় গল্পের প্রকৃত বাঁক, গাছটি নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়। একশ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে লুঠতে চায় স্বার্থ, সাধারণ মানুষের ভয়-ভক্তিকে সম্বল করে খেলে কূট স্বার্থের খেলা। স্বার্থের খেলায় মিশে থাকে ধর্ম-বিভেদ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও অসহিষ্ণুতা। ক্রমাগত বারুদের গন্ধ ছড়ায়ে, ধোঁয়া ওঠে, লাল হয়ে ওঠে নো-ম্যানস-ল্যান্ড। এই রক্তক্ষয়ের জন্য দায়ী কে? প্রকৃতি, নিয়তি নাকি গাছটাই—"গাছটা বারবার বলে থাকবে, মর্ মর্ মর্। কারণ লোকগুলি বারবার মরছিল। চাপ চাপ রক্ত। নো-ম্যানস-ল্যান্ড রক্তে লাল হচ্ছিল। প্রকৃতিতে তখন বসন্তকাল। এ সময় মৃত্যুও রক্তিম সৌন্দর্য হয়।"[৫১]

'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে' গল্পেও গাছকে গল্পের চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। গ্রাম বাংলার খুব সাধারণ একটা বট গাছ। কিন্তু এটা ঘুমঘুমির মাঠে কিংবদন্তির গাছ। ঘুমঘুমির মাঠ এক বিশেষ জায়গা সেখানে মানুষের ঘুম পায় আর ওই কিংবদন্তি বট গাছের কাছে আসলেই মানুষের মৃত্যুর স্বাদ জাগে। গাছে থাকে এক ডাকিনী ঘুম ঘুম গলায় গান গায়। সেরকম এক গাছের কাছে গিয়ে মানুষ আত্মবিসর্জন দেয়। গল্পের মূল জায়গায় আমরা দেখি পৃথিবীর সেই আদি বিষয় প্রেম, পরকীয়া। যমুনা আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে এসে ডাকিনী তলায় দেখে সুধন্য সুরেশ্বরীর গোপন ও অবৈধ মিলনের স্বাদ। বসন্ত বিকেলের সেই প্রেম, অবৈধ মিলন যমুনার

মধ্যে কামনা জাগায়। সুধন্য প্রেম খেলায় মাতে সুরেশ্বরী আর যমুনার সাথে। এই প্রেম প্রকৃতির সাথে যুগলবন্দী। কারণ গল্পের চরিত্ররা প্রকৃতির সন্তান—"তারা প্রকৃতির মতো স্বাধীনচেতা এবং একরোখা। প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকার ফলে তারা সবকিছুতে প্রকৃতিরই অনুগামী। মেঘের কাছে তারা শেখে ক্রোধের ভাষা, বৃষ্টির কাছে দুঃখের। তারা ফুলের মতো হৃদয়কে করতে পারে বর্ণময়। বন্যার কাছে তারা শিখে নেয় সব ভাসানোর উদ্দামতা। এগুলি প্রকৃতির ভাষাতেই সাড়া দেওয়ার সামিল।"[৫২]

সিরাজের গল্পে প্রেম ও কাম প্রকৃতির সাথে জড়ানো। উড়ো-পাখির ছায়া বিলে জঙ্গলের ধারে সবুজ তাজা দূর্বাঘাসের বিছানা আর খোলা আকাশের নীচে নবীন চৌকিদারের মেয়ে সৈরভীর যৌবনে বান ডাকায় এক খ্যাড়কাটা ব্যাটা। জোয়ান পুরুষের স্পর্শের সাথে প্রকৃতিও যেন স্পর্শ করে কুমারী মেয়ের প্রথম যৌবন। সেই পুরুষ প্রেমে কামে ভাসিয়ে দিয়ে মিশে যায় দলের সাথে। যেন এক উড়ো-পাখির শরীরে ছায়া ফেলে আকাশে মিলায়—"হিজল বিলের চিরকাল সেই সুন্দর আর ভয়ঙ্কর, ঘৃণা আর ভালোবাসার, নিষিদ্ধ শঙ্খচূড় ফের এক হিজল কন্যাকে দংশে দিয়েছে। যত সুখ, তত জ্বালা।"[৫৩]

হিজলকন্যা দংশিত হয় সুন্দর আর ভয়ংকরের ভালোবাসায় ঘৃণায় সবুজ ঘাসের বিছানায় তারা আদিম আনন্দে মাতে, কাম রক্তে বান ডাকায়। তাঁর গল্পে প্রকৃতি, মানুষ আর প্রেম সমর্থক। প্রকৃতি-মানুষ-প্রেম অভিন্ন ও এক রেখায় অবস্থান করে কারণ তার বিশ্বাসের জায়গাটা সেখানেই।

তাঁর গল্পের ভূমি রাঢ় গ্রাম বাংলা এবং রাঢ়ের মানুষের জীবন। সে জীবন প্রান্তিক মানুষের, শুধু প্রান্তিকই নয়; একেবারে আদিম, অকৃত্রিম। রাঢ় বাংলায় অন্ত্যজ মানুষের শেকড় সন্ধান, তাদের জীবন যাপনের নাভিমূলে প্রবেশ করতে গিয়ে তাঁর গল্পে বারবার এসেছে লোকজ মিথ, মানুষের অন্ধবিশ্বাস, আচার, প্রেম, ভালোবাসা, শরীর, প্রকৃতি এবং জীবন সংগ্রাম। রাঢ় বাংলার জীবন দেখা যায় তারাশঙ্করের লেখায়। কিন্তু তারাশঙ্করের থেকে তাঁর লেখার পার্থক্য এখানেই যে তিনি ভূমিপুত্রের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন গ্রামের মানুষ আর প্রকৃতিকে। তারাশঙ্করের 'ইস্কাপন', 'তারিণী মাঝি' গল্পে আমরা সে অস্তিত্বের সংগ্রাম দেখি তার চাইতে অনেক পৃথক

'গোঘ্ন' বা 'পুষ্প বনের হত্যাকাণ্ডের জীবন সংগ্রাম'। এমনই অনেক গল্পের উল্লেখ করা যায় সেখানে রাঢ় বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি ধরা পড়েছে আণুবীক্ষণিক চোখে।

'গোঘ্ন' বাংলা ছোটগল্পে এক বিশেষ সংযোজন। রাঢ় বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, জীবনচর্যা, পশুপ্রেম এবং মানুষ-পশুর অবিচ্ছেদ্য জীবন এ গল্পের বিষয়। রাঢ়ের প্রকৃতির এক অনবদ্য বর্ণনায় অন্ত্যজ মানুষের কঠিন এক নির্মম জীবন আর পোষা প্রাণী ও কৃষকের জীবন নির্ভরতার এক অবিশ্বাস্য চিত্র এটি। 'গোঘ্ন' গল্পের কাহিনীর বিস্মৃতি ঘটেছে বাঘাড়ির চাষি হারাই আর পোষা গরু ধনার কাহিনী নিয়ে। হারাইয়ের ভাই দোলাই চারু মাস্টারের বেহালার সুর শুনে খুব কেঁদেছিল; কথা দিয়েছিল চারু মাস্টারের মেয়ের বিয়েতে যত কলাই আর কুমড়া লাগে, সে নিজে দেবে। বেহালার সুর শুনে ঘুমিয়ে যাওয়া দোলাইয়ের কথা রাখতেই বড়ো ভাইয়ের রাঢ়ের দেশে আসা। রাঢ় তাদের কাছে স্বপ্নের, সেখানে পাওয়া যায় ভাত—"সেই ভাত-সাদা ঝকঝকে-বাঘরি অঞ্চলে শিহরিত ঘটে যায়। ভাগীরথী-ভৈরবী-পদ্মার পলিতে ভরাট নরম মাটির এই সমতল দেশে সাড়া পড়ে যায়। খন্দ ফলমূল গরু-মোষের গাড়িতে বোঝাই করে দলে দলে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে সোনার রাঢ়ের দিকে এগিয়ে চলে চাকায় চাকায় সদ্য তেল মাখানো ধুরির শব্দহীন চাপা আবেগ তখন থরথর করে। আর চলে ভুখা মিছিল। তারা বলে—'হামরা মুসাফির! সফরে চলুন।' ভাগীরথী পেরিয়ে কতক দূরে কেউ এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে পরখ করে। এ মাটির রং সোনালি। এই মাটি শাহ্‌দানা ফলায়। সাদা ঝকঝকে, মিহি চিকন স্বাদু ভাত। ভাঙ্গের গন্ধে মন ভরে যায়। ভুখ মিছিলের মুসাফির মাটির গন্ধ শোঁকে। যেন সেই ভাতের গন্ধ পায়।"[৫৪] মাটিতে ভাতের গন্ধ শুকে আনন্দ পায় আর দু-বেলা দু-মুঠো ভাতই তাদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সুখ—"আর রাঢ়ে তো সবাই সুখী। রাঢ় দ্যাশ সোনার দ্যাশ। সাদা ঝকঝকে স্বাদু সুগন্ধ শাহদানা খায় দুবেলা। বো-ও-জ খায়। ভাবা যায় দু-বেলা ভাত, তিরিশ দিন বারো মাস বছরের পর বছর।"[৫৫]

'গাছটা বলেছিল' গল্পে আমার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখি। 'গোঘ্ন' গল্পে দেখি জমিদার বেঁচে নেই কিন্তু তার মাটিতে গরু কোরবানি নিষেধ। এরকম নানাভাবেই তাঁর গল্পে হিন্দু মতানৈক্য দুই ধর্মের মিথ, অন্ধবিশ্বাস আর বিভেদের রেখা উপস্থিত। 'ভারতবর্ষ' গল্পে বুড়িটার বর্ণনা

পাই—"থুত্থুরে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। রাক্ষসী চেহারা। একমাথা সাদা চুল। ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো তেমনই চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি।"[৫৬] পৌষের ঘন বাদলায় পিচের রাস্তার ধারে ওঠা ছোট্ট এক বাজারে আসে বুড়িটা, তারপর শীতে সে মারা যায়। তাকে ফেলে আসা হয় নদীর চরে, চ্যাংদোলা করে। কিন্তু বিকেলে চ্যাংদোলা আবার আসে গ্রামে। হিন্দুরা ফেলে দিয়েছিল, মুসলিমরা নিয়ে আসে। তারপর দুই দলের দাবী বুড়ি তাদের ধর্মের। হিন্দু মুসলিম দুই দল দাঁড়িয়ে যায় দু-পাশে, ধ্বনি ওঠে নাওয়ায় তাকবীর; জয় মা কালী। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে নড়ে ওঠে বুড়ি। জনতা প্রশ্ন করে বুড়ি তুমি হিন্দু না মুসলমান? উত্তরে প্রাচীন বুড়ি বলে—"চোখের মাথা খেয়েছিস মিনসেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে? ওরে নরক খেকোরা, ওরে শকুনচোর! আমি কি তা দেখতে পাচ্ছিস নে?"[৫৭] এর মধ্যে নিহিত রয়েছে শাশ্বত সেই সত্য—বুড়ির পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে গল্পে গ্রাম্য রাজনীতির কথা যেমন এনেছেন তেমনই দেখিয়েছেন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ডের কথা। তাঁর 'তদন্ত' গল্পে দেখা যায় হত্যাকাণ্ড; যার সাথে জড়িত নারী মাংসের প্রতি লালসা ও উপভোগে নারীকে ব্যবহার। 'দক্ষিণের জানালা' 'কাটা মুণ্ডু'-র নামক ছোটগল্পেও দেখা যায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। আসলে, সিরাজের সাহিত্য তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন ও জীবন দর্শনের ফসল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাশাপাশি কিশোর সাহিত্যগুলিও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। সিরাজ সৃষ্টি করেছেন অমর চরিত্র কর্নেল নীলাদ্রিকে। গোয়েন্দা কর্নেলের রহস্য ভেদের যে অপার ক্ষমতা, তাকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর খুদে পাঠকদের একান্ত আপনজন হয়েছেন। এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত মানুষ ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসা পেয়েছেন।

সিরাজ ১৯৬৮-৬৯ সালে 'অমৃত' পত্রিকায় 'ছায়া পড়ে' নামে একটি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করেন। গোয়েন্দা কর্নেলকে নিয়ে এটি তাঁর প্রথম রচনা। ১৯৭০ সালে কিছু সহযোজন-বিয়োজন সহকারে 'ছায়া পড়ে' নামে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে তাঁর প্রথম গোয়েন্দা গল্পের বই

প্রকাশ পায়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। বিপুল জনপ্রিয়তার জন্য মূল ধারার গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তিনি লিখে গেছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের রহস্য ভেদের কাহিনী সিরিজ।

বাংলা সাহিত্যে 'গোয়েন্দা' গল্প লেখার পর্ব খুব বেশি প্রাচীন নয়। ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলায় এই ধারার লেখনীর আমদানি। পাশ্চাত্য সাহিত্য তথা ইংরেজি সাহিত্যে এডগার অ্যানাল পো-কে প্রথম সফল গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে চেষ্টারটন থেকে কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টির পথ ধরে ইংরেজি সাহিত্য গোয়েন্দা গল্প লেখকের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ডিকেন্সের বহু-পঠিত 'ব্লিকস হাউস' একটি গোয়েন্দা গল্প। তবে ডয়েল বা ক্রিস্টি যেভাবে তাদের গোয়েন্দা কাহিনী দিয়ে সারা বিশ্বকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন, তেমন সৌভাগ্য অন্য কারোর হয়নি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কৃত 'গোয়েন্দা কর্নেল' একজন রহস্যময় চরিত্র। তার বর্ণনা—মাথা জোড়া টাক, মুখে চুরুট, অবসর প্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার। তিনি প্রজাপতি ও পাখি দেখতে ভালোবাসেন; কিছুটা খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। তার হাসিখুশি মুখে দামী চুরুট আর সাদা দাড়ির সঙ্গে লেগে আছে বাংলা ছড়া আর বাগধারা। অনেক সমালোচক মনে করেন; কর্নেলের যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায় তা নাকি ফাদার দাতিয়েনের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। এরই সাথে তিনি সৃষ্টি করেছেন কর্নেলের সরকারি হিসাবে জয়ন্তকে। জয়ন্ত অলস সাংবাদিক অথচ কর্নেলের প্রতিটি অভিযানের সঙ্গী হিসাবে সে অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা জানি কর্নেলের গল্পগুলি জয়ন্তর মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে।

গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে বলা যায় এর মধ্যে জীবনের ভিন্নমুখী বর্ণময়তা থাকে না; তাই অনেক সময় রচনাগুলি একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু সিরাজ তাঁর কলমের কৌশলে এবং ঘটনার বিভিন্নতায় সহজেই এই বাঁধা টপকে গিয়েছেন। এইসব রচনাগুলি তথা রোমহর্ষক রচনাগুলি বহুদিন ধরে পাঠকদের মনের চাহিদা মিটিয়ে আসছে। এগুলি হল—বনের আসর, ডমরু ডিহির ভূত, কালো বাক্সের রহস্য, কালো মানুষ নীল চোখ, পিছনে পায়ের শব্দ, সবুজ সংকেত, অন্ধকারে রাতবিরেতে, কবরের অন্ধকারে, নিষিদ্ধ অরণ্য, নীল মাছি ইত্যাদি। 'আফগান

হাউন্ড রহস্য’ কাহিনীতে একটি রহস্যময় কুকুর ও হৃত-রহস্য উদ্‌ঘাটনের টানটান ছবি। ‘কঙ্কগড়ের কঙ্কাল’, ‘আদিম কঙ্কাল’, ‘গুপ্তধন রহস্য’—এর মধ্যে রয়েছে হত্যাকারী নির্ণয়ের রোমাঞ্চকর ঘটনা। সিরাজের এই গল্পগুলির আবেদন কেবল শিশু কিশোর মনেই আবদ্ধ নয়, বয়স্ক পাঠকদেরও আকৃষ্ট করে তোলে। এছাড়াও ‘ইন্সপেক্টর ব্রহ্মের ৭ তদন্ত’, ‘বিষাক্ত প্রজাপতি’, ‘নেপথ্য আততায়ী’, ‘লালবাবুর অন্তর্ধান রহস্য’, ‘কর্নেলের একদিন’, ‘সমুদ্রে মৃত্যুর স্নান’, ‘কাগজে রক্তের দাগ’ ইত্যাদি রহস্য রোমান্সে ভরা কাহিনীগুলি এই ধারার সাহিত্যের এক স্বকীয়, গতিশীল ইতিহাস নির্মাণ করেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, প্রত্ন সাহিত্য—প্রভৃতি অধ্যয়নের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের পট ও তার বৃত্তকে অনুধাবন করেছিলেন নিবিষ্ট মনে। তাঁর ভাষা বিজ্ঞানে যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য তেমনই নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন নানা দিকে অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সিরাজের ফারসি, আরবিতেও ছিল যথেষ্ট জ্ঞান। তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়ে এযাবৎ দুটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি হল—‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য’ এবং দ্বিতীয়টি হল ‘কথামালা ১’।

সিরাজের প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ হল ‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব’। এই প্রবন্ধটি থেকে আমরা জানতে পারি মুসলিম চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটে বাদশাহ বা শাসন কর্তাদের সাংস্কৃতিক অভিপ্রায় থেকে। মুসলিম জীবনভাষ্য তথা শরিয়তে চিত্রকলা নিষিদ্ধ সাথে চিত্রকলা নিষিদ্ধ ছিল খ্রিস্টানদেরও। প্রথম প্রথম ধর্মযাজকদের ভয়ে ওরা প্রতীকে আঁকত। পরবর্তীকালে ইতালির রেনেসাঁসের সময় পুরো দরজাটা খুলে যায়। মুসলমানদের দরজাটা খুলেছিল পরের যুগে; তবে চিত্রকলাকে ধর্মের বাহন করেননি।

ইউরোপীয় শিল্পকলাবিদরা মনে করেন পারস্যে যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিম আধিপত্য ছিল। তাছাড়া শিয়া আরবরাও একসময় পারস্যে শাসন করেছে; তাই সেই সময়ে মুসলিম চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছে। গজনীর সুলতান মাহমুদ চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তিনি পারস্যের রাঈ নগরী জয়ের সময় সেখানকার চিত্রকলাগুলি গজনীতে নিয়ে আসেন। চিত্রকলা বা ভাস্কর্য বেশরীয়তী জ্ঞানেও নিজের প্রাসাদে আঁকিয়েছিলেন সুলতান মামুদ।

পারসিক চিত্রকলা এবং উত্তরাধিকার জাত হিন্দু চিত্রকলা প্রভাবিত ভারতীয় মুঘল চিত্রকলার সৌন্দর্য আমাদের অভিভূত করে। মুসলিম চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকেই মুসলিম চিত্রকলা বলা হয়েছে। আদি মুসলিম চিত্রকররা নিসর্গ ও প্রাণের পাশাপাশি ধর্মকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা যীশুর জীবনও চিত্রিত করেছেন। মুসলিম চিত্রকরদের হাতেই বাইবেলের অসংখ্য কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্রকলার ধর্মীয় উপকরণের মধ্যে একটি অসাধারণ বিষয় হল 'বুরাক'। বর্তমানে আমরা যে সব বুরাকের ছবি দেখতে পাই তা হল—এলানো চুল, নারীর মুখমণ্ডল, মাথার মুকুট পরে ঘোড়ার পিঠে বসা এবং ডানাওয়ালা ঘোড়া। বুরাকের চিত্র-কল্পনায় দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি ছবিতে বুরাকের পিঠে পয়গম্বরকে সর্বলোকের সীমান্তে দেখানো হয়েছে। তবে পয়গম্বরের ছবি আঁকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই শুধু বুরাককেই দেখানো হয়।

'মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব' গ্রন্থটির এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'যিশু খ্রিস্ট'। আমরা যীশুকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক বলে জানি। কিন্তু সিরাজ সাহেব জানিয়েছেন যীশু কোনো নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। প্রমাণ হিসেবে তিনি আধ্যাত্মবাদী ফারসি পণ্ডিত অধ্যাপক মরিস গোগেলের 'দি প্রিমিটিভ চার্চ' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। ইসলাম মতে যীশু কুমারী মরিয়মের পবিত্র সন্তান হজরত ইসাই যীশু নামে পরিচিত। মুসলিম জনকথা অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের আদি গুরু আদম। স্বর্গে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ফলে আদম ও ইভকে পৃথিবীতে চলে আসতে হয়েছিল। আদমের দশম পুরুষ হচ্ছেন হজরত নূর বা নোয়া; যিনি মহা প্লাবনে নৌকা ভাসিয়েছিলেন। নূর ছিলেন ঈশ্বরের পয়গম্বর। তাঁর দশম পুরুষ হজরত ইব্রাহিম ইহুদীদের প্রথম পুরুষ। এই ইব্রাহিমের দুজন সন্তান—ইসমাইল ও ইসরায়েল। খ্রিস্টান মতে ইব্রাহিমের সন্তানের নাম ইসাজাক বা আইজাক এবং ইসমাইল। ইসলাম মতে, ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলের ৭০তম মুসলিম ধর্ম পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সা.)।

যীশুর বাল্য থেকে যৌবনের তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন অন্ধকারময়। উনিশ শতকে রুশ পর্যটক নতকোভিচ মনে করেন—যীশু বৌদ্ধ সাধুদের সংসর্গে কাটিয়েছেন এবং পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, যীশু তেরো বছর বয়সে ভারতে আসেন। সিন্ধু এলাকা হয়ে ওড়িশায় এসে জগন্নাথ দর্শন করে ঘুরতে ঘুরতে তিব্বত পৌঁছান। তাঁর মতে যীশু সংস্কৃত ও পালি ভাষা শেখেন; বেদ ও বৌদ্ধ দর্শনেও পাঠ নেন। তারপর পারস্য হয়ে প্যালেস্টাইনে ফিরে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। যীশু ছিলেন ইহুদী বংশের সন্তান। এই ইহুদীরা নিজেদের বলেন ইসরায়েল কুলের মানুষ।

কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি পুরনো সমাধি ভবন পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষজন মনে করেন সেই কবরটি ইয়ুস আসফের। আবার অনেকে এটিকেই যীশু খ্রিস্টের কবর বিশ্বাস করেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যীশু ক্রুশে মারা যাননি। তাঁকে কবরে দেওয়ার পর তাঁর শিষ্যরা মলমের সাহায্যে তাঁর ক্ষত আরোগ্য করেন এবং যীশু গোপনে পারস্য ও আফগানিস্তান হয়ে কাশ্মীর আসেন। কারণ এসব এলাকায় নির্বাসিত ইহুদীরা বাস করেছিল। তিনিই তাঁদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের পর মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'রামমোহন এবং ইসলাম' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন রামমোহন বাল্যকালেই আরবি, ফারসি লিখেছেন, কোরান পড়েছেন। তাঁর মনে ইসলাম যুক্তিবাদ, একেশ্বরবাদ, নিখিল ভারত ভাতৃত্ব, সাম্য এবং দর্শন প্রকরণের গভীর প্রভাব পড়ে। রামমোহনের পক্ষে ইসলামিক ঘরানার বাইরে অবস্থিত ইসলামজাত ঈশ্বরতত্ত্ব এবং দর্শনের বিদ্রোহী ধারাটিকে আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়। তাঁর রচিত 'তুহফাত উল মুসাহদিন' প্রকৃতপক্ষে একটি দার্শনিক সনদ। এই ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছিল অন্ধকার বিনাশী আলো জ্বালানোর ডাক। সিরাজ সাহেব মনে করেছেন যদি রামমোহন ঘোষিত সে ডাক এদেশের ধর্মবিশ্বাসীরা শুনতেন তাহলে আমাদের বিশাল মাতৃভূমি খণ্ডিত হত না। তিনি যে পথে হেঁটেছিলেন, সে পথ নব-নির্মাণের কাঠামোতে হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, খ্রিস্টান আছে। বেদ, বাইবেল, কোরানের অন্তর্নিহিত সত্য সেই কাঠামোর ভিত্তি। রামমোহন ইসলামে খুঁজে পেয়েছেন বেদান্তের সত্য, বেদান্তে খুঁজে পান ইসলামের সত্যকে আবার তিনিই বাইবেল আবিষ্কার করেন ভারতীয় ঋষির সিদ্ধান্তকে।

সিরাজ 'জীবন্মৃত্যু অমরতা : গিলগামেশের এপেক' প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন গিলগামেশের এপেক খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকের লেখা। এটি সৃষ্টির মহাকাব্য; গিলগামেশের অভিযানের অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান। গিলগামেশ ছিলেন উরুদ বা এরিখের রাজপুত্র। উৎশৃঙ্খল, খামখেয়ালী, উদ্ধত এবং মহাবলী এই রাজপুত্রের অত্যাচারে এরেখবাসী অতিষ্ঠ। অমৃত সন্ধানী গিলগামেশ বলেছেন জীয়নকাঠির সন্ধানে। এই এপেক আছে জীবনের বাস্তব আকাঙ্ক্ষা, সন্ন্যাস আর কঠিনতম সত্য। গিলগামেশ চায় পরিপূর্ণ জীবন, অমরতা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব' সংকলনটির উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে 'বনলতা ও হেলেন', 'ইসলামি জাগরণ না আরববাদ', 'পুরনো জিনিস কতো পুরনো', 'র‍্যালফফিচের বেঙ্গালা-বৃত্তান্ত' ইত্যাদি অন্যতম।

সিরাজ তাঁর সাহিত্য জীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শৈশব জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক টানাপড়েন যেমন তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনই ভাবে উঠে এসেছে কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের কথা। সেই সব লেখা একত্রিত করে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় সিরাজের কথামালা সিরিজের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কথামালা-১' (ডিসেম্বর, ২০১২)। এই প্রবন্ধে আছে ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বয়ান, মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা। নিম্নে প্রবন্ধগুলির বিষয় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

'কথামালা-১' সংকলন গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ 'প্রথমেই সত্যজিৎ'। এই প্রবন্ধে সিরাজ বলেছেন বাঙালি ডাল ভাত খায়, সত্যজিৎ রায়ের রহস্য গল্প পড়ে। ঠিক তেমনই প্রাবন্ধিক নিজেও সত্যজিতের রহস্য গল্প পড়তে গিয়ে টের পেয়েছিলেন বিচিত্র সব বিষয়ে সত্যজিতের নেশা। একজন লেখককে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের অভিসন্ধি এবং মানুষের তাবৎ কিছু অধিগম্য বিষয় রহস্য লেখককে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়—এ ব্যাপারে সত্যজিৎ এক উজ্জ্বল রত্ন।

'নিরেন দা' শীর্ষক নিবন্ধে সিরাজ দেখছেন প্রাণ চাঞ্চল্যময়, বেপরোয়া অথচ সংযম ও দায়িত্ববোধে সচেতন কবি হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উন্নত দেহের মতোই তাঁর মনের গড়ন।

সিরাজের সাহেবের মতে নীরেন্দ্রনাথ কবিদের জগতে অনন্য এবং পরিচিত জনের জগতে অসাধারণ।

সিরাজ 'আমাদের মাটির খবর' নিবন্ধে ষাটের দশকের আলকাপ জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এখান থেকে জানা যায় এই সময়ে হিন্দু-মুসলিম তরুণীরা আস্তে আস্তে আলকাপ ছোকরার স্থান দখল করতে থাকে। এই আলকাপের রূপান্তর ঘটে 'পঞ্চরস' নামে। অনেক জায়গায় আবার 'লেটো' নামেও পরিচিত; তবে লেটো বা আলকাপ হল একই মুদ্রার দুই পিঠ। আমরা জানি কাজী নজরুল ইসলাম কৈশোরে লেটো দলে যুক্ত ছিলেন এবং তার ফলে তাঁর কবিতা ও গানে পৌরাণিক পদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে। আলকাপ দলে থাকাকালীন সিরাজকেও রামায়ণ-মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ মুখস্থ করতে হয়েছিল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'কথামালা ১' প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'বাংলা সাহিত্যের শরৎকাল'। প্রাবন্ধিকের মতে বাংলা কথাসাহিত্যে এখনও শরৎকাল অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের রাজত্ব চলছে। তাঁর সাহিত্য রচনার আঙ্গিকে এমন কিছু আছে, যা এখনও পাঠকের মনে ক্রিয়াশীল হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন—এখনও বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের কাঠামো আঁকড়ে ধরেই পরবর্তী অনেক লেখকরা শ্রেষ্ঠ; এতেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। আসলে শরৎচন্দ্র বাঙালি চরিত্রের এমন একটা ছাঁচ গড়ে দিয়েছেন; যাতে তাঁর গভীর দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

'একটি রবীন্দ্রনাথের বিষয়' নিবন্ধটি রম্যরচনাধর্মী। সিরাজ মনে করেন যে একদিন কোনো ব্যক্তি গবেষণার সিদ্ধান্তে বলে বসতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথ নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা রবীন্দ্রনাথকে বলতেও পারেন পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের উদ্ভাসিত কমিউনিস্ট যন্ত্র। একেশ্বরবাদীরা বলবেন রবীন্দ্রনাথ তাদের। আলোচ্য প্রবন্ধে সিরাজ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশাল প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এই মন্তব্যগুলি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতকে নিয়ে সিরাজ বলেছেন সে একজন আধুনিক মানুষ এবং আধুনিক লেখক। দিব্যেন্দু একেবারে নিজের জায়গায় অবিচল,

তাঁর সব লেখাতেই সিরায়াস বিষয়। তাই প্রাবন্ধিকের 'একটি সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব' লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে দিব্যেন্দুকে বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন সাহিত্য সাধক। প্রায় সারাজীবন ধরে নিজেকে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত করেছেন। সেই সাহিত্য সাধনার ফলস্বরূপ তিনি নানা পুরস্কারও পেয়েছেন। অগণিত পাঠকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে শুরু করে পেয়েছেন সরকারি ও অন্যান্য পুরস্কার। 'ভুয়ালকা পুরস্কার', 'বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার', 'শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার', 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক 'ডি. লিট' খেতাব ইত্যাদি। সিরাজ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২০১২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, কলকাতার নাইটেঙ্গেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যপ্রেমী পাঠকবর্গ একজন প্রগতিশীল সমাজমনস্ক মানুষকে চিরতরে হারিয়ে ফেললেন।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি', ঐক্য, অক্টোবর ২০১৩, প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩৯

২. দত্ত, কিরীটিভূষণ : ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, ২০০৩, পৃ. ৪৪৭

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'কবিতাগুচ্ছ', সমকালের জিয়নকাঠি; জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. তদেব : পৃ. ৪৫

৫. তদেব : পৃ. ৪৭

৬. তদেব : পৃ. ৪৭-৪৮

৭. তদেব : পৃ. ৪৯

৮. তদেব : পৃ. ৫০

৯. তদেব : পৃ. ৫০

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সমকালের জিয়নকাঠি; মায়া নাটক (প্রথম দৃশ্য) জুলাই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৬৯

১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সমকালের জিয়নকাঠি; জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৯৩

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তৃণভূমি', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ১৩১

১৩. তদেব : পৃ. ১৯

১৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২০৭-২০৮

১৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তৃণভূমি', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ২৯

১৬. তদেব : পৃ. ১৭০

১৭. তদেব	:	পৃ. ২৩০
১৮. তদেব	:	পৃ. ২৭৬
১৯. তদেব	:	পৃ. ২০
২০. তদেব	:	পৃ. ২১
২১. তদেব	:	পৃ. ২১
২২. তদেব	:	পৃ. ২১
২৩. তদেব	:	পৃ. ২৪
২৪. তদেব	:	পৃ. ২৫
২৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘বাসস্থান’, আনন্দ, ১৯৮৫, পৃ. ১
২৬. তদেব	:	পৃ. ২
২৭. তদেব	:	পৃ. ৩
২৮. তদেব	:	পৃ. ১৪
২৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘অলীক মানুষ’, দে’জ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২
৩০. তদেব	:	পৃ. ১০১

৩১.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘প্রেম-ঘৃণা-দাহ’, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭৫, পৃ. ১১
৩২.	তদেব	:	পৃ. ১২
৩৩.	তদেব	:	পৃ. ১৩
৩৪.	তদেব	:	পৃ. ২
৩৫.	তদেব	:	পৃ. ১৩
৩৬.	তদেব	:	পৃ. ৩৬
৩৭.	তদেব	:	পৃ. ৩৯
৩৮.	তদেব	:	পৃ. ১১৭
৩৯.	তদেব	:	পৃ. ৮৫
৪০.	তদেব	:	পৃ. ১১৫
৪১.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৭
৪২.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	সেরা ৫০টি গল্প, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৮০
৪৩.	তদেব	:	পৃ. ৮১

৪৪. তদেব : পৃ. ৮৬

৪৫. তদেব : পৃ. ৮৬

৪৬. তদেব : পৃ. ৬৮

৪৭. তদেব : পৃ. ৭৫

৪৮. তদেব : পৃ. ১৩২

৪৯. তদেব : পৃ. ১০

৫০. তদেব : পৃ. ১১

৫১. তদেব : পৃ. ১৮

৫২. তদেব : পৃ. ৯৮

৫৩. তদেব : পৃ. ১২২

৫৪. তদেব : পৃ. ৫৪

৫৫. তদেব : পৃ. ৬০

৫৬. তদেব : পৃ. ১৫৬

৫৭. তদেব : পৃ. ১৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

“সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : ইতিহাস ও রাজনীতি”

মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ইতিহাস একটি গতিপথ তৈরি করে দেয়। একজন সাহিত্যিক ইতিহাস ও রাজনীতির নানা ঘটনা সাহিত্যে এনে তাকে সাহিত্যগুণে সম্পন্ন করে তোলেন। সাহিত্যে পঞ্চাশের দশক বা সমগ্র বিশ শতক এক পরিবর্তনের সময়; শুধু বাংলার জন্য নয়, মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরের মতো ঘুমন্ত গ্রামগুলিকেও জাগিয়ে দিয়েছে। সিরাজের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর। আমরা তাঁর জন্মের আগের থেকে ঘটনাগুলি খুঁজে ইতিহাসের সাথে সময়ের যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করবো। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ‘শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে চৈতন্যকে উদ্দেশ্য করে কাজি বলেছেন—

> “গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
> দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।।
> নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
> সে সম্বন্ধ হও তুমি আমার ভাগিনা।।”[১]

রক্তের সম্পর্কের চেয়েও মাটির সম্পর্ক অনেক বেশি পোক্ত। একে ভৌগোলিক জাতীয়তা বা ভাষার জাতীয়তা বলাই যায়। ভাষা-বন্ধনের পরোক্ষ কাজ আরম্ভ হয়েছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনকালেই (১৪৯৪-১৫১৯)। চৈতন্যদেবের প্রশংসা বাক্যেই সে কথা প্রমাণ করে—

> “গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
> তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময়।।”[২]

অনেকেই মনে করে থাকেন 'গুণরাজ খান' উপাধি হোসেন শাহের দেওয়া। কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্র তা খণ্ডন করে বলেছেন—হোসেন শাহেব রাজত্ব মালাধরের অনেক পরে। অর্থাৎ হোসেন শাহের আগে থেকেই সুলতানরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ফলে আপামর বাঙালি বদলে গেছে। পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে ভাষা, সংস্কৃতির, পরিধান, বাসস্থান, লৌকিক আচার ও প্রথাতে। যাঁরা বহিরাগত মুসলমান তাঁরাও বংশ পরম্পরায় বাংলায় থাকতে থাকতে নিজেদের পাল্টে ফেলেছিলেন; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পরিবার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমরা জানি সুলতানি আমল থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সত্যপির, বনবিবি, ওলাবিবি নানা লৌকিক উপাসনা। গ্রামীণ সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে এগুলি আজও প্রচলিত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর দাদু সম্পর্কে বলেছেন—"ওহাবী আন্দোলনের কড়া সমর্থক এবং গোঁড়া ফরাজি ছিলেন।"[৩] কিন্তু ওয়াহাবী ও ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—ওয়াহাবীরা পৌত্তলিকতাবাদের কঠোর বিরোধী ছিলেন; এমনকি পিরকে তাঁরা মানতেন না। অপরদিকে ফরাজি আন্দোলন বাংলার মাটি থেকে উঠে এসেছে। এই আন্দোলন বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গে; ফরিদপুর জেলা এর প্রধানকেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া জেলায় তারিক-ই-মোহাম্মদিয়ার প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়। সিরাজের পরিবার মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ হওয়ায় তরিকারই অনুসারী হওয়ার কথা কিন্তু সিরাজের দাদু সবকিছুকে মিলিয়ে গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক বাঁধা ও মানসিক দূরত্ব থাকলেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন জাতীয়তার বন্ধনে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছেন। এখানকার মুসলমানরা যেহেতু বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত এবং ইসলামীয় আচার ও ধর্মে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাই উত্তর ভারতের মুসলমানরা তাদের সমগোত্রীয় ভাবেনি। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ছিলেন সবদিক দিয়ে হেয়। এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সিরাজ 'রামমোহন এবং ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে মনে করেছেন, উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার মূলে রয়েছে ইসলাম। রামমোহন

রায় একেশ্বরবাদের ধারণা পেয়েছেন ইসলাম থেকে; ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলেও এই ধারণা কাজ করেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পিতা আব্দুর রহমান ফেরদৌসি কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন। এই আন্দোলনের টানেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। মদ-গাঁজার দোকানে ভাঙচুর, পিকেটিং, বিদেশি কাপড় পোড়ানোতে যুক্ত থাকায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস কারাবরণ করেন। আমাদের আলোচ্য সময়ে ১৯৫০ খ্রিস্টপূর্ব পাকিস্তানে ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের নানা ঘটনা ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরাতেও সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। মুহম্মদ খুদাবক্স ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা নামক দুই বিধায়ক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন—“মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিমতিতা ও বেলডাঙ্গায় সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে, তাহার ফলে মুসলমানগণ বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফলে কিছু পরিবার পার্শ্ববর্তী ডোমিনিয়নে চলিয়া যাওয়ায় আমরা মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া ওই অঞ্চল পরিদর্শন করি এবং সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখি।”[৪]

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন চরমে পৌঁছায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব; যদিও কেন্দ্রের নেতারা উর্দুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা চেয়েছিলেন গোটা দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রী ২৭শে জানুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসে বলেন রাজ্যে বাংলার পাশাপাশি উর্দুও থাকতে পারে। প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকা হয় এবং এই ছাত্র বিক্ষোভ সামাল দিতে না পেরে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলি খেয়ে ছাত্ররা যেখানে মারা যায় সেখানেই পরে নির্মিত হয় শহীদমিনার। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়। আমরা জানি শহীদদের মধ্যে বরকতের আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বাবলা গ্রামে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আব্দুল বরকত সাহেব বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়েছেন। ‘আত্ম কথা’ থেকে আমরা জানতে পেরেছি বরকত সাহেব সিরাজের চেয়ে বয়সে দু-বছরের বড়ো এবং ক্লাসে এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। দুই প্রান্তের ঐক্যকে দৃঢ়

করতে পূর্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জার জন্ম মুর্শিদাবাদে; মীরজাফর তাঁর প্রপিতামহ।

সিরাজ সাহেবের জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে আলকাপ দলে। তিনি এই দলে যুক্ত হয়েছিলেন মূলত আইপিটির সাংগঠনিক তাগিদে। এই সময়ে সিরাজ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মুর্শিদাবাদ শাখার কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁদের নেতা সুধীন সেনের নির্দেশে তিনি গণনাট্যের উপযোগী লোকসংস্কৃতির খোঁজে আলকাপে প্রবেশ করেছেন।

আলকাপের যুবকদের প্রিয় চর্চার বিষয় ছিল বাঁশি। তাদের মধ্যেই সিরাজ বেড়ে উঠেছেন। এই বাঁশিই সিরাজকে আলকাপে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। তাঁর নাটকে ও যাত্রায় অভিনয় করার অভিজ্ঞতা ছিল—‘‘নাট্য ভারতী নামে তাঁর একটা নাটকের দলও ছিল। সেখানে তিনি শুধু অভিনয় নয়, পরিচালনারও দায়িত্বে ছিলেন।’’[৫] ১৪-১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। তিনি স্কুলে পড়াকালীন ‘সিরাজের স্বপ্ন’ নাটকে আলিবর্দির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিরাজ যখন আলকাপ দলে ঢোকেন তখন ছিল আলকাপের সুবর্ণ সময়। ব্রিটিশ শাসনকালে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিল না, পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভোটারকে তোয়াজ করার জন্য গ্রামে গ্রামে উন্নয়ন শুরু হয়—এসবের ফলে আলকাপের ব্রাত্য-দশা অনেকটা কেটে যায়। এই সময়ে আলকাপ গ্রামের পরিসর ছাড়িয়ে শহরগুলিতে প্রবেশ শুরু করে। সিরাজ জানিয়েছেন—‘‘বহরমপুর শহরে অনেকবার আলকাপের আসর করেছিলাম—অনেক দলই করেছিল, তার মধ্যে বার দুই মাত্র গণনাট্যের সংঘের ডাকে। আমি ছেড়ে আসার পরও এ গতি ছিল। কলকাতার যাত্রার মতো গ্রামে গঞ্জে শহরে টিকিট কেটে শ্রেষ্ঠ আলকাপ দলগুলোর আসর বসতো। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চলে আসি। তার আগের সাত-আটটা বছরে ওস্তাদ ঝাঁকসু এবং আরও বহু নবীন ওস্তাদ আলকাপকে আরও উঁচুতে তুলতে পেরেছিলেন।’’[৬] অনেক সময় মেলাকে কেন্দ্র করে আলকাপের আসর বসতো। আর এই সব মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হল জুয়া। এভাবে গান-জুয়া-মেলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে।

সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসেও জুয়ার প্রসঙ্গ আছে—"গভীর রাতে পদ্মাতীরে আম বাগানের নীচে চন্দ্র জুয়াড়ির জুয়ার আসর। চন্দ্র জুয়াড়ি এবার বিনোদিঘীতে মেলা ডেকেছে। পক্ষকালের পারমিট। এ অঞ্চলের সরল সুবোধ মানুষগুলো পোকার মতো মেলার আলোর দিকে ছুটেছে। পক্ষকাল প্রতিটি রাতে গানের আসর বসছে। এলাকায়-এলাকায় ঢেঁড়া পিটিয়ে এসেছে চন্দ্র জুয়াড়ির লোকেরা। যাত্রা না, বাউল ভাজা না, ঝুমুর না—স্রেফ আলকাপ। আর আলকাপ যখন, তখন ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের একা আসর সাত রাত্রি।"[৭] সিরাজ গণনাট্য সংঘের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে আলকাপে যোগ দেন। অর্থাৎ তাঁর একটা দায় ছিল মার্কসবাদ প্রচার করা। সিরাজের বন্ধু কিরীটিভূষণ দত্ত লিখেছেন—"সিরাজের ছিল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। সে চেয়েছিল অনেক বড়ো হতে, খ্যাতিমান হতে। সে বদ্ধ জলার মতো কোনো এক ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। সে চায় স্রোতস্বিনী নদীর মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। নদী যেমন ঝোপ-জঙ্গল, বন-প্রান্তর ভেদ করে এগিয়ে যায়, সিরাজ খ্যাতিমান হওয়ার জন্য সেই রকম শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন লোকনাট্য, লোকগীতি, যাত্রাপালা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে সম্মুখে এগিয়ে গেছে।"[৮] পরবর্তীতে সিরাজ আলকাপ ত্যাগ করলেও আলকাপকে ভোলেননি। তিনি নিজের লেখার মধ্য দিয়ে আলকাপকে জীবন্ত রেখেছেন। বাঙালি সমাজে আলকাপ সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে তাঁর রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পড়েই। তাঁর আগে কেউ আলকাপ নিয়ে এভাবে লেখেননি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত 'উত্তর জাহ্নবী' (১৯৭৪) কথনবিশ্বের আঙ্গিকে লেখা রাঢ়ের মহাকাব্যিক প্রতিবেদন। জহ্নু কন্যার অববাহিকা সংলগ্ন হিজলভূমির কথামালায় পূর্ণ 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলার শরীর জাপটে বয়ে চলেছে এই জহ্নু কন্যা। সিরাজ এই উপন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরাকথার যুগ নিঃশেষিত করে ইতিহাসের প্রাচীন যুগ—বুদ্ধ, শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন অতিক্রান্ত মানসিংহ-মোঘল শাসন-আলীবর্দি, মুর্শিদকুলী স্মৃতিলগ্ন মধ্যযুগ পাঠ সমাপ্ত করে ইংরেজ উপনিবেশ ভারত-গান্ধী-ফরাজি-ভাব আন্দোলন পাঠরত ভারতবর্ষের আধুনিক সমস্বরকেও তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি একুশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত—

১. ভূগোল ও ইতিহাসের দু-চার পাতা,

২. একটি প্রাচীন কড়চা,

৩. জুহ্না মৌলবির কড়চা,

৪. ফাদার সাইমনের দুর্বিপাক,

৫. ইয়াকুব তান্ত্রিক ও বশীকরণ,

৬. রাঢ়ির অন্ত্যেষ্টিয়া,

৭. শেষ রাতের আগুন্তুক,

৮. একটি কলঙ্ক একটি প্রেমের প্রয়াস,

৯. দারোগা হাসি,

১০. একটি সান্ধ্য অভিযান,

১১. পালা বদলের দিনগুলি,

১২. কালকেতুর উপাখ্যান-১,

১৩. কালকেতুর উপাখ্যান-২,

১৪. গোরাং ডাক্তার ফিরে এলেন,

১৫. নকীবদ্বয় এবং বিঘোষণ,

১৬. শূন্যের রাগিণী,

১৭. একটি বিচিত্র লোকগাথা,

১৮. বিদ্রোহের মুহূর্ত,

১৯. ওমর শেখের কীর্তি,

২০. আনন্দ সংবাদ, এবং

২১. অন্ধকার রাতে এক অন্ধ রেলগাড়ি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঔপনিবেশিক গ্রাম ভারতবর্ষকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তারই স্মৃতিচারণ করেছেন এই উপন্যাসে। এখানে তিনি মুর্শিদাবাদ তথা রাঢ় বাংলাকে বাখতিন প্রদর্শিত ক্রোনোটোপের ছাঁচে ফেলে বিশ দশকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক স্বরকে ব্যবহার করে বিশ শতকের সাতের দশকের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। সিরাজ নির্মমভাবে বিদেশি কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করে এবং দেশীয় লোককথায় আখ্যান কাঠামোকে রূপদান করেছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্য, গীতিকবিতার যে আখ্যান কাঠামো সিরাজ তাকেই অনেকটা প্রক্ষিপ্ত করেছেন অর্থাৎ একটা কাহিনী বলতে বলতে তারই প্রয়োজনে অন্য কাহিনীর সীমায় প্রবেশ ও প্রস্থান লক্ষ করা যায়।

সিরাজ 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ এর ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করেছেন এইভাবে—"ভাগীরথীর পশ্চিমপাড় বরাবর এঁকেবেঁকে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে রেলপথ। হাওড়া-বারাহারোয়া লুপ লাইনে পড়ে চিরোটি স্টেশন। কাটোয়া জংশন পেরলে ডানদিকের জানালায় জহ্নু কন্যার লুকোচুরি শুরু হয়। হাউলির সোঁতা পার হয়ে রেলগাড়ি চলেছে। বাঁয়ে আঁরোফর গভীর জঙ্গল। দূর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বাঁকি নদীর অববাহিকা। সেখানে হিজলভাট আর বিষাক্ত ভেলা গাছ। ডানদিকে মুসলমান চাষিদের গাঁ ডাবকই। চিরোটি স্টেশন ঘরের পিছনে ডানদিকে স্টাফ কোয়ার্টার ছাড়িয়ে ধাপে ধাপে পূর্বে নেমে গেছে মাঠ। সেখানে মাটির রঙ লাল। পিছনে তিনশো ফুট ভাগীরথীর মজা খাল। তেরশো বছর আগে জহ্নু কন্যার এই ছিল পথ। খাড়া পাহাড় মাটি দগদগে লাল। রাঙামাটি, চাঁদপাড়া গ্রাম, যদুপুর গ্রাম। এদের দু-দিকে টিলার মতো উঁচু বাঁজা ভাঙা।"[৯] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই ভৌগোলিক সীমা বর্ণনার পাশাপাশি খুবই সচেতনভাবে পুরাকথার স্মৃতিকে তুলে ধরেছেন—"মাঝে মাঝে কোত্থেকে সায়েবসুবো কারা আসেন সেখানে। মাটি পরখ করেন। জায়গায় জায়গায় মজুর দিয়ে মাটি খোঁড়ানো হয়। লোকেরা বলে, দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল রাঙামাটি। সেই সব লোকদের ঠাকুরদারা বলে গেছে, মূল নাম কানাসোনা। কেরু বাউরি মুমুক্ষু ছোটলোক মানুষ। সে মহাভারত

পড়তে পারে না, আঁরোয়ার পালিতবাবুর কাছে শুনেছে, কুন্তির জারজ ছেলে যিনি—কর্ণ তাঁর নাম, এখানেই থাকতেন। তাঁর নাম বৃষ সেন। বৃষ সেনের অন্নপ্রাশনে লঙ্কার রাজা বিভীষণকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সেদিন দাতা কর্ণ সেন মুঠো মুঠো সোনাবৃষ্টি করেছিলেন নগরে। তাই নাম হল কর্ণসুবর্ণ।”[১০] এর সাথে সিরাজ যোগ করেছেন প্রত্ন ইতিহাসকে। সিরাজের বর্ণনায়—“এই সেদিন এলেন একদল পুরাতাত্ত্বিক। তাঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক ছিলেন বেজায় খামখেয়ালি। তাঁর বক্তব্য, তেরশো বছর আগে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল এখানে—এই সেই কর্ণসুবর্ণ। হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন এখানে। লিখে গিয়েছেন ‘লো-টো-বি-চী বা ‘লো-টো-মো-চিহ’-এর কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। ‘রক্ত মৃত্তিকা’ মহাবিহারে ধ্বংসস্তূপ আছে এখানেই। ত্রিশটি সংখারাম ছিল। দু-হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন। সকাল সন্ধ্যে সে কি গম্ভীর গমগমানি!”[১১]

লেখক দেখিয়েছেন এখানকার মানুষরা আজন্ম ইতিহাসের ঐতিহ্য বহন করে হিজল বন-আঁরোয়া জঙ্গল, জহ্নু কন্যা-বাঁকী নদী-স্রোতের স্নেহাদরে গ্রাম পত্তনের উত্তরাধিকার পেয়েছে। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, গোবরহাটি, মধুপুর, বেলডাঙা, কোদাল ঘাট, রাঙামাটি, ডাবকই, চাঁদপাড়া, যদুপুর এবং হাওড়া-আজিমগঞ্জ লোকাল মধ্যবর্তী রেলস্টেশন চিরোটিকে নিয়ে ‘উত্তর জাহ্নবী’ উপন্যাসের ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ফতেপুর পরগনা থেকে আসা বিপত্নীক স্ত্রী গৌরাঙ্গবাবু তার বিধবা মেয়ে স্বর্ণলতাকে নিয়ে চিরোটি স্টেশনের সংলগ্ন জায়গায় বসবাস শুরু করেন। স্টেশনের জন্মলগ্ন থেকেই তারা এখানকার বাসিন্দা। কর্ণ সেনের রাজবাড়ি ভাঙা-রাঙামাটির হেরু বাউরি সারাদিন রাস্তায়-মাঠে আটকে যাওয়া গরুর গাড়ি ঠেলে হাত খরচ চালায়। হেরু বাউরির ডাকাত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী বাঁক নিয়েছে। আঁরোয়ার জঙ্গলে বাঘ, সাপের পাশাপাশি হেরুর মতো বাউরি জাতির মানুষের বাস করত। এখানে মূলত আদিম অধিবাসী, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, নার্ডিক জাতির মানুষরা বাস করে। তাছাড়াও সমগ্র উপন্যাসে অনগ্রসর মুসলমান, তফসিলী জাতি, উপজাতি মানুষদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে স্টেশন মাস্টার হান্টার সাহেব, কলটন সাহেব, অগস্তিবাবু, জর্জ হ্যারিসন, পাদরি সাইমন, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার বাঙালি ব্রাহ্মণ সুধাময় চক্রবর্তী, চাটরার বাসিন্দা ফরাজি ভাব আন্দোলনের স্রষ্টা জুহ্বা মৌলবি, ডাবকইয়ের ইয়াকুব তান্ত্রিক প্রমুখের কথা। এখানে হিজল তৃণভূমির বন্য আবহে পরিবেশিত হয়েছে ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। লেখক ঘটনাক্রমে

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত, ফরাজি আন্দোলনের বহু-কৌণিক বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সিরাজের কথায়—"জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশে সারা এলাকা জুড়ে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অনেক দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষ ছিল, যাদের দু-চোখে ছিল হত্যার নেশা। ছোটবেলা থেকে অনেক হত্যাকাণ্ড ও রক্ত দেখেছি। কথায় কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষি, বাগদি ও গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। ...সংঘর্ষের উপলক্ষ বেশির ভাগই ছিল মাটি বা ফসল। কিন্তু এদের ছিল বাঘের স্বভাব। একই অরণ্যে এক পুরুষ বাঘ অন্য পুরুষ বাঘের অস্তিত্ব সইতে পারত না। এই দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে আমি ভালবাসতাম। তা পেতে চাইতাম। এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড়ো আদিম সেই জগত। প্রাণী ও উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উই ঢিবি, শ্যাওলা ছত্রাক, পাখির, গোসাপের খোলস ভরা সেই আদিম স্যাঁতসেঁতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটি বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি, সে এক পৃথিবী আছে, দুর্গম রহস্যময়—যেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোনো মূল্য নেই। সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা।"[১২] এই বন্যবোধের রঙ দিয়ে সিরাজ 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসের চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন।

'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'জুহ্না মৌলবির কড়চা'। সমগ্র উপন্যাসে জুহ্না মৌলবির উপস্থিতি একটা লড়াইয়ের আবহ তৈরি করেছে। সে ছিল গোকর্ণের পাশের গাঁ চটিরার মানুষ। মৌলবি সাহেব ফরাজি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু; হানাফিদের থেকে আলাদা। হানাফিদের প্রতি জুহ্না মৌলবির মন্তব্য—"হানাফিরা জাহান্নামী—নারকী। ওরা হারামখোর। ওরা গান বাজনা করে বা শোনে। ওরা বিড়ি তামাক খায়। ওরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে। ওরা মেয়েদের পর্দায় রাখে না। ওরা মহরম উৎসবে তাজিয়া গড়ে লাঠি খেলে মাতমজারি করে, অবিকল হিন্দুদের পুজোর শোভাযাত্রা যেমন। তাছাড়া ওরা নামাজের সময় নাভির ওপরে দু-হাত জোড় না বেঁধে তলপেটের নিচে বাঁধে।"[১৩] তিনি খবরের কাগজ পড়েন; বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কলকাতার মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন—'আল এসলাম', 'নওরোজ', 'বুলবুল', 'গুলিস্তাঁ', 'সওগাত', 'মোহম্মদী' ইত্যাদি। এই খবরের সূত্র ধরে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব, গান্ধীজীর প্রসঙ্গ গৌরাঙ্গবাবুর সাথে আলোচনা করেছে। সিরাজ আসলে এই চরিত্রটি

নির্মাণ করেছেন তাঁর দাদুর আদলে। তাঁর দাদুও ওয়াহাবী আন্দোলনের কড়া সমর্থক এবং গোঁড়া ফরাজি ছিল। সিরাজের বাবাও গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে নন কো-অপারেশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, জেল খাটেন।

উপন্যাসে বর্ণিত আঁরোয়ার জঙ্গলে বাঘকে কেন্দ্র করে যে 'ঠাকুর' নামক মিথের জন্ম হয়। অর্থাৎ বন্য প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরারোপের সূচনা—এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জুহ্না মৌলবি ফতোয়া জারি করে। ধর্ম সংস্কারের এই জটিল জাল ছিঁড়ে মানুষের মুক্তিদানই মৌলবির ঐকান্তিক ইচ্ছা—"বস্তুত ফরাজি আন্দোলনের পটভূমিকায় বাহ্যরূপ ব্রিটিশ বিরোধিতা, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলিমদের আত্মাকে শোধন করা—হিন্দুত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করা।"[১৪] জুহ্না মৌলবির প্রধান ও শেষ কর্তব্য হয়েছে ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করা। পাদ্রি সাইমন যখন হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের রাঙামাটির গঙ্গার মজা সোঁতা অংশ ব্যবহারে নিষেধ করে তখন দেখা যায় প্রজা সকলের মধ্যে পাদ্রি বিরোধী বিক্ষোভ। প্রবাদের পাশে দাঁড়িয়ে জুহ্না মৌলবি ফতোয়া দিয়েছে—"সাদা চামড়ার খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বাদশাহি কেড়েছে, অতএব তারা মুসলমানদের দুষমন। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বিশ্বাসী মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কাজ।"[১৫] তার এই ফরমানের জন্য ব্রিটিশরা তাকে নজরবন্দী করেছে। বাউরি পাড়ার সরা বাউরি, যদুপুর, মধুপুর, আঁরোয়ার ওমর শেখ ও স্বর্ণলতাকে নিয়ে মৌলবি সাহেব গোপনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। পাদ্রি-ব্রিটিশরা সেই গন্ধ পেয়ে সাঁতার থেকে তাদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। জুহ্না মৌলবি ফরাজি আন্দোলন করে গাঁয়ের মানুষের কাছে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হতে চেয়েছিল; চেয়েছিল ব্রিটিশ মুক্ত দেশ, ইসলামিক শুদ্ধাচারীয় দেশ। বাঘ হত্যা করে সে ফরাজি মৌলবি থেকে বাঘা মৌলবিতে পরিচালিত হয়েছে। ওমর শেখ চরকা কেটে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষপর্যন্ত কারাবরণ করে।

ডাবকইয়ের ইয়াকুব তান্ত্রিক, অদ্ভুত দর্শনের প্রচারক। সে শব সাধক। আমরা জানি রাঢ় ভূমি হল তন্ত্র সাধনার দেশ। কোদলার ঘাট থেকে মরা তুলে নিয়ে গিয়ে তার বুকে চড়ে তারা সাধনা করে। ঠিক তেমনই ইয়াকুবের ঘরে অনেক মরা আছে। সে লুকিয়ে কালী পুজো করে। তান্ত্রিক ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এর উদ্ভবের মূলে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নেই।

এটি ভারতবর্ষের একটি সুপ্রাচীন সাধন প্রণালী। হিন্দু দর্শন ও ধর্মের সংস্পর্শে তা কোথাও হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের প্রভাবে কোথাও বৌদ্ধতন্ত্রের রূপলাভ করেছে। আবার কোথাও ইসলামি সংস্কৃতির ছোঁয়ায় জিন—আমার বশের মন্ত্রগুপ্তিতে ইসলামি তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মতে মানুষের দেহেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল মতো, নিহিত এই তত্ত্ব তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে গৃহীত হওয়ার সাথে প্রজ্ঞা ও উপায় মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুটি প্রধান নাড়ীর সাথে অভিন্ন বলে কল্পিত হয়। এই আচারতন্ত্রের যথার্থ উত্তরপুরুষ ইয়াকুব তান্ত্রিক।

'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসে গান্ধী-কংগ্রেস, ফরাজি-ওয়াহাবী রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। পাদ্রি সাইমন, জুহ্না মৌলবির আগ্রাসী ধর্মান্ধতাও চোখে পড়ে। আলোচনায় এসেছে বাউরি পাড়ার প্রান্তিক মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধতার ছবি, স্বর্ণলতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হয়ে তার নেতৃত্ব অস্বীকার করে জোট ভাঙার কথা। ওমর শেখ, গৌরাঙ্গবাবু ও ইয়াকুব তান্ত্রিককে ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে বাঙালির ধর্ম সমন্বয়ের চিত্র ধরা পড়েছে। সব আয়োজনের প্রধান ও প্রথমতম অন্তিম রাগ হিসেবে মানুষের আদিম জৈব বোধই জেগে উঠেছে উপন্যাসে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপের উন্মেষ, গঠন ও পরিণত রূপের সার্থক প্রতিনিধি ধনঞ্জয় মণ্ডলের ওরফে ঝাঁকসুর কথা বিস্তৃত বর্ণনা সূত্রে মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন রাঢ় ও বাগড়ি অঞ্চলের সুপরিচিত লোকনাট্য আলকাপের ঐতিহাসিক উপকরণ উঠে এসেছে। আলকাপের নামকরণ, আলকাপের স্রষ্টা ও সৃষ্টি, আলকাপের গঠনরীতি, বিষয়বস্তু, দলের বিভিন্ন ধরনের মানুষ জনের পরিচয় থাকায় উপন্যাসটিতে আলকাপ তত্ত্ব, প্রয়োগ ও রসরূপে ধরা দিয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে সিরাজ জানিয়েছেন—"উপন্যাসের চরিত্রের নামে-স্বনামে এখনও বেঁচেবর্তে আছে এবং পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপার-ওপার যোজন বিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ হাটমেলায় উৎসবে নিরুদসবে লোকগাথা বিস্ফোরণ করেছে। এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির জনপ্রিয়তা লোকসমাজে শ্রেষ্ঠতম।"[১৬]

'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে সিরাজ সাহেব লোকনাট্য আলকাপ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তা ইতিহাস সম্মত—

১. আলকাপের কোনো লিখিত নাটক নেই।

২. আলকাপের পালার নাম 'কাপ'।

৩. এর জন্মস্থল রহিমপুর। আদিগুরু বোনাকানা-বনমালী দাস। এক চক্ষুহীন নাপিত আদিতে জন্ম দিলেন আলকাপ।

৪. দুটো ছোকরা না হলে কাপে বড় অসুবিধা হয়।

৫. সঙদার বা সঙ্গাল না থাকলে আলকাপ চলে না।

৬. তবলায় চালান বাজছে; চালান বলতে দৃশ্যান্তরকে বোঝায়।

৭. রাঢ়ে ভদ্র সমাজ আলকাপের প্রতি এখনও মনে মনে বিরূপ; তারা আলকাপ না বলে, বলে ছ্যাঁচড়া বা ছ্যাঁচড়।

৮. গেনে (গোনা করা ব্যক্তি) লোকের নাস জাতভাই মুসলমান তো ছোঁবেই না, হিন্দুরাও ছোঁয় না—কাপড় তুলে দেখেই পালায়।

৯. পঞ্চ মাদক মিশিয়ে যে নেশা তার নাম পঞ্চরং। ছোকরার কোমর দোলানি, আলগা ছড়া আর ওস্তাদের কবিয়ালী সব কিছু নিয়ে পঞ্চরস।

১০. পদ্মার ওপারে মালদহে আলকাপের বড় খ্যাতি।

এই সমস্ত তথ্যগুলি ইতিহাস সম্মত। উপন্যাসে এই উপাদানগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আলকাপের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান করেছেন। আলকাপের উল্লেখযোগ্য উপাদান হল গান ও ছড়া। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত গান ও ছড়া সম্পর্কে সিরাজ জানিয়েছেন—"যে সব গান বা ছড়ার অংশ এতে দেওয়া হয়েছে—সেগুলিও আলকাপদলে প্রচলিত, অর্থাৎ আমার বানানো নয়। শুধু ঘটনা বা কাহিনী অংশ সাহিত্য শিল্পের রঙে রঞ্জিত করা ছাড়া উপায় ছিল না, এই যা।"[১৭] অর্থাৎ এই গান ও ছড়াগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। যেমন—

১. “সই আমার গঙ্গাজল হে
সই আমার গঙ্গাজল
জন্ম জন্ম ডুবলাম যত পেলাম না তো বুকের তল।”[১৮]

২. “(আমি) মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে–
(আমার) এমন জনম আর কি হবে।
সাঙ্গ হল দেখা শোনা চুকিয়ে দেব লেনাদেনা
(এত) দেখেও তো দেখা হল না
তল পেলাম না ডুবে
(আমার) এমন জনম আর কি হবে।”[১৯]

৩. “বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।
(তোর) সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্তধারায় লালে লাল।
মনে করে হলাম স্বাধীন
আমার মাগো চির পরাধীন–
হয়ে এখন বিশ্বের অধীন,
অন্ন বিনে নাজেহাল।।”[২০]

‘অলীক মানুষ’ বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম রচনা। এই উপন্যাসে বদিউজ্জামান চরিত্রটিকে সামনে রেখে সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ভারত ভাগ পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের কথা উঠে এসেছে। ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়কে অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বিশ্বস্তরূপে বর্ণনা করে সিরাজ ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসটিকে সচেতনভাবে মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যামিনীবাবু, হরিবাবুর সূত্র ধরে ব্রহ্মপুরে গোপনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে যাওয়া, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াস বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অজস্র চরিত্রকে লেখক উপন্যাসে নক্ষত্রখচিত এক উদার আকাশের মতো উজ্জ্বল করে তুলেছেন। লেখক অনুসন্ধানী

দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—“হরিবাবুর কাঁধে হাত রেখে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাই শফি! লোহাগড়ার কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। তবে যা হয়, মঙ্গলের জন্যই হয়। কৃষকদিগের ব্যাপারটা হল হড়কা বানের মতো। ওরা আদর্শ বোঝে না। বৈষয়িক স্বার্থ বোঝে। কিন্তু এই বিরাট কাজে আদর্শবাদেরই প্রয়োজন। আদর্শবাদ শিক্ষা ছাড়া গড়ে ওঠে না।”[২১] তাই তারা স্বামীজি সংঘে যোগদান করেছে। মুসলমান মানুষেরা নিজ সম্প্রদায়ের ব্রাত্য-ধর্ম নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় শফিউজ্জমানের কথায়। সে বলেছে—“স্বামীজি সংঘের সদস্য হওয়ার পর একটা বিষয় লক্ষ করি ক্লাব ঘরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সাধু সন্ন্যাসী দিকের চিত্র লটকানো ছিল। সকলেই হিন্দু। মধ্যস্থলে দেবী কালিকার প্রকান্ড ছবিটির সামনে দাঁড়াইয়া সকল সদস্য করজোড়ে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া প্রণাম করে এবং অনুচ্চ স্বরে ‘আমি দেশ মাতৃকার জন্য প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত’ এই বাক্যটি মন্ত্রবিৎ উচ্চারণ করা হয়। ধর্মের প্রতি ঘৃণা হেতু প্রথম প্রথম সংকোচবোধ করিতাম। মুসলমান বংশজাত বলিয়া নহে। পরে এই প্রক্রিয়ার প্রতি সঙ্কোচ কাটিতে থাকে। ...কিন্তু আশঙ্কা করিতাম, এই প্রক্রিয়া মুসলমানদিগের দূরে সরাইয়া রাখিবে।”[২২] উপন্যাসের লক্ষণীয় বিষয় হল গীতা, উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার, পাশাপাশি প্লেটো, হোমার, হুগো, কিটস, বোদলেয়ার-এর মতো মনস্বী লেখকের মন্তব্য। শফিউজ্জামানের সূত্র ধরেই এগুলি উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাছাড়াও রয়েছে দান্তের ‘ইনফারনো’, কাফকার রচিত ‘মেটামরফসিস’-এর কথা। এরই পাশে সহাবস্থান প্রাক ইসলাম যুগের আরব কবি জুয়াহের বিন আবসালমা এবং বৌদ্ধ দার্শনিক পকুধ কচায়নের। উপন্যাসে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি ভাষার নিপুণ প্রয়োগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের ‘রক্ত তিলক’ অধ্যায়ের শুরুতে সিরাজ জানিয়েছেন—“বাংলা ১২২৯ সনের শুভ ১০ই বৈশাখ সন্ধ্যারাত্রে আমার প্রথম নরহত্যা।”[২৩] অর্থাৎ এতদিনের আদিমতা, গ্রাম, প্রকৃতির পরিমণ্ডল ভেঙে উপন্যাসটি এক নতুন প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। গ্রামীণ নারীর রক্ত রাঙা বুকের ব্যথার কথা উঠে এসেছে আয়মনি চরিত্রে। ফরাজি-ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবে গ্রামবাংলার রমণীরা তাদের আপন সত্ত্বা লোকসংস্কৃতির ধারাকে বিসর্জন দিতে বসেছিল। আয়মনির মতো সাহসী মহিলা সেই ক্ষীণতোয়া ধারাটিকে পুনর্জীবিত করতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও সিরাজ দেখিয়েছেন মুসলিম সমাজ, ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের ভাব-সংঘর্ষ,

হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলিমদের কোণঠাসা করে রাখার জন্য মুসলমানদের মধ্যে দুঃখ-বেদনা ও অভিমানের কথা। বদিউজ্জামানের পরিবারের মধ্যেই ধর্মীয় আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে মতভেদের পাশাপাশি স্ববিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি মুসলিম ধর্মগুরু, পূর্ব বাংলার বিখ্যাত ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লাহর শিষ্য ছিলেন। এই ধর্মমতের প্রতি তিনি এতই অনুগত ছিলেন যে নিজের ভাই ফরিদুজ্জমান সুফি মজনুন হওয়ায় তা তিনি মেনে নিতে পারেননি। বদিউজ্জমান নিজের বড় ছেলে নুরুজ্জম্মানকে দেওবন্দের বিখ্যাত মাদ্রাসায় পড়িয়ে খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মৌলাহাটের অভিজাত মুসলমান ও নবাবী এস্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী চৌধুরী আব্দুল বারির উৎসাহে বদিউজ্জমান তার ছোট ছেলে শফিউজ্জামানকে ইংরেজি শেখানোর জন্য হরিণমারায় পাঠিয়েছেন। তিনি নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য শফির নির্বাচিত কন্যা রুকুর সঙ্গে বিয়ে দেন মেজ প্রতিবন্ধী ছেলে মনিরুজ্জামানের। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত নিরুদ্দেশ শফিকে সে মৃত বলে মনে করতেন। অতিরিক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য তাকে খয়ড়াডাঙা ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তির ফলে তিনি বদুপিরে পরিণত হন। শফি চরিত্রে নাস্তিকতা, অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে আত্ম-পীড়নকারী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—আসমার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক, সিতারার প্রতি আকর্ষণ, পান্না পেশোয়ারী, রেশম কুটীর অত্যাচারী মালিক স্ট্যালিন, অনন্ত রায়, কাল্লু, মুন্সি ও আব্দুর রহিমকে হত্যা ইত্যাদি ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বালা ও রত্নময়ীর প্রতি তার আকর্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির পরিচয় ধরা পড়ে। নারীর প্রতি শফির আদিম আকর্ষণ তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। কামনা পীড়িত অবস্থায় ঝড়ের রাতে মসজিদ থেকে বদুপিরের সাইদার কাছে ফিরে আসা কিংবা আব্দুলের বউ ইকরাতনের প্রতি আকর্ষণ; পুত্র শফির চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তির রূপায়ন উপন্যাসটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

সিরাজের লেখার পটভূমিতে যে ভূমিখণ্ডের মানচিত্র ধরা পড়েছে তা হল—বহরমপুর, লালবাগ, ভগবানগোলা, কৃষ্ণপুর, লালগোলা, ব্রহ্মপুর, হরিণমারা, মৌলাহাট এবং অবিভক্ত বাংলার গঙ্গা-পদ্মা-ব্রাহ্মণী-দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী-ভৈরবী-জলঙ্গি নদী অববাহিকার মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অংশ বিশেষ। এই উপন্যাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাঢ়

বাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে। বদিউজ্জামান সাধারণ মানুষের কাছে হুজুর হিসেবে পরিচিত; লৌকিক-অলৌকিক সব ঘটনারই তিনি পূর্বাভাস পান। মায়ের মৃত্যু তাকে টলাতে পারেনি, কারণ তার মতে সেটা হয়েছে আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায়। যুগধর্মের কোলাজ, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তিতুমিরের বিদ্রোহ, বীরভূম-মুর্শিদাবাদের লোকজ সংস্কৃতি, সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি-ফারসি-আরবি-উর্দু শব্দের ব্যবহার হলেও বাংলার প্রতি অমোঘ টান লক্ষ করা যায়। ঘটনা পরম্পরা, পারিপার্শ্বিক ভাবনা, ফরাজি-সুফি, বাস্তবতা—এসবের প্রেক্ষিতে সিরাজ বদিউজ্জমানকে চিত্রিত করেছেন। রাখীবন্ধন উৎসবে হিন্দুরা সমবেতভাবে মিছিল করে মৌলাহাটের দিকে এগিয়ে এসেছে বঙ্গভঙ্গের ইংরেজ আদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। মুসলিমরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মিছিল মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রণসাজ নিলে বদিউজ্জমান তাদের নিবৃত্ত করেছে। বোঝা যায় বদিউজ্জমান ধর্মের মৌলবাদের রূপই শুধু নয়, বাস্তবের জমিতে তিনি ধর্ম সহিষ্ণুও; ইংরেজকে শত্রু ভাবতেও তার দ্বিধা হয়নি। মিলিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা ধর্মের গোঁড়ামিকে পরাজিত করেছে। ইতিহাসের উপাদানে ভরপুর এই উপন্যাসের কিছু বিষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে—

১. 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটি প্রথাগত রাজা-বাজরার ইতিহাস নয়। রাজা থেকে জমিদার হয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গরিব, ধর্মপ্রাণ, নাস্তিক, অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী সবার প্রাণবন্ত প্রকৃত ইতিহাস সম্বলিত কয়েকটি যুগের প্রতিফলন ঘটেছে।

২. বাংলার ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এক আশ্চর্য ছোঁয়ায় পাঠকের মনোযোগকে আকৃষ্ট করেছে। হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান সব ধর্মের ধার্মিক মনোভাব থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাস লক্ষণীয়।

৩. সিপাহী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তিতুমিরের বিদ্রোহ সব মিলেমিশে এক সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

৪. মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে লালবাগ থেকে ভগবানগোলা থেকে কৃষ্ণপুর থেকে লালগোলা, পদ্মা ও গঙ্গা তীরবর্তী থেকে বীরভূমের গ্রামগুলির লোকসংস্কৃতি উঠে এসেছে। এই রোড ম্যাপ সিরাজের অনবদ্য সৃষ্টি।

৫. উপন্যাসে সব ধর্মের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন সময়ের নিরিখে তার বিচার, সমাজ নীতির সাথে তার যোগ; মানুষের মধ্যে তার প্রতিফলন-প্রভাব এবং ঘটমান জীবনের অনির্দিষ্ট রূপরেখা আর তার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'জানমারি' উপন্যাসে ইতিহাস, পুরাতত্ত্বকে মিলিয়ে দিয়েছেন আঞ্চলিকতার বাঁধনে এবং গড়ে তুলেছেন এক আধুনিকতার নতুন দিগ্বলয়। সেখানে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি মানুষকে সন্ত্রাসের পৃথিবীতে নির্বাসিত করে, ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক চরিতার্থতায় দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ ঘাতকে পরিণত হয়ে মেতে ওঠে পারস্পরিক হনন উল্লাসে। এইভাবে তিনি ভয়, বীভৎসতা, মৃত্যুকে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন এক বধ্যভূমির কথা; তাই হল জানমারি। মহকুমা শহরমুখী পিচ রাস্তার দু-পাশের খণ্ড ভূমি সেই সুদূর ইংরেজ আমল থেকেই ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত নোম্যানস্‌ল্যান্ড। সিরাজের কথায়—"এই প্রাক্তন নোম্যানস্‌ল্যান্ডে দাঁড়ালে দক্ষিণে মুসলিম পল্লি চক্ষুগোচর হয়। ...ওই পল্লিটির এদিকাংশে ভাঙাপাড়া, ওদিকাংশে নামুপাড়া, এভাবে প্রলম্বিত। কোনো অতীতকাল থেকে দুই পাড়ার দুই তালেবর ব্যক্তির মধ্যে পুরুষানুক্রমে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মূল মাটি নয়। এটাই আশ্চর্য, নারীও নয়। সে কি প্রভুত্ব? এও হয়তো অর্ধসত্য। ...কেউই এই হেঁয়ালির জট ছাড়াতে না পেরে Hegemony এই ইংরেজি শব্দটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ...ডাঙাপাড়া-নামুপাড়ার এক্সট্রা-অর্ডিনারি মাত্রাপ্রাপ্ত ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্ব কখনো মাঝে মাঝে বিষাক্ত সাপেদের মতো টানা হাইবারনেশনে মগ্ন থাকে এবং সুপ্তি-কাল কখনো তিন বা চার বছরও দেখা গেছে, অন্তত বড়ো আকারে 'ফিনিস' ঘটার পর।"[২৪] এই বিবাদের ঐতিহ্য সন্ধানে লেখক ফিরে যান ইংরেজি আমলে যখন জেলাবোর্ডের হাতে থাকা এই পাকা সড়কের উত্তরে ছিল হিন্দু পল্লি, মুসলমান পল্লি। এই দুই পল্লির নেতৃস্থানীয় ইউসুফ ও প্রাণনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করে। তখন দুই পল্লির মানুষজন সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে। স্বাধীনতার পর ইউসুফ এবং প্রাণনাথের মনে হয়েছে এই

আজাদি মিথ্যে। তারপর দক্ষিণ ডিহির অনেক রদবদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে মূল্যবোধেরও; তাই 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দিতে পেরেছে। সিরাজ লিখেছেন—"সেই প্রাণনাথ, বৃদ্ধ কিন্তু তখনও প্রাণবন্ত, আজাদিটি ক্রমে সত্য সাব্যস্ত করেন, কারণ চোখের সামনে নেপোরা দই মেরে দিচ্ছিল, তিনি ভোটে জেতেন এবং তাঁর পার্টি সরকার গড়লে স্বহস্তে উদ্বাস্তুদের পাট্টা বিলি করেন।"[২৫] এই বিপ্লবী পুরুষের মৃত্যুর সাত বছর পর তার জায়গা দখল করে তারই উত্তরাধিকারী আইনজীবী পুত্র বীরেন্দ্র—"আরও আশ্চর্য ঘটনা পরম্পরায় এঁর পুত্র শুভ্রাংশু ওরফে ছোটন বিপ্লবের দশকে কলেজ ছেড়ে নকশাল হয়ে কয়েক বছর এবং আশির দশকে এলাকার 'মাফিয়ালিডার' গণ্য, পান্না যার দক্ষিণ হস্ত।"[২৬] ক্ষমতা কায়েম রাখতে তারা জড়ো করেছে আশ্রয়ভোগী দুষ্কৃতীদের; ডাঙাপাড়ার নিয়ন্ত্রণ ছোটনের ডান হাত পান্না হোসেনের, নামুপাড়া রয়েছে হারুনের খাসদখলে। ঔপন্যাসিকের কথায়—"মৌজা দক্ষিণ ডিহির এই দক্ষিণাংশে নৈসর্গিক স্বাধীনতা—সেখানে রাষ্ট্র নেই, সরকার নেই, পুলিশ ও সেনাবাহিনী নেই। এমনকি কোনো কোনো বাবু এই প্রলম্বিত পল্লিটিকে সকৌতুকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে বর্ণনা করতেন। ... উত্তরাংশ হাইওয়ের দু-ধারে বাজারে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস অধুনা, ...। বরং তারা সংঘর্ষ ও রক্তপাতগুলিন, ঘরপোড়া ছাইগুলিন এনজয় করে। লুঠের ধন কেনেও গোপনে। মানুষের শঠতার চেয়ে কেনাকাটার অন্ধকার রাতগুলিনকেই তখন অধিকতর শঠ মনে হয়।"[২৭]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'পদ্মাবতী' ও 'রূপবতী'। পদ্মাবতী উপন্যাস আফগান প্রদেশ কান্দাহারের কাছে নুরিস্তান রাজ্যের উপজাতি কাথিরদের উপকথার ভিত্তিতে রচিত। কাথিররা বিভিন্ন দেশে দস্যুরূপে পরিচিত। এই জনজাতির পুরুষরা ছিল বীর ও সুদর্শন, মেয়েরা সুন্দরী। কাথির গোষ্ঠীপতির পুত্র বিশ বছরের যুবক রুখ তার কাকাতো বোন রিয়ার সাথে বাগদত্তা। কিন্তু রুখ তাকে বিয়ে করতে চায়নি কারণ সে জানে রিয়া তার দেহমন অন্য পুরুষকে দিয়েছে। রুখের কাছে কোনো প্রমাণ না থাকায় সে পরামর্শ নিতে যায় পির সামান্দাশের কাছে। একজন কাথির জনজাতির মানুষের সেখানে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। রুখ মনে করে পির সামান্দেশের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। রুখকে সামান্দেশ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এবং তার সাথে এসেছেন কাথিরদের দেশে। এবং তাদের সাথে এসেছে পদ্মাবতী; সুলতান কারা বরহাম বা কালো বারহামের প্রধানা মহিষী।

পদ্মাবতী ছিল পূর্ববঙ্গের, পদ্মা নদীর তীরের কন্যা; তাকে ছলেবলে ধরে এনে অশ্ব ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সৈন্যরা সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিল। সুলতান এ ধরনের স্নিগ্ধ, শ্যামল বর্ণ পছন্দ করতেন। সুলতানের উপস্থিতিতে হারেম পদ্মাবতীর পক্ষে নিরাপদ নয়, তাই সামান্দেশ তাকে নিজের সঙ্গে কাথিরদের রাজ্যে নিয়ে এসেছেন। সুলতানার পরিচয় দিয়েছেন বৌদ্ধ শ্রমণা বা সন্ন্যাসিনী হিসেবে।

রুখ পির সামান্দেশকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। সামান্দেশ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; গ্রিক অ্যাপ্রন বা অগ্নি গোলকের ব্যবহার জানতেন। বিষয়টিকে অবশ্য লোকেরা তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় মনে করেছে। তিনি কাথিরদের দেশে এসে তাদেরকে নতুন রণ বিদ্যায় প্রশিক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে আশা করেছে একদিন স্বাধীন কাথির রাজ্য, এমনকি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যে খবর এসেছে সুলতান যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। তাই সামান্দেশ পদ্মাবতীকে কাথিরদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কাথির মিলিত জনজাতির সামনে নিয়ে আসেন। সামান্দেশ বোঝানোর চেষ্টা করলেন কাথির ধর্ম আর পদ্মাবতীর হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সমার্থক। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে রুখ পদ্মাবতীকে সবার সামনে তুলে নিয়ে বিবাহ করেছে; কাথির মানুষদের কাছে এমন রাক্ষস বিবাহ সিদ্ধ। এই দেখে সামান্দেশ মর্মাহত হলেন এবং পদ্মাবতীর পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। সামান্দেশ পথে বেরিয়ে পড়েছেন এবং পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। পদ্মাবতী দ্বিতীয় বিবাহে সুখীই হয়েছে।

সিরাজ একটি রুক্ষ, বন্য অথচ সৌন্দর্য প্রিয় জনজাতির জীবনচিত্র চিত্রিত করেছেন দক্ষতার সাথে। উপন্যাসে সামান্দেশ ব্যতিক্রমী চরিত্র, তাঁর জ্ঞান অসীম। অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি তাকে করে তুলেছে প্রায় মিথের ব্যক্তিত্ব। মানুষের বিশ্বাস সামান্দেশ বহু শতাব্দী জীবিত ছিলেন। মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখির ভাষাও বুঝতেন বলে লোকের বিশ্বাস। যুবক রুখের আকস্মিক বিবাহে তার স্বপ্ন ধ্বংস হয়েছে এবং ডেকে এনেছে তার মৃত্যু। সামান্দেশ ধর্মের মানুষরা তাকে চিরকাল পির বলেই সম্মান, শ্রদ্ধা করেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনেও তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

'পদ্মাবতী' উপন্যাসে পদ্মাবতী প্রথমে এক আফগান সুলতানা, পরে এক উপজাতির বধূ হয়েছে। ঠিক তেমনই 'রূপবতী' উপন্যাসে জর্জিয়ার খ্রিস্টান রাজকন্যা সামানি ফিজিলবাশ তাপাশের মহিষী হয়েছে। ফিজিলবাশরা ছিল দুর্ধর্ষ তুর্কী যোদ্ধা। উপন্যাস থেকে জানা যায় তাপিন শরবারি খাসের কাটা মুণ্ডু পারসিক শাহকে উপহার দিয়ে কুহিস্তান রাজ্য পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল। যদিও এর মধ্যে ছিল শঠতা। তাপিন শরবারির প্রকৃত হত্যাকারী ছিল না, সে রূপবান ও শক্তিমান হলেও প্রকৃত অর্থে পুরুষ ছিল না। তাপিন নারী সেজে নৃত্যগীত করতে ভালোবাসত, আকৃষ্ট হত পুরুষদের প্রতি। গ্রামীণ বনদেবীর ছদ্মবেশে জর্জিয়ার রাজকন্যাকে হরণ করে এনে মহিষী করলেও তার কৌমার্য গ্রহণ করতে পারেনি। অপরদিকে মহিষী সামানি সুদর্শন তরুণ বান্দা বারমাকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। তাপিন সবাইকে জানাতে চায় সে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সামানির মালিক। সে বান্দা বারমাককে বাধ্য করে সামনির নগ্ন সৌন্দর্য দেখতে। এই কথা সামানি জানতে পেরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বারমাককে উত্তেজিত, এমনকি বাধ্য করেছে তাপিনকে হত্যা করতে। হত্যার পুরস্কার স্বরূপ মেষপালক বারমাক সামানিকে বিবাহ করে মসনদে বসেছে। এখানে সিরাজের একটি প্রাচীন কিন্তু সুবিদিত মিথ ইতিহাসের সাথে মিশে গেছে। প্রাচীন ক্লাসিকাল ঐতিহাসিক হেরোদোতাস তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি লিদিয়ার রাজা কাঁদল বা কান্দনের এক পরমা সুন্দরী রাণী ছিল। কাঁদল নিজের আনন্দ কারোর সাথে ভাগ না করলে তৃপ্তি পেত না। তাই সে একদিন সেনাপতি গাইগসকে বাধ্য করলেন মহিষীর নগ্ন রূপ প্রত্যক্ষ করতে। রাণী সে কথা জানতে পেরে সেনাপতিকে ডেকে জানিয়েছে তার অনাবৃত, অনুপম সৌন্দর্য দেখেছে; এমন দুজন পুরুষ জীবিত থাকতে পারবে না। রাজাকে মরতে হবে, নয় সেনাপতিকে, রাণীর কথায় সেনাপতি রাজাকে হত্যা করে মসনদ এবং মহিষীকে নিজের করায়ত্ত করেছে। এভাবেই লিদিয়াতে নতুন রাজ বংশের সূচনা হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রাচীন ইতিহাস থেকে কাহিনীর এই অংশ নিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীতে কাহিনীর মোড় সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে। এখানে সিরাজ বলেছেন আরব পর্যটক জাইদ ঘিন ইব্রাহিমের প্রভাবে বারমাক তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছে। বারমাক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শ্রমণ আর্যক ও শ্রমণা শ্রেয় ধারার পুত্র বারমাক। তার বাল্য স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে ভয়াবহতা। বারমাকের মা শ্রেয়ধারাকে ব্যভিচারের অপরাধে মরুভূমিতে

নির্বাসন দিয়েছে সংঘ কর্তারা। এই নির্বাসন মানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জনিত তিলে তিলে মৃত্যু। ভিন্ন পরিবেশে বারমাক যা ভুলে গিয়েছিল, সেই স্মৃতি ফিরে এসে তাকে আপ্লুত করেছে। রাজ্য, স্ত্রী সামানি সব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়—মরুভূমিতে যায় হারানো মায়ের অনুসন্ধানে। তিনি এও জানেন যে, এতদিন পর অস্থিখণ্ড ছাড়া কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এর মধ্যেই বারমাকের ব্যর্থ প্রেমে তার প্রাক্তন প্রভু-কন্যা বিলকিস আত্মহত্যা করেছে। বিলকিসের প্রতিহিংসাবশত চক্রান্ত করে আতস কাঁচের মাধ্যমে মরু সূর্য দেখাতে গিয়ে বারমাকের দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট করে দিয়েছে। শেষে সামানির সাথে বারমাকের পুনর্মিলন হয়েছে।

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান কিংবা ধর্মতত্ত্ব সব বিষয়েই সিরাজের জ্ঞান আর বিদ্যার গভীরতা পণ্ডিত মহলে উচ্চ আসন এনে দিয়েছে। তিনি নাচ-গান-অভিনয়ে নিমজ্জিত হয়ে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। গ্রামের মানুষ, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে সিরাজ বড়ো হয়েছেন। তাঁর লেখার মূল উপজীব্য বিষয়ই ছিল গ্রামের কথা, মানুষের কথা, দেশের কথা, প্রকৃতির কথা। সত্তরের দশকে লেখায় সমাজ-ঐতিহ্য-রাজনীতি-ইতিহাস-কিংবদন্তি সব যেন তাঁর লেখার শিল্পের শিখর ছুঁতে চেয়েছে। বাংলার গ্রাম আর গ্রামের মানুষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে উঠে এসেছে। আর এখানেই রাজনীতির ছায়া পেরিয়ে মানুষের জীবনেরই গভীর অনুভবের বর্ণমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সিরাজের 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স', 'রাখাল কড়াই'-এর মতো আখ্যানগুলি।

বিশ শতকের প্রায় পুরোটাই সিরাজের সময়কালে পড়ে। এবার তাঁর সমকালীন বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হবে। এক পুরুষ আগের থেকে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি হল—

১. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫),

২. ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬),

৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থি-নরমপন্থি বিভাজন (১৯০৭),

৪. ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি (১৯০৮),

৫. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮),

৬. জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড (১৯১৯),

৭. আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২০),

৮. চৌরিচৌরায় থানায় অগ্নি সংযোগ (১৯২২),

৯. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৯২৫),

১০. অসহযোগ আন্দোলন (১৯৩০)।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল–

১. ভগৎ সিংহ, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি (১৯৩০),

২. সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সশস্ত্র আন্দোলন (১৯৩০),

৩. নতুন ভারত শাসন আইন (১৯৩৫),

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫),

৫. রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ (১৯৪১),

৬. ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২),

৭. কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার (১৯৪২),

৮. প্রলয়ঙ্করী বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারি (১৯৪২),

৯. নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬),

১০. কলকাতায় দাঙ্গা (১৯৪৬-১৯৪৭),

১১. তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬),

১২. ভারত বিভাজন (১৯৪৭),

১৩. ভারতের নতুন সংবিধান গ্রহণ (১৯৫০),

১৪. সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২),

১৫. ঢাকায় রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন (১৯৫২),

১৬. নকশাল বাড়ি আন্দোলন ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড, চীন-ভারত যুদ্ধ (১৯৮৪),

১৭. বাবরি মসজিদ ধ্বংস (১৯৯২)।

এছাড়াও নানা বিতর্ক, দেশে একাধিক জঙ্গী হামলা, অসংখ্য বার নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা সিরাজ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সিরাজের সময়টা বাস্তবিকই এক উথলপাথল সময়। অসমের বাংলা ভাষা আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুটো যুদ্ধ, হাংরি বিবর প্রজাতি উপন্যাসের জন্য মামলা, কংগ্রেসকে উৎখাত করে প্রথম বাম পরিচালিত সরকার ও সেই সরকারেও অল্প সময়ের ব্যবধানে পতন-উত্থান-পতন এবং নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব। আধুনিককালে বাঙালির জীবনে এটাই সবচেয়ে নির্ণায়ক সময়। নকশাল নেতা চারু মজুমদার সত্তরের দশককে মুক্তির দশক বলে ঘোষণা করেন। কমিউনিস্ট সরকারে হয়েও যুক্তফ্রন্ট তাঁদের এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। কারণ নকশালদের লড়াই ছিল সি.পি.এম-এর বিরুদ্ধেও। রাজ্যময় ব্যাপক হিংসা দেখা যায়—জোতদার, পুলিশ কর্মী হত্যা থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরের নেতা, কর্মী হত্যা; সেই সঙ্গে মাত্রাছাড়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। যুবকদের হাতে তখন অস্ত্রের ছড়াছড়ি। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময়। নিরীহ বাঙালি সমাজ প্রথম হিংসার পাঠ নিয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সময়। তারই নবীকরণ ঘটেছে এই সময়ে। সাধারণ বাঙালি গৃহস্থ অনিরাপদ এবং আতঙ্কগ্রস্ত একথা সিরাজ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পা.)	:	‘কৃষ্ণদাস কবিরাজ’, কামিনী প্রকাশালয়, মাঘ ১৪১৩ (ব.), পৃ. ৭৭
২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ	:	‘মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, ভূমিকা (i)
৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা	:	নির্বাচিত রচনা, পুনশ্চ, ২০০৬, পৃ. ১৪
৪. বিশ্বাস, সুকুমার (সম্পা.)	:	সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত অধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ২৯২
৫. হায়দার, সৈয়দ মতীন	:	‘বড়দা প্রসঙ্গে’, সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৩, পৃ. ৮০
৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা	:	‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০০ (ব.), পৃ. ৪১
৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	উপন্যাস সমগ্র-২, দে’জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৬৪
৮. দত্ত, কিরীটিভূষণ	:	‘আমার বন্ধু সিরাজ’, সমকালের জীয়নকাঠি, ২০১৩, পৃ. ৯৯
৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা	:	‘উত্তর জাহ্নবী’, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৩, পৃ. ১
১০. তদেব	:	পৃ. ৪
১১. তদেব	:	পৃ. ৭

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা	:	‘নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি’, ঐক্য, ২০১৩, পৃ. ৩০
১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘উত্তর জাহ্নবী’, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৩, পৃ. ৪১
১৪. তদেব	:	পৃ. ৪৭
১৫. তদেব	:	পৃ. ৬১
১৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা	:	উপন্যাস সমগ্র-২, দে’জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৬০
১৭. তদেব	:	পৃ. ১৬০
১৮. তদেব	:	পৃ. ১৬৩
১৯. তদেব	:	পৃ. ১৭৩
২০. তদেব	:	পৃ. ১৭৯
২১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	‘অলীক মানুষ’, দে’জ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৪২-২৪৩
২২. তদেব	:	পৃ. ২৪৪
২৩. তদেব	:	পৃ. ১৭৯
২৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	উপন্যাস সমগ্র-২, দে’জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৮৩-৮৪
২৫. তদেব	:	পৃ ৮২
২৬. তদেব	:	পৃ. ৮২
২৭. তদেব	:	পৃ. ৮৪

তৃতীয় অধ্যায়

“সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : নানা প্রসঙ্গ সন্ধানে”

ক. দ্বন্দ্বময় জীবনের রূপকার :

উপন্যাসের পালাবদলের মধ্যেই উঠে এসেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বাংলা উপন্যাসের ধারাকে তিনি কানায় কানায় সমৃদ্ধ করেছেন। সিরাজের অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, বিষয় সবই ছিল আলাদা ধরনের। তিনি যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তেমনই লোকনাট্য দল আলকাপের মাস্টারও হয়ে উঠেছিলেন। দলের তাগিদে তাঁর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ; এই সূত্রেই তিনি নানা শ্রেণির মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও যে মানুষ, তাদেরও এক প্রবল জীবন আছে; যা প্রেমে-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে, লোভে-ঈর্ষায় দ্বন্দ্ব-মথিত তা তিনি দেখিয়েছেন। এই ধরণের উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–‘তৃণভূমি’, ‘বাসস্থান’, ‘তখন কুয়াশা ছিল’, ‘অরূপ রতন’, ‘নদীর মতন’, ‘রেশমির আত্মচরিত’, ‘অলীক মানুষ’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’ প্রভৃতি।

বাংলা উপন্যাসে নতুন বক্তব্য ও জীবনদৃষ্টির সার্থক রূপকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। স্বচ্ছ সামাজিক জীবন বোধের প্রজ্ঞায়, মানবিক সমবেদনায়, ঘাত-প্রতিঘাতের নিখুঁত বর্ণনার কারুকৃতিতে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি নতুন জগত। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। আঙ্গিক ও অভিজ্ঞতার যুগ্ম বেণীসঙ্গম আমাদের সমীহ আদায় নিয়েছে। সামাজিক চলচ্চিত্রের গণ্ডি ভেঙে, অচল, অনড় সমাজকে পিছিয়ে ফেলে নগর জীবনের সন্ধানে চরিত্রগুলি এগিয়ে গিয়েছে। নিম্নে উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সিরাজের দ্বন্দ্বময় চরিত্রের জীবনকথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

মুর্শিদাবাদের লোকজীবনের পটভূমিতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্যতম উপন্যাস ‘তৃণভূমি’ (১৯৭০)। হিজরোল গ্রাম ছাড়িয়ে সোনাটিকুঠির মাঠ, ব্যানাকাশের বন আর বিল অঞ্চল; এখানকার মানুষ এই তৃণভূমির আশ্রয়ে প্রতিপালিত। এই অঞ্চলের মানুষদের জীবনে আঘাত

হানে আধুনিক জীবনের বুলডোজার, ট্রাক্টর। প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে; চাষের পুরাতন পদ্ধতি অচল হয়ে যায়। এইসব আধুনিক ব্যবস্থা আদিবাসী মানুষদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ফার্ম বানানো বা নদীতে বাঁধ দেওয়া কিংবা চাষবাসের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ তারা মেনে নিতে পারেনি। মেষপালক, গোয়ালা, মাঠ চরানী, ক্ষেতমজুর—এদের রুজি-রোজগার বন্ধ হতে চলে। সেই সাথে অসন্তোষ চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠতে থাকে। মানুষ ক্রমে সচেতন হয়েছে, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও লক্ষ করা যায়। চন্দনার নেতৃত্বে আদিবাসী সাঁওতাল, বেদে, পাখি ধরা, ক্ষেত মজুর, গোয়ালা, মাঠ চরানীরা একত্রিত হয়ে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানায়; লড়াই হয় দ্বারকা নদীর ধারে তৃণভূমিতে। সিরাজ এরই পাশাপাশি রাখাল কবিরাজ, চন্দনা, আদিনাথ, নিশানাথ, শুভেন্দু, সীতা, ঝুমরি ইত্যাদি চরিত্রের সুখ-দুঃখকে চিত্রিত করেছেন।

সিরাজ উপন্যাসটির সূচনাতেই প্রান্তিক জনজীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এখানে দেখতে পাই সোনাটিকুঠির মাঠে 'মৎস্যগন্ধার' সন্ধানে রাখাল কবরেজের নিশিযাত্রা এবং তারপরেই রহস্যময় মৃত্যু। কেউ কেউ বলেছেন খুন, আবার কারও মতে কাল সাপের দংশন। ছোটবাবু আদিনাথ তার যুবতী বউ চন্দনাকে ভোগ করতে মরিয়া বলে অনেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

আদিনাথের প্রথম পক্ষের ছেলে নিশানাথ জানায় সে তার বাবাকে চন্দনার ঘরে রাত্রে টোকা মারতে দেখেছে। এই ঘৃণ্য অপকর্মের সাজা দিতে নিশানাথ তাকে গুলি করে মারতে চেয়েছে। কিন্তু সৎমা সরযূর কথায় আর মারা হয়না 'কুকুরটাকে'। অপমানে আদিনাথ নিজের গুলিতে আত্মবলিদান দিয়েছে। নিশানাথের পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে গৃহবিবাদ লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। সৎমা এবং মামা সঞ্জয় নিশানাথের সম্পত্তি নিজেদের নামে করে নিতে চায়। নিশানাথের পক্ষে কেউ কথা না বলায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পেতে সোনাটিকুঠির নির্জন তৃণভূমিতে বাসা বাঁধে। তার মামা পরাশর চৌধুরী তৃণভূমিতে বাঁধ দিয়ে চাষ করে, ক্যাম্প বসায়; সাথে যুক্ত হয়েছে বহিরাগত শুভেন্দু পালিত। তৃণভূমির মৃত্যু ঘটিয়ে তারা মর্গানাইজ ফার্ম বসাতে চায়; শুরু হয় আরও এক বৃহত্তর সামাজিক সংঘাত। যারা তৃণভূমির দোসর হয়ে বেঁচে আছে, তারাও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দ্বারকা তীরবর্তী সোনাটিকুঠির তৃণভূমিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক সংঘাত। উপন্যাসে দেখা যায় বাংলায় কমিউনিস্ট উত্থানের স্পষ্ট চিত্র। পরাশর ও পালিতের তৃণভূমিতে আধিপত্যকামিতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে মানিক, শঙ্কু, গঙ্গু, চন্দনারা। সোনাটিকুঠির মাঠ দখল করে নেয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। অথচ এই তৃণভূমি অমৃতের পসরা নিয়ে বসে আছে। মাঠ চরানী মেয়ে, বাথানওয়ালা কিংবা ক্ষুধিত মানুষরা অন্নের সন্ধানে এখানে পড়ে থাকে। জলাভূমির বিলে কেউ মাছ ধরে, কেউ গুগলি, কাঁকড়া ধরে আবার কেউ শামুক তোলে, পদ্মমূল তুলে খায়। সিরাজ তাদের জীবনধারাকে উপন্যাসে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন—"চোখের উপর ভাসছিল সেইসব ক্ষুধার্ত রাখাল ছেলেদের দৃশ্য—এক মুঠো চাল নালার হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে চারপাশে বিরাট যারা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব কুনাই বাউরি মেয়েদের কাঠকুটো শাক-মাছ-গুগলি-কাঁকড়া সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা, আর কতো মরিয়া চাষাভুষোর রক্তজল করা ফসলের ক্ষেত ডুবিয়ে দেওয়া ভয়ংকর বন্যা, কতো যুগ যুগান্তরকালের বারবার স্বপ্নভঙ্গের জীর্ণ চলচ্ছবি বুকে নিয়ে এই তৃণভূমি নিষ্ঠুর আর নির্বিকার হয়ে আছে।"[১]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রাঢ় বাংলার একজন দক্ষ কথাকার। রাঢ় বাংলার নিসর্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তৃণভূমি উপন্যাসে—"হলুদ বেলে মাটি-উঁচু শুকনো খয়েরী ঘাসে ঢাকা অসংখ্য আল, ধাপে ধাপে নেমে গেছে দিক চিহ্ন বিহীন বিলাঞ্চলের দিকে। কাঁটা ঘেরা আবাদি ক্ষেতে কোথাও পাকন্ত গম, ছোলা বা খেসারির হলুদ ছোপ। আলে কেয়া কি ফণীমনসার ঝোপ, কোথাও একটা বাবলা কি তালগাছ। বহুদূর অবাধ দৃষ্টি চলে যায় খোলামেলা তৃণভূমির দিকে। তাকে ধূসর বা কিছু খয়েরী দেখায়। দূরে চকচক করে বিলের জল; কিনারায় বোরো ধানের ঘন সবুজ ছোপ। সোনাটিকুরিতে এক বিশাল সমুদ্রের আভাস।"[২]

অন্নদাত্রী তৃণভূমি যখন ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখনই এসেছে প্রবল প্রতিবাদ নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজদের পক্ষ থেকে। পালিত সাহেবকে ছেড়ে কথা বলেনি বিল বাঁওড়ের মাঠ চরানী মেয়েরাও। এই মাঠের জমিতে যেমন গৃহবিবাদের সূচনা হয়, তেমনই রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। কমিউনিস্ট উত্থানের পটভূমি তৈরি করে দেয় এই তৃণভূমির প্রান্তর। তাই উপন্যাসে তৃণভূমি নামান্তরে প্রকৃতিই মূল চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। উপন্যাসে হিজরোল

সোনাটিকুঠির, ময়নাডাঙা, ধুলোউড়ি প্রভৃতি আঞ্চলিক বৃত্তে বড়ো হওয়া রাখাল, গয়লা, ডোম, বাগদি, বাথানওয়ালা, পাখিওয়ালা, মাঠকুড়ানিদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। সিরাজের এই চেতনা আধুনিক মনস্কতারই ফসল। বুনাই, বাউরি, সাঁওতাল, আদিবাসীদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা 'তৃণভূমি' উপন্যাসে সাবলীলভাবে খাপ খেয়েছে।

জটিলতা, গভীরতা, বিশ্লেষণ, চরিত্রের আত্মসমীক্ষা, বিষণ্ণতা, নানা রহস্যময় মুহূর্ত ফুটে উঠেছে সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীন হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে, যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে আছে আদিম অন্ধকার। এখানে সেইসব চরিত্রেরই দেখা পাই যারা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে চেয়েছে জীবনের স্বাধীন ভূমিতে। এই উপন্যাস স্বাধীনতা অভিলাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার উপাখ্যান। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এইভাবে—"রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়ড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচ্যাঁয়, ডর বেজেছে! রেলগুডঠো ভয় পেয়েছে।"[৩]

'বাসস্থান' উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে শরীরী অনুষঙ্গ, "মাগীরা এতকাল চোখঠার, এক-ঝিলিক হাসি, দোদুল্যমান বক্ষ এবং পশ্চাদ্দেশ দেখিয়েই কতো মণ লাক্ষ্য ছিঁড়েছে বলা নয়।"[৪] কিংবা দিয়ড়িরা যখন নবাবগঞ্জের বাজারে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে তখন "ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টি জনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন তৃষ্ণার দিনে নিটোল তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।"[৫] এখানে প্রতীকের ব্যবহার আলোড়িত করে আমাদের। মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন সিরাজ।

ডুমুরের সঙ্গে মামুনের প্রেম 'প্লেটোনিক' হয়ে আসতেই পারে না। দিনের দীনতা আর রাতের লিবিডোর সহজ যোগফলেই সেখানে সচল থাকে যূথবদ্ধ জীবন প্রবাহ। তাদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিরাপত্তাহীন জীবনে জৈব তাড়নাই বড়ো কথা। সেখানে মনের টান সেভাবে নেই। তাই মামুনের অন্তর্বাস্তবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এক চরম সত্য—"ডুমুর তার বউ হবে কি! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্থ মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে। বড়োজোর এটা

শারীরিক কিছু ঘটানো যায়—কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগানো কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।"[৬] এখানে চরিত্রের সামগ্রিক জীবনচর্যায় যৌনতার যে ভূমিকা স্পষ্ট, তাকে নিতান্ত অতীন্দ্রিয় মনে না করে কেউ যদি একজন সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনবোধের সামগ্রিকতায় বিন্যস্ত করতে চান, তাহলে তাকে কিন্তু হেয় করা চলে না।

'তখন কুয়াশা ছিল' এবং 'হেমন্তের বর্ণমালা' ভিন্নধর্মী উপন্যাস। প্রথমটিতে পাই এমন এক সরল, লাজুক একটি ছেলের কথা, যাকে সকলে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতো। পরবর্তীকালে তাকে একটি মেয়ের দায়িত্ব দিলে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জেগে ওঠে পৌরুষ, শুরু হয় তার নয়া রাস্তার অন্বেষণ। এই উপন্যাসের সিরাজ যেন সার্চলাইট ফেলে নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের অন্ধকূপে নিমজ্জমান গ্রামবাংলার ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। অনুভূতি দিয়ে তিনি দেখেছেন, বিজ্ঞানের অন্তহীন সফলতার যুগে গ্রামের মানুষের কাছে নেই জাগতিক আলো। তারা নিরক্ষর, দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যায় হেমন্তের ঝরা পাতার মতো।

উনিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলমান পির পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক জীবনের কাহিনীই 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে উপজীব্য। টুকরো টুকরো কোলাজ মিলে জন্ম নিয়েছে এক অপরূপ চিত্রলিপি। তাঁর বাক্যতত্ত্বের নিজস্ব আবিষ্কারে রয়েছে অসাধারণ কুশলতার পরিচয়। স্বোপার্জিত জীবনবোধের দ্বারা লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার প্রতিস্পর্ধী। গতির মাঝখানে সংগ্রামী মানুষ কেমন ভাবে অলীক মানুষ হয়ে ওঠে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুটি—ধর্মগুরু বদিউজ্জমান এবং তার নাস্তিক ও বিদ্রোহী পুত্র শফিউজ্জমান। ওদের একজন মনে করেন মানুষের ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর, অন্যজন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা—একথা স্বীকার করেন। কেবল মুসলিম জীবনভাষ্য নয়, একদিকে যেমন মুসলিম ধর্মগুরু, তেমনই অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের পটভূমি এসেছে ঘুরে ফিরে। হিন্দু-মুসলমান আন্তঃসম্পর্কের উদ্ভাসন হয়ে উঠেছে কাহিনীর অন্যতম উপকরণ।

বাংলা ভাষী মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলিও সিরাজের তীক্ষ্ণ, সাবলীল গদ্যের ভেলায় চড়ে এগিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। বাংলা ভাষী মুসলমানদের মুখের ভাষা 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বদিউজ্জমানের এক বিশেষ মুহূর্তের অন্তর্বাস্তব প্রসঙ্গে লেখক বলেন—"চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসজিদসুদ্ধ তাঁকে যেন 'গয়রত' (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন।"[৭] আবার প্রবৃত্তি বশীভূত শফি-উজ্জমানের পরাভূত হওয়ার ভঙ্গিটিতে সিরাজের সংযম প্রশংসিত। আধুনিক কবিতার পর্যায়ে উন্নীত—"জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিসফিস ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জামবাটিটি তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাস ঢাকা মাটিতে বিঁধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগলো। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পুরোপুরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে করতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।"[৮] নিসর্গ আর মানুষ এখানে একাকার। এইখানেই সিরাজের বিশিষ্টতা।

১৯৫০-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছ-সাতটা বছর সিরাজ ছিলেন আলকাপ দলে। সেখানে তিনি তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের মতো নেচে নেচে ঝুমুর দলে গান করেছেন। এই দলের মানুষজনকে নিয়েই তার সময় কেটেছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। এই সময়ের প্রতিফলনই 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক সনাতন কুমার রায় বা সনাতন মাস্টার। সনাতন সাঁওতাল পাড়া আলকাপ দলের মাস্টার। উপন্যাসে সনাতন মাস্টারের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই ঔপন্যাসিকের জীবনাগত। সনাতন একসময় বাঁশি বাজাত এবং হাবোল গোঁসাইয়ের কাছে গান শিখত; যা ঔপন্যাসিকের জীবনেও ঘটেছে। এইভাবে তিনি একের পর এক ঘটনা বুনে বুনে চলেছেন, যা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। এই উপন্যাসের নায়ক অনেকের মাঝখানে থেকেও আশ্চর্য একা। চারদিকে তার নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধ্য বলয়।

উপন্যাসে সাঁওতাল পাড়ার দলের অন্যান্য সদস্যরাও বাস্তব। একমাত্র কালা আর কাবুল ছাড়া প্রত্যেকেই সাঁওতাল পাড়ার লোক। কালা, কাদের, নফর আলি স্ব-মহিমায় বর্তমান। সুধাও বাস্তবভিত্তিক চরিত্র। 'মায়ামৃদঙ্গ' সিরাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফল। এই উপন্যাস দুঃখী মানুষের চিরন্তন অপ্রাপ্তির ইতিহাসে পূর্ণ। অ-সুখের অপূর্ণতা তাদের মনের মধ্যে অনুভূতির স্পর্শ আনে। অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শিল্পিত ফর্মে নির্বিশেষ করতে হয়, ব্যক্তিসমূহ এবং ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিকেও নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে একই সঙ্গে আনতে হয়, তার মহৎ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে।

জীবনবোধের গভীরতার দিক থেকে অনুভব করা যায় সিরাজের ভাষায় কাব্যসৌন্দর্য আছে। কাহিনীতে 'ক্যারেকটারস পোরশান' কাটা উক্তি-প্রত্যুক্তিতে রচিত। এই প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার নাশে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তাকেও লেখক হাজির করেছেন। এখানে খুঁজে পাই একজিস্টেশিয়ালিজমের অমোঘ ছায়া। 'নিশিলতা' উপন্যাসটি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানিচকের রুদ্র দেবের মেলাই এই উপন্যাসের ভিত্তিমূল। সেই মেলাতেই দেখতে পাই পান বিক্রেতা বিনোদিনী ও তার সদ্যযুবতী ভাইঝি নিশিলতার। মেলার করুণ অভিজ্ঞতা তাকে দীর্ণ করে। তীক্ষ্ণধী স্রষ্টা তার মননে নিশির অন্তর্বাস্তবের অনবদ্য মূলটিকে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন।

'নিশিলতা' উপন্যাসে নিশি ও গোবরা নির্মম একাকীত্বের শিকার। সংকটের তীব্রতার পরিবেশে চরিত্রগুলির অন্তর্বাস্তব থেকে উঠে আসে বিপন্ন অস্তিত্বের অসহায় ক্রন্দন। তাদের আত্মা কাফকা কথিত 'Nihilistic fragment'-এর তীব্র যন্ত্রণাবোধে পীড়িত। তাই তারা মনে করেছে 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ'। কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারে না কেউ। যে মানুষ-মানুষীর দল নিজেদের গভীরতম সংকটময় দুটি সত্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে - গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা তো নিশ্চিতভাবেই জীবন প্রেমিক। শব্দ দিয়ে আঁকা হয়েছে, তা যেন রসঘন হয়ে ছবি মুছে গিয়ে সৃষ্টিতে পরিণত হয়। সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতায় ছবি এঁকে সংগীতের রণনে তুলে আনলেন নিশির অন্তর্বাস্তবকে।

সিরাজের শহুরে জীবনবোধ সম্পর্কিত উপন্যাসগুলির দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। এখানে সব থেকে প্রথমে যে উপন্যাসের নামটি মনে আসে সেটি প্রেম-ঘৃণা-দাহ; যার

পরিবর্তিত নাম 'লাল নক্ষত্র'। এই উপন্যাসের প্রথমেই পাই চারটি মহিলার কথা-রুচি, অশ্রু, বিবি বা বৈজয়ন্তী ব্যানার্জী এবং ঋতু। "রুচির বয়সের গাছপাথর নেই।"[৯] ঋতু মুসলমানের মেয়ে, অশ্রু অর্থাৎ অশ্রুকণা সরকার খ্রিস্টানের মেয়ে। কিন্তু সে মাথার কাছে যীশু বা মেরির ছবি রাখে না, গির্জায় যায় না। অশ্রু নরম ও চাপা স্বভাবের। কেউ কখনো ওকে ভারি বা ভিজে মুখে দুঃখিত হতে দেখেনি। এই চারটি চরিত্রে অন্তর্বাস্তবে রয়েছে নব-পদ্ধতি বিন্যাস ঋতু আর রুচি আঁচ করে "ওর পেছনের জীবনে কিছুটা রহস্য আছে।"[১০] "আবার ঋতু বা অশ্রুও ভাবে রুচির পেছনের জীবনটা যত স্বল্প-পরিসর হোক, তা কোনো সাংঘাতিক রহস্যে ভরা। কিন্তু তারা কেউই সেটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাদের মনে হয় সবার সব রহস্যের চাবিকাঠি বিবির হাতে। যেন বিবি সবই জানে...বিবির ভূমিকা যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মতো।"[১১] তাই রুচির অনুভব "বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তার বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে। অত সুন্দর করে কেউ কথা বলতে জানে না, কেউ অমন সুখে কিংবা দুঃখে বাঁচতেও জানে না। রুচি তার আঠারো বছরের জীবনে যে জীবন অনেক পোড়খাওয়া, অনেক গোপন কদর্যতার ক্ষত চিহ্নে ভরা—এমন মানুষ দেখেছি। রুচির এত বল এসেছে বুকে, এত সুখ!"[১২] রুচি এই তিনজনের থেকে অন্তত এনাটমির ক্ষেত্রে সুন্দর। বিবির ঝলমলে রং, একরাশ আলুথালু চুল, ছন্দিত শরীর-রুচির পাশে ফ্যাঁকাসে লাগে। "এই মহিলা মেসে রুচি একটা শান্ত সৌন্দর্য।"[১৩]

উপন্যাসের এই চারটি চরিত্রের মধ্যে রুচি, অশ্রু আর ঋতুর চিন্তা স্রোতধারাই ঘটনা গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'স্ট্রিম অফ কনশাসনেস'-এর অবাধ যাতায়াত এখানে। তাই অশ্রুর নিভৃত অবচেতন স্তরের মানস-কূটগুলি ক্রমশ ফুটে ওঠে—রুচির চাকরিটা অশ্রু খুব ভালো মনে করে না। যেমন সে বরাবর রুচিকেও খুব একটা নির্ভেজাল মেয়ে মনে করে না। আবার সে ভাবে "রুচি যখন বাসায় থাকে, তখন তার মধ্যে একটা কেমন যেন বিষণ্ণতা, বালিকা সুলভ ছন্দ আর অসহায়তার আমেজ থাকে যা-রুচির সাত খুন মাফ করতো ওস্তাদ।"[১৪] এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে চরিত্রগুলি আলোড়িত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

অশ্রু কেবলই ভাবে, সে আর টিউশনি করবে না। তার মতো হিসেবি মেয়ের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয়। আবার পরমুহুর্তেই তার অনুভব—"কঠিন নয়-কিন্তু..কিন্তু তারপর? জীবনে তার পরেরটা কি? ...কোথায় পৌঁছোতে চায় সে। একইরকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে অর্থাৎ নিছক বেঁচে থেকে? তবে পৌঁছোবার একটা জায়গা কেন সে খুঁজে পাচ্ছে না?"[১৫] মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, নিরাপত্তার অভাব থেকেই অশ্রু গড়ে নিয়েছে স্বপ্ন-অবচেতনা অনুভবের একটা অন্যভুবন। কখনো তার মনের অন্দরমহলে ভেসে ওঠে—"সে একটা ছোট্ট পোকার মতো এক জায়গা আটকে থেকে এই স্ফীতি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছে।"[১৬] তখন ফ্রানৎস কাফকার মেটামরফসিস-এর কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে অস্বস্তিকর এক স্বপ্ন দেখে ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে গ্রেগর সামসা দ্যাখে সে একটা বিশাল কীটে পরিণত হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময়' অশ্রুর 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' খেলা করে।

ঋতুর একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতার বীজ তার চরিত্রের অন্দরমহলেই সম্ভাবিত ছিল। সে ভেবেছে—"তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব? সে যদি হিন্দু মেয়ে হত, তাহলে কি প্রচুর গভীরতার সঙ্গী পেত তাকে ভালোবাসার মতো? হিন্দু-মুসলমান কোনো পুরুষই ঋতুর বিদ্রোহী ভাবটা মেনে নিতে পারেনি। তারাও যেন বলতে চেয়েছে, ঋতু, তুমি নিজে মুসলমান মেয়ে। এতখানি তোমার সাজে না! স্মৃতিপ্রবাহ ও চেতনাপ্রবাহ বেয়ে নির্বাচিত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মনের নানা স্তরে চলেছে তার অশান্ত অন্বেষণ। ঋতু তাই বলেছে; মানুষ এটা কেন বোঝে না যে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তার পর ধর্ম বা সম্প্রদায়?"[১৭]

সিরাজ তাঁর সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তিনি জানেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, এক অদৃশ্য জীবন সংগ্রামে আপাত শিথিল গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে ঋতুর মধ্যে এক অখণ্ড জীবনবোধ গড়ে ওঠে। চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছা বিহারের আড়ালে নগ্ন হয়ে রইল তার আত্মকথন। তার মনোগহনের জটিল আঁধারে সিরাজ আলো নিক্ষেপ করেছেন—"মনে মনে বিবিদি মিঠে হাসছে নিঃশব্দে এবং স্নেহে, তার উজ্জ্বল মুখে পৃথিবীর ময়লা ও অসুখ-বিসুখের কোনো ছায়াই পড়ে না। রুচি...হ্যাঁ, তার পক্ষে

সম্ভব। ...রুচি খুব স্বার্থপর টাইপের। মেয়ে, কুচুটে, সারাক্ষণ তার মনে অন্য এক চালাক চতুর মন নিয়ে সে থাকে—কাকেও জানতে দেয় না।"[১৮]

'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি'-ও সিরাজের শহুরে জীবনবোধের আর এক অভিজ্ঞান। এখানে আছে শহরের কথা, নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বোবা অন্ধকারের কথা। স্কুল শিক্ষক ননী আর কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস। এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে উপন্যাসের অন্দরমহলে। মানব চরিত্রের জটিল, অন্ধকার, গুহাহিত রহস্য সম্পর্কে লেখক আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন। উত্তেজক ঘটনার কুশলী বিবরণ, চরিত্র বিন্যাসের পারম্পর্য, ঘটনার দ্রুতগতি উপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। ননী মানুকে ভালোবেসেও বিবাহের পথে পা বাড়ায়নি। একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার। কিন্তু কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ও অপমৃত্যু ননীকে বাক্যহারা করে দেয়। মানু তার ভাই জনের অপরিণামদর্শিতায় লজ্জিত হয়ে ননীর পদতলে আশ্রয় নেয়। শুরু হয় তাদের নতুন দিগন্তের অন্বেষণ। ননীর মর্ত্যলোকে আলোড়িত হয় এক অমোঘ সত্য—"সেক্স মানুকে মেরে ফেলে। ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।"[১৯] এই অন্তর কাঠামোর মধ্যে প্রলম্বিত রয়েছে জগত ও জীবনের চলার ছন্দ।

লক্ষণীয় এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের নামই দু-অক্ষরবিশিষ্ট ননী, কৃষ্ণা, মানু, জন। চরিত্রগুলিকে শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখা হয়েছে। হৃদয়ের গভীরে প্রেমের নিগূঢ় আর্তিকেই সিরাজ নিভৃতে লালন করেছেন। সিরাজের উপন্যাসের কুশীলবেরা তাদের মিথ ও ভাবনার জগতে বাস করে। তাই গভীর অন্তর্বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিকতার অন্দরমহলে। সিরাজের সহজ অভিসার যাত্রা।

একই সাথে হিন্দু ও মুসলিম দুই সমাজের কথা লিখে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। সিরাজের উপন্যাসে বক্তব্যটা আসলে উপলব্ধিরই নামান্তর। সেই উপলব্ধিতে বাঁচার লড়াইয়ে মানুষকে গরুর মতো গাড়ি টানতে হয় রাতের অন্ধকারে। সুগন্ধি ভাতের আকাঙ্ক্ষা, অসহায় মানুষদের অনুভূতি, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বাঁচার স্বপ্ন, তবুও

প্রাকৃতিক নিয়মে সবকিছুকে মেনে নেওয়া—এসবই জীবনের অমোঘ সত্য। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দ্বন্দ্বময় জীবনকথার উপন্যাস সৃষ্টিতে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

খ. রাঢ় জীবনের রূপকার :

উত্তর রাঢ়ের সুদক্ষ কথাকার সিরাজ উপন্যাস সৃষ্টির সুনিপুণ রূপকার। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা সবই মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে। অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ে। 'বাঙালির ইতিহাস' (আদিপর্ব)-এ ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—''বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম (সাঁওতাল ভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলা কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ এই লইয়া রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং রাঢ়ের উত্তরসীমা।''[২০] বিপুল-বিরাট জীবন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সহ রাঢ়ের প্রান্তিক জীবনকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনই পাশাপাশি নাগরিক ও গ্রাম জীবনের বহু কৌণিক জীবনচর্যাকে তাঁর আখ্যানের বিষয়ীভূত করেছেন। সেই সাথে প্রান্তিক মানুষের লোক ঐতিহ্যের সাবলীল ব্যবহারে কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাসগুলিকে সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। রাঢ় ভূমির জীবন ও রহস্য, জীবনের কামনা-বাসনার আদিম ছন্দ, রাঢ় ভূমির মানুষদের শ্রেণি সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, খিদে-হতাশা-ব্যর্থতা, তাদের প্রতিহিংসা-হত্যা-ষড়যন্ত্র, সংস্কার-বিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত-অধিদেবতা, দাঙ্গা-রাহাজানি-জুলুম, ধর্ম-ধর্মমোহ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গভীর অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন। সিরাজ সাহেব 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি' শীর্ষক রচনায় জানিয়েছেন—''জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশে সারা এলাকা জুড়ে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অনেক দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষ ছিল, যাদের দু-চোখে ছিল হত্যার নেশা। ছেলেবেলা থেকে অনেক হত্যাকাণ্ড ও রক্ত দেখেছি। কথায় কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষি; বাগদি ও গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হতো। অবিকল যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে সশস্ত্র সৈনিকদের মতো তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হত। মাঝে মাঝে মুখে হাত দিয়ে প্রচণ্ড রণ হুংকার দিত। আ-বা-বা-বা! রক্ত নেচে উঠত। তাদের মধ্যে মেয়েরাও ছিল। দেখেছি কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলে দুর্ধর্ষ বাঘিনী মেয়ে কদর আলির মাকে। হাতে বিরাট হেসো নিয়ে সে

গর্জন করতো 'যদি আমার তোনের (স্তনের) দুধ খেয়ে থাকিস ছেলেরা অক্তে আমার পা ধুইয়ে দে!' দেখছি আমাদের গাঁয়ের জমির সেখকে, নাথ ঘোষ গোয়ালাকে, দিলদার মণ্ডল আর কালু মুখুয্যেকে। এরা সবাই আজ কিংবদন্তি মানুষ। এলাকার সন্ত্রাস ছিল এরা। কিন্তু এদের মধ্যে মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের আদর্শ ছিল। একালের আঘাতদারদের মতো কদাচ এরা পিছু থেকে আঘাত হানত না। প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতিয়ার ভেঙে গেলে রণে ক্ষান্ত হতো। প্রতিদ্বন্দ্বী হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলে জয়ের গর্বে মাথা উঁচু করে চলে আসত। সংঘর্ষের উপলক্ষ বেশির ভাগই ছিল মাটি বা ফসল। কিন্তু এদের ছিল বাঘের স্বভাব। একই অরণ্যে এক পুরুষ বাঘ অন্য পুরুষ বাঘের অস্তিত্ব সইতে পারে না। এই দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে আমি ভালোবাসতাম। তা পেতে চাইতাম এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড়ো আদিম সেই জগত। প্রাণী ও উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উই ঢিবি, শ্যাওলা, ছত্রাক, পাখি, গো-সাপের খোলসে ভরা সেই আদিম স্যাঁতসেঁতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটি বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি, সে এক পৃথিবী আছে, দুর্গম রহস্যময়—সেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোনো পৃথক মূল্য নেই। সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা। ...এই জীবন আমি দেখেছি। ভালোবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি।"[২১]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিলয় না জানি' উপন্যাসটি শারদীয় বেতার জগতে বেরিয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'শৈব্যা' প্রকাশন সংস্থা ১৯৭৬ সালে। দে'জ উপন্যাস সমগ্র-৩ এর অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম উপন্যাস। দীর্ঘ এই উপন্যাসের শুরুতেই আত্মকথনের ভঙ্গিতে সিরাজ জানিয়েছেন—"তখন রাঢ় বাংলায় জনপ্রিয় লোকনাট্যদল আলকাপের সঙ্গে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। দলের লোক আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখনো আসরে আবেগে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নাচিয়ে ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনো বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অভাজন শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিই। আদাড় গাঁয়ে শেয়াল রাজা মাস্টার।"[২২] অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই তিনি ব্যক্তি-জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত আউল বা ফকিরদের জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে সরাসরি সুফি দর্শনের প্রভাব রয়েছে। এখানে দেখা যায় চিশতী মদনচাঁদ ফকিরের মেয়ে মরজিনা ও ফকির আবদুল্লার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, প্রেম-বিচ্ছেদ বেদনার করুণ পরিস্থিতির কথা। এই

ঘটনাটি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল বলে মনে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রবিবারে সিরাজ মাদার পিরের মেলায় গিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। তিনি বলেছেন–"ধু ধু বিশাল মাঠে চলেছি তিনটি মানুষ। বীরভূমের সীমানা ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলুম মাঠের মাঝামাঝি। চলেছি পুবে। পিছনে খরার সূর্য চলেছে ততক্ষণে। হু হু বাতাস বইছে। রোদের তাপ ততটা পাচ্ছি না।"[২৩] তাঁর উপস্থাপনের রীতিতে বোঝা যায় তিনি উপন্যাসটির সংলাপ পরিবেশন করেছেন উত্তম পুরুষে; কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব জবানীতে। আখ্যানের মধ্যে রয়েছে তৎকালীন দেশকালের পরিচয়। এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আউল-ফকিরদের কথা। 'আউল' শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন–"আগে ভাবতুম, আউল হয়তো বাউলেরই মুসলিম প্রতিশব্দ। কথাটা ভুল। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা এক জগতেরই মানুষ। কিন্তু আউল কথাটা এসেছে আরবি ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পবিত্র মানুষ বা সাধুসন্ত। আবার আউল মানে আদি।"[২৪] এখানে তিনি মারফতি তত্ত্ব এবং চর্যার সাধনতত্ত্বের মেলবন্ধনে দেখিয়েছেন প্রকৃতি ত্যাগ করে নিবৃত্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা। মদনচাঁদ ফকিরের গাওয়া গানে এই তত্ত্বই লুকিয়ে রয়েছে–

"তিরপিনীর ঘাটেতে এক মরা ভাসতেছে
মরার বুকে সর্পের ডিম্ব
হরিণ চরতেছে। ..."[২৫]

অর্থাৎ সাপের বাসনার মতো ডিম। এই ডিমের মধ্যে পরম রূপবান ও রূপবতী হরিণ-হরিণীর বাস। তাদের মিলনেই জীবন আবার বিরহে মৃত্যু রূপ নেয়। এই বিষয়টিই উঠে এসেছে আবদুল্লার প্রতি বিবাহিতা মরজিনার প্রবল আকর্ষণ, তার স্বামী মনসুরের প্রবল রাগ, আবদুল্লার এক রাত্রের ঘটনায় পদস্খলন, তাদের দাম্পত্য জীবনের টানাপড়েন, শেষে আবদুল্লা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ির বাইরে থাকা–অর্থাৎ আবদুল্লার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির ইঙ্গিতে তত্ত্বটি যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী।

উপন্যাসে দেখা যায় মদনচাঁদ ফকির এবং আবদুল্লার যৌথ আকর্ষণে লেখক মাদার পিরের মেলা দেখতে ইন্দ্রাতে যান। সেখানে তিনি আশ্রয় নেন ফকির মদনচাঁদের বাড়িতে। ফকিরের অভাবের সংসারে আতিথেয়তা গ্রহণ করে তিনজনে পিরের মেলায় যান। এই মেলা হল ফকিরদের মিলন মেলা। মেলার শুরুতেই লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলিম বা গাঁজার নেশায় আধ্যাত্মিক গান। নিম্নোক্ত গানগুলি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সিরাজের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

ক. 'তিরপিনীর ঘাটেতে এক মরা ভাসতেছে'

খ. 'পড়ে গৌর লীলার মাজারে'

গ. 'মানুষ রতন চিনলি না মন'

ঘ. 'দেখে এলাম আজব বিক্ষ'

ঙ. 'ভাবে-ভাবে ভাব লাগাচে'

চ. 'সহজ ভাব দাঁড়াবে কিসে রে' ইত্যাদি।

উপন্যাসটিতে লেখকের সুগভীর অন্বেষণ ও জীবনদর্শনের পরিচয় লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি পির-ফকিরদের আধ্যাত্মিকতার দিকটি যেমন তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনই ভাবে সমান্তরালে উঠে এসেছে লোকায়ত জীবনের উচ্চ আদর্শ ভোগবাদে পড়ে ক্লেদাক্ত রূপ গ্রহণ করার কথা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে লোকনাট্য দল আলকাপের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেছেন। আলকাপ দলে তিনি সিরাজ মাস্টার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি হারমোনিয়াম, বাঁশি বাজানো থেকে শুরু করে 'কাপ', 'ছড়া', 'কবিয়ালী' রচনা ও প্রয়োগ এবং ছোকরাদের নৃত্য শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার মতো নানা ধরণের কাজে যুক্ত ছিলেন। লোকজীবনের মূল সন্ধান করতে গিয়ে লেখক লাভ করেছেন হিন্দু বাউল-বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য। তিনি দেখেছেন হরিপদ বাউলের বোষ্টমী কাঞ্চনের পরিণতি। স্থূল লালসার কামনায় দগ্ধ

হয়ে তার শেষ আশ্রয় হয়েছে শহরের বাগান বাড়ির পতিতা পল্লিতে। কাঞ্চন পতিতা আর মরজিনা নিজের ঘরকেই করে তুলেছে বারবনিতার গৃহ। সিরাজ হিন্দু-মুসলমান দেহবাদী বাউল, বৈষ্ণব, ফকির দরবেশের বিলাস-বৈভব আর প্রচারের হাতছানিতে আকৃষ্ট হওয়ার করুণ পরিণতির ছবি অঙ্কন করেছেন উপন্যাসটিতে।

লোকনাট্য দল আলকাপের সঙ্গে সিরাজের ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে। উপন্যাসটি অধুনালুপ্ত দুটি সিনেমা পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭০ সালে দু-ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশ করেন দে'জ পাবলিশিং ১৯৭২ সালে। উপন্যাসটির আখ্যান গড়ে উঠেছে দুই ছোকরা শান্তি আর সুবর্ণকে নিয়ে। নারীরূপী কিশোর অভিনেতাদের ছোকরা বলা হয়। এরাই দলের মূল আকর্ষণ। বাহ্যিক অবয়বে তারা পুরুষ হলেও অন্তরে নারী। এই সার্থকতা কীভাবে অর্জন করতে হয় তা জানিয়ে সিরাজ বলেছেন 'চলনে বলনে শয়নে স্বপনে তুমি নারী—সর্বদা নারী তুমি ভাবনায় ইচ্ছায় আহারে বিহারে।' এই আলকাপ দলের সঙ্গে সিরাজ যৌবনের ছয়-সাত বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় সিরাজ জানিয়েছেন—"প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর, এখানকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভাবনাপূর্ণ ছ-সাতটা বছর—তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণা কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।"[২৬]

এই উপন্যাসে সিরাজ আলকাপের উন্মেষ, গঠন ও তার পরিণত রূপের সার্থক প্রতিনিধি ধনঞ্জয় ওরফে ওস্তাদ ঝাঁকসুর কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায় 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটিতে লোকনাট্য আলকাপের ঐতিহাসিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়। আলকাপের নামকরণ প্রসঙ্গে সিরাজ লিখেছেন—"আলকাপের পালার নাম 'কাপ'। ওস্তাদ ঝাঁকসু বলে, সংস্কৃত-মূলে কাপট্য থেকে কাপ—ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটক। আর আল-আল মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে।"[২৭]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে পাশাপাশি দুটি কাহিনী এগিয়ে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। একটি আখ্যানের নায়ক আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসু, অন্যদিকে আলকাপের

তরুণ মাস্টার সনাতনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এদের দু-জনের জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দলে 'ছোকরা' হিসেবে পরিচিতি শান্তি ও সুবর্ণকে কেন্দ্র করে। ওস্তাদের জীবনে ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে শান্তিকে নিয়ে এবং সনাতনের জীবনের দোলাচলের মূলে রয়েছে সুবর্ণ।

সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে উঠে এসেছে চরিত্রের জটিলতা, গভীরতা, বিষণ্ণতা, আত্মসমীক্ষা এবং নানা রহস্যময় মুহূর্ত। মানুষ ও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সিরাজ এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে, যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আদিম কামনা-বাসনার কথা। সেইসব চরিত্রেরা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন জীবনের স্বাধীন লীলাভূমিতে। অর্থাৎ এককথায় এই উপন্যাস স্বাধীনতা অভিলাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার উপাখ্যান। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে—"রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়ড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচ্যাঁয়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডোঠো ভয় পেয়েছে।"[২৮]

লেখক মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে প্রতীকের ব্যবহার আমাদের আলোড়িত করে তোলে। এই উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে শরীরী অনুষঙ্গ। লেখকের বর্ণনায়—"মাগীরা এতকাল চোখঠার, এক ঝিলিক হাসি, দদুল্যমাণ বক্ষ এবং পশ্চাৎ-দেশ দেখিয়েই কতো মন লাক্ষ্য ছিঁড়েছে বলা নয়।"[২৯] দিয়ড়িরা যখন নবাব গঞ্জের বাজারে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে তার বর্ণনা দিয়েছেন সিরাজ নিখুঁতভাবে—"ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টি জনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন কৃষ্ণার দিনে নিটোল তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।"[৩০]

ডুমুর-মামুনের নিরাপত্তাহীন জীবনে জৈব তাড়নাই বড়ো কথা; সেখানে মনের টান সেভাবে নেই। দিনের দীনতা এবং রাতের লিবিডোর সহজ যোগফলেই সচল থাকে জীবনপ্রবাহ। তাই মামুনের অন্তরের চরম সত্য উদ্‌ঘাটনে সিরাজ লিখেছেন—"ডুমুর তার বউ হবে কি! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্থ মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে।

বড়োজোর একটা শারীরিক কিছু ঘটানো যায়—কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগানো কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।"[৩১]

সিরাজের সাহিত্য তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ফসল। তারাশঙ্করের মতো তাঁর লেখক সত্ত্বায় জড়িয়ে ছিল রাঢ়ের রুক্ষ মাটি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আবির্ভাব একরাশ সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে। সাহিত্যিক অমর মিত্র লিখেছেন—"আমাদের শিকড় যেখানে, সেই শিকড় আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ...এই সময় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যে পৃথিবীকে ফিরিয়ে আনলেন তাঁর গল্প, উপন্যাসে সেই পৃথিবীকে আমরা বিস্মৃত হচ্ছিলাম দিনে দিনে।"[৩২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পের বিষয় মাত্রা, শিল্প মাত্রা বৈচিত্র্যময়। গ্রাম ও শহর জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে আলকাপ দলে কাজ করা থেকে প্রথম শ্রেণির দৈনিকে সাংবাদিকতা করা পর্যন্ত, বহুমুখী কর্মজীবনের ব্যাপ্তি সিরাজকে বিচিত্র তাৎপর্যের উপন্যাস সৃজনে সাহায্য করেছে। তিনি আঙ্গিকের প্রতি বেশি নিরীক্ষা না রেখে ধ্রুপদী ভঙ্গিতে রাঢ় বাংলার ছবি, প্রকৃতি, কাম, ক্রোধ, হত্যা, মৃত্যু নিয়ে ভিন্ন আস্বাদনের রাঢ় বাংলার উপন্যাসের এক ভিন্ন জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায়—"১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীণ মিথের সুপরিচিত জগতে। কাটতে থাকল দিন রাত্রি গাঁয়ে গঞ্জে হাটে বাজারে মেলায় মেলায়। অজস্র মানুষ দেখলাম বিচিত্র বিস্ময়কর সব চরিত্র। মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগনা দুমকা ঘুরে বেড়াই আলকাপ দলে।"[৩৩] বিচিত্র ও বিস্ময়কর সেইসব মানুষ—রাঢ়ের সেই চেনা নদী, নিসর্গ ল্যান্ডস্কেপ নিয়েই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা উপন্যাসে ভিন্নতর সংযোজন ঘটিয়েছেন।

গ. প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষ :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখক জীবন আরম্ভ হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে। সিরাজ নিজেই জানিয়েছেন তিনি প্রকৃতির পাঠশালা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রকৃতির কাছ থেকে দীক্ষা নেবার কারণেই হয়তো জীবনকে এত সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। আমাদের এই মেকি আধুনিক সময়ের বাস্তব রূপকে আঁকতে আঁকতে এগিয়েছেন কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

তাঁর উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের কথা। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষ খুঁজতে খুঁজতে এগিয়েছেন—খুঁজেছেন মানুষের সবচেয়ে যত্নের ধন, আদরের ধন ভালোবাসাকে। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খোশবাসপুর গ্রামে সিরাজের জন্ম এবং রাঢ়ের জনপদ জীবনের মধ্যে যাকে বলে বাগড়ি অঞ্চল, তার বাগবিধি, আচরণ, লৌকিক উৎসব, বিশ্বাস, বিনোদনসহ সেখানকার মানুষের জীবন নির্বাহের প্রাত্যহিকতা তিনি জানেন এবং দীর্ঘদিন সেই জনবৃত্তের শরীক ছিলেন। সেই কারণেই তাঁর সারস্বত সাধনায় বিষয়গত নতুনত্ব এবং হুবহু বাস্তবের প্রতিচ্ছবি গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানত তিনি গ্রামীণ জীবনের কথাকার ছিলেন। মূলত গ্রাম জীবনকে জনমানসে দেখানোর দায় থেকেই তাঁর কলম ধরা। আমরা জানি 'কিংবদন্তির নায়ক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর পথচলা শুরু হয়েছে। কিন্তু 'নীল ঘরের নটি' (১৯৬৬) তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। তাঁর রচিত উপন্যাস অবলম্বনে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের কথা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের এই শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'জনপদ জনপথ' (১৯৯২)। চলতে চলতে পথিক মানুষ পথের পাশে বিশ্রাম নেয়; তার প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেয় অন্য পথিক। এভাবেই একে একে জনগণের ভিড় জমে ওঠে এবং গড়ে ওঠে জনপদ। আবার এই জনপদই হয়ে ওঠে বহু পথিকের মূল গতিপথ। নানা পথের ও নানা মতের বহু পথিকের আগমনে মুখর জনপদ হয়ে ওঠে জনপথের মোড়। আলোচ্য উপন্যাসে সিরাজ এক জনপদের কথা শুনিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক দূরে এই জনপদের বর্ণনায় সিরাজ লিখেছেন—"জায়গাটা যত বড়ো ভেবেছিল, অল্প হেঁটেই বোঝা গেল তত বড়ো কিছু নয়। চারদিক থেকে চারটে রাস্তা একখানে এসে মিলেছে। সেখানটা কেন্দ্র করে চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও কোনো সামঞ্জস্য নেই। নিঃসন্দেহে একটা টাউনশিপ—অথচ পেছনে কোনো প্লানিং ছিল না বা আছে বলে মনে হয় না।"[৩৪] এই জনপদ রূপপুর চটিতে পরেশ একজন নামজাদা ব্যক্তি। সে পেট্রোল পাম্প, একাধিক গাড়ি ও ব্যবসার মালিক কিন্তু একসময় তার অবস্থা খারাপ ছিল। হারমোনিয়াম মেরামত, গ্রামোফোন সারানো, বই বাঁধা এমনকি সিনেমার অপারেটরের কাজ করতে রূপপুর আসে। বোঝা যায় পথ চলতে চলতে মোড়ের ঠিক বাঁকটা পরেশ পেয়ে গেছে। তার কারবারে ম্যানেজার হয়ে আসে চন্দন। পরেশ

আসলে যে আয়কর বিভাগ ও কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে দুনম্বরি ব্যবসা করছে চন্দন তা বুঝতে পারে। আর চন্দনের দুর্বলতম স্থান হল পরেশের শ্যালিকা রুমা। ফুটবল খেলে এসে উপুড় হয়ে শোওয়া চন্দনের পিঠে কোমরে পায়ে দাপাদাপি করে আরাম করে দিয়েছে রুমা।

সেই বালিকা আজ পূর্ণ যুবতী; সৌন্দর্য, রুচি ও ঔচিত্যবোধে অনেক অচেনা। পরেশ তার বেনামী সম্পত্তির মালিক হিসাবে রুমাকে এবং রুমার জীবনসঙ্গী হিসাবে ম্যানেজারকে ভেবে রাখে। কিন্তু চন্দনের কাছে বিষয়টি অলীক কারণ জিয়াগঞ্জের রুমাকে চিনলেও রূপপুর চটির রুমা তার কাছে অচেনা। রুমার সবকিছু এমনকি শরীরের প্রতিটি অংশ চন্দনের চেনা—"রুমার দেহের কথা ভাবতেও দারুণ লজ্জা-সংকোচ ও পাববোধ হুড়মুড় করে এসে পড়েছে। অথচ কি অদ্ভুত ব্যাপার, রুমার রক্ত-মাংস হাড়ে গড়া ওই দেহের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রতিটি সেন্টিমিটার তার মুখস্থ। রুমার ডান ঊরুর কালো কালো পাঁচড়ার দাগ, দুটি স্তনের মাঝে তিল দুটো (ভারী আশ্চর্য এটা), পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নিচে যে তিনকোণা হাড়টা অর্থাৎ 'পিকচঞ্চু অস্থি'—সেটা গোটাটা হালকা নীল রঙের, আর বগলে একটা ফোড়ার দাগ—এইরকম অনেক কিছু এখনও তার চোখের সামনে স্পষ্ট। চোখ বুজলে সেই ন্যাংটা মেয়েটাকে দেখতে পায়। এবং আজ এইটেই যেন বড়ো অস্বস্তিকর।"[৩৫]

মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবনচর্যা, মূল্যবোধ সমস্ত কিছুকে পাল্টে দেয় তার সাফল্য। পরেশবাবু জিয়াগঞ্জে থাকাকালীন সবার বিপদে দৌড়ে যেত। কিন্তু রূপপুরে আসার পর সবাই তাকে ভয় পায়, সে রাত্রে বাড়িতে থাকে না। স্ত্রী স্নেহধারা আর আগের মতো স্বামীকে কাছে পায় না; হারিয়ে যায় স্বাভাবিক জীবনধারা। জিয়াগঞ্জের গলিপথকে তার এখন কাঙ্ক্ষিত মনে হয়। পরেশ পথ চলতে চলতে নিজেকে ধাবমান ট্রাকের মতো ভাবে; অনুভব করে শরীরের সর্বত্র অদ্ভুত সব চাকার অস্তিত্ব। শেষে এসে যে পথে পরেশ তার জীবন গড়েছিল, সেই পথেই তার মরণ হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহিত্যের গতানুগতিক প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে একান্ত নিজস্ব ঘরানা প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতা-সংস্কৃতির উপরিতলের ছলনায় প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃত গ্রাম ভারতবর্ষের শিকড়ের সন্ধান করেছেন। তিনি সরল প্রকৃতি পাঠের মতো চিনেছিলেন

সেই জীবন, স্বদেশ ও বদলে যাওয়া সময়কে এবং চেনাবার চেষ্টাও করেছিলেন। প্রচলিত ধারায় সম্পূর্ণ অচেনা গ্রাম-বাংলার চিত্রকল্প ও রূপকল্প হল 'জানমারি' উপন্যাস। উপন্যাসে দেখতে পাই প্রকৃতপক্ষে সোনারু পাগলা নয়, অথচ লোকে তাকে পাগল ভেবে তাড়া করে। সে চেয়েছিল এই পৃথিবী থেকে সব রকমের জানমারি বন্ধ হোক, কেউ যেন কারও প্রাণ না নেয়। মানুষ মারা তো নয়ই, কেউ যেন মাছও না ধরে, পাখি শিকারও না করে, পরবে কোরবানি না দেয়। নিরামিষভোজী সোনারু কারও কাছে অপদেবতা, আবার কারও কাছে ক্ষতিকর জিন। মৌলবি সাহেব তাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। প্রতিবন্ধী চুনিকে 'জানমারি'-র হাত থেকে বাঁচাতে সোনারু ঘোড়া হয়, চুনিকে পিঠে নিয়ে পক্ষীরাজের মতো মাঠঘাট, বনবাদাড় পেরিয়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। নির্মল পরিহাসে সোনারু চুনিকে বাঁচিয়ে দেয় কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে না। একটা জানমারি আটকে সে নিজেই জানমারির শিকার। সোনারু ক্রুশবিদ্ধ শিশুর মতো বলে ওঠে–

"এলি এলি লামা সা-বাক্তানি..."[৩৬]

সিরাজ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন–

"And about the ninth hour

Jesus cried with a loud voice,

Eli Eli lama sa-bakthani,

...My God, my God, why last thou

Forsaken me? ...(St. Mathew 27:46)"[৩৭]

সোনারু প্রকৃতিচর, সে প্রকৃতির মতোই অবাধ, উন্মুক্ত, উদ্দেশ্যহীন, প্রকৃতির মতোই সে দিব্য অথচ উন্মাদ। নেপথ্যে একটি খুন হয়; যে খুন হয় সে নিজেও খুনি ছিল। সেই খুনের পেছনে ছিল যৌনতার চোরা ধাক্কা। অথচ মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে নিয়ে শুরু হয় কদর্য রাজনীতি। তারই

বিপরীতে দাঁড়িয়ে সোনারু জানমারিকে ঘেন্না করেছে। লুঠেরা, লুম্পেনরা নিরপরাধ সোনারুকেই ভেবেছে সমস্ত নষ্টের মূল ব্যক্তি।

সিরাজের 'উত্তর জাহ্নবী' চেনা হয়েও উপন্যাসে অচেনা জগতের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এক পাড়া-গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার গৌরাঙ্গকে তিক্ততা ও হতাশার প্রতিমূর্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার সংসার বলতে এক বিধবা মেয়ে স্বর্ণ; যেমন তার রূপ-যৌবন তেমনই তার তেজ ও বুদ্ধি। ডাক্তারের ডিসপেনসারির সামনে রেল স্টেশন, সেটাই বাইরের পৃথিবীর দিকে খোলা দরজা; পেছনে হরেক রকম সংস্কার ভরা এক গ্রাম্য অন্ধকার সমাজ। এরকম ক্ষেত্রে ডাক্তারের স্বভাব রুক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গৌরাঙ্গ ডাক্তারের বুকের নিচেও যে স্নেহের চোরাস্রোত বহমান তার খবর পাই হেরু চরিত্রটির সাথে আলাপচারিতায়। হেরু হল স্থানীয় স্টেশনের একমাত্র কুলি, তার দৈত্যের মতো চেহারা, দানবের মতো শক্তি। গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—জুহ্না মৌলবি মুসলমান, আর একজন ইয়াকুব মুসলমান হলেও তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাসী, আর তৃতীয় জন খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক। শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতার বাইরে এ এক অন্য পৃথিবী। ঘটনাচক্রে হেরু হয়ে যায় খুনে ডাকাত, নির্দোষ ডাক্তারের হয়েছে জেল। তার অসহায় অবস্থার চাপে স্বর্ণের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অন্য এক স্বর্ণ—বাবার ঘোড়ায় চেপে গৌরাঙ্গের মেয়ে স্বর্ণ ডাক্তারি করতে বেরিয়ে পড়েছে।

গ্রাম জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে 'তৃণভূমি' উপন্যাসে। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতীকরূপে এখানে নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে সিরাজ দেখিয়েছেন গরীব বিলচরা মানুষেরা শুভেন্দু কিংবা পরাশরের দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। খড়ের বনে নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও নেই। নায়ক নিশানাথের মনে হয়েছে এমনি করেই থাকতে হবে এবং এটাই জীবন। সে দেখতে পেয়েছে আগুনে পোড়া মৃত্যুমুখী অরুন্ধতীকে। তাকে দেখে নিশানাথের চোখে জল আসে। তার প্রতি ভালোবাসাকে মূলধন করে নিশানাথ অদম্য জেদ করে স্থির রেখে এগিয়ে চলেছে। 'হিজলকন্যা' উপন্যাসেও সিরাজের প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধন দেখতে পাই। তিনি হিজলকন্যাকে সাহসিনী অর্থে উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এখানে

রাহেলা, ফুলি আর চুমকি—তিন হিজলকন্যা। তিনজনই একাকীত্বের নির্মম শিকার হয়েছে। রাহেলা চিরজীবন অন্ধকারে হেঁটে বুড়ি হয়ে যায়, ফুলি নিজের অজান্তে তার প্রাণ প্রিয় রবার্টকে হত্যা করে ফেলে। গন্ধলতার আবিলতায় চুমকি পথ হারিয়েছে শরীর অরণ্যে।

'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসটি মূলত স্কুল শিক্ষক ননী এবং কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দুজনেরই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে উপন্যাসের অন্দরমহলে। মানব চরিত্রের জটিল অন্ধকার সম্পর্কে লেখক আমাদের কৌতুক উদ্রেক করেছেন। ননী মানুষকে ভালোবেসেও বিবাহ করতে চায়নি; একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার। কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ননীকে বাক্যহারা করে দিয়েছে। মানু তার ভাই জনের জঘন্য কাজে লজ্জিত হয়ে ননীর পদতলে আশ্রয় পেতে চেয়েছে। শুরু হয় তাদের নতুন দিগন্তের অন্বেষণ। সিরাজ চরিত্রের সাথে খুব সহজেই মিল ঘটিয়েছেন। ব্যক্তির ইতিহাস তার নানা ছন্দে, নানা লয়ে অবশ্যই চোট খেয়েছে। সময়ের স্রোতে সিরাজ আসলে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হল 'নদীর মতন'। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ধরিত্রী; পৃথিবী বদলে যাওয়ার মতোই ধরিত্রীও রূপান্তর এবং পরিবর্তনের আধুনিক প্রতিমা স্বরূপ হয়ে ওঠে। ধরিত্রী সবকিছুর উপরে উঠে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন জীবনবোধ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বাঁধাধরা পথ ছাড়লেই পুরুষশাসিত সমাজে নানা বাঁধা এসে হাজির হয়েছে। তার জীবনে নানা সংকট কীভাবে এসেছে, কেমনভাবে গ্রামীণ স্বার্থজট তার ভাইকে উপলক্ষ করে আঘাত হেনেছে তাই উপন্যাসের মূল আখ্যানে দেখানো হয়েছে। আসলে তার মতো মেয়েরা পুরুষের কর্মচক্রে ঢুকে অর্জন করে নেয় নিজস্ব পরিচিতি। ফুলশেখর এবং বিপ্রশেখরের মাঝখানে নদীটি আসলে ধরিত্রীর প্রতীক।

সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে চরিত্রের বিষণ্ণতা, জটিলতা, নানা রহস্যময় মুহূর্ত। মানুষ ও প্রকৃতির আন্তর্লীন হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন চরিত্রের গভীর রহস্যের অন্তরালে ঢাকা অন্ধকারকে। প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসে উঠে এসেছে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিরাপত্তাহীন জীবনের জৈব তাড়নার কথা; যেখানে মনের টান নাই। চরিত্রের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় যৌনতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; তাকেই সিরাজ একজন সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনবোধের সামগ্রিকতায় বিন্যস্ত করেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখক জীবন শুরু হয়েছিল কবিতার

মধ্য দিয়ে। সিরাজ এও বলেছেন পৃথিবীর পাঠশালা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার কারণেই হয়তো জীবনকে এতো সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁর জীবন দেখার একটি বিশেষ ভঙ্গি হল তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো জীবনযুদ্ধে ন্যুব্জ, তবু তারা প্রাণ-পরিপূর্ণ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঋজু; এমনকি তাদের দুঃখের প্রকাশও ঋজু। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ যে রহস্যের কঠিন গিটে বাঁধা, যে বাঁধা জীবনকে এক কঠিন ধূম্রজালে ঢেকে রেখেছে। সিরাজ বিস্তীর্ণ সময় এবং মানুষকে ধারণ করে উপন্যাসের এক ভিন্ন জগত তৈরি করেছেন। মূলত প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষই তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। তিনি রাঢ় বাংলার প্রকৃতি, কাম, ক্রোধ, হত্যা, মৃত্যু নিয়ে ভিন্ন আস্বাদনের উপন্যাসের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষ খুঁজতে খুঁজতে এগিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি, মানুষ, জীবন অদ্ভুত ঘোর আর মায়াজাল নিয়ে উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক শুধু নিবিড় নয়, মানুষ প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির সাথেই বাঁধা তার অস্তিত্ব। তাই তাঁর প্রকৃতি সশব্দ, সরস এবং জীবন্ত।

ঘ. মিথ ও ইতিহাস :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্য সমগ্র বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে অনন্য সম্পদ। তাঁর রচনা প্রায় সবই প্রথম শ্রেণির। জয়ন্ত, ব্যোমকেশ, ফেলুদার পাশাপাশি বাংলা রহস্য সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে সিরাজের কর্নেল এবং কিছু পরিমাণে ইন্সপেক্টর ব্রহ্ম। কর্নেলের ফাদার খ্রিস্টমাস সুলভ চেহারা প্রায় শার্লক হোমসের বিখ্যাত গোঁফের সাথে তুলনা করা যায়। অলৌকিক অশরীরীর গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কৌতুকের কাহিনী সবকিছুতেই তাঁর ছিল অসামান্য দখল। সিরাজ প্রথম যুগের মুসলিম চিত্রকলা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিল্পকলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব কোনো কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। সিরাজের জ্ঞান প্রবেশ করেছিল বিনোদনমূলক সাহিত্যেও। মিথ ও লোককথা স্বাভাবিকভাবেই মিশে গেছে তাঁর কিছু সেরা কথাসাহিত্যের সাথে। তাঁর জীবনের সাথেও বলা যায়।

সিরাজের প্রথম যৌবন কেটেছে উত্তরবঙ্গের আলকাপ ও অন্যান্য লোকনাট্য, লোকশিল্প দলের সাথে। সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ‘নিলয় না জানি’, ‘আলোকলতা’,

'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাসে। এখানে কুশীলবদের জীবন আর মিথ বা লোককথা একাত্ম হয়ে যায়। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে যেমন বেদে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় চাঁদ বণিক, মনসা, বেহুলা, লখিন্দরের লোককথা ও লোকবিশ্বাস দিয়ে। আজকের দিনের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের প্রেম একাত্ম হয়ে ওঠে রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমের প্রসঙ্গে। লৌকিক ছাড়িয়ে যার অলৌকিক গণ্ডী। তেমনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে এসেছে এক ফকিরের লোককথা। ফকিরের প্রেমিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আঁচড়ে-কামড়ে-রক্তাক্ত করেছিল। আবার নরম হয়ে বিদায় নেওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ফিরে আসার, কিন্তু ফিরে আসেনি। প্রেমিকের দান হিসেবে থেকেছে ক্ষতচিহ্ন। 'আলোকলতা' উপন্যাসে আধা ডাকাত, আধা ফকিরকে পরম রূপবান মনসুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সিরাজের মতে মধ্যযুগের প্রখ্যাত সাধক মনসুর নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছেন।

আমরা জানি লোকনাট্য অভিনয় সৃষ্টি করে আর একরকম মিথ বা স্বপ্ন। যে যুগের আলকাপে বা যাত্রাদলে কিংবা থিয়েটারে কিশোররাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতো। এর বড়ো কারণ অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে নারী অভিনেত্রীর অভাব। কিন্তু সিরাজ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে অন্য কারণ হিসেবে বলেছেন, বাস্তবের চেয়ে কল্পনা বেশি আকর্ষণীয়। রক্ত-মাংসের নারীর চাইতে কল্পিত নারী কিংবা নারীবেশি কিশোর অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আর এই বাড়তি আকর্ষণের দরুন দলের মধ্যে গড়ে ওঠে নানা জটিল সম্পর্ক। এছাড়াও সিরাজ সাহেব প্রচলিত ও সুবিদিত মিথ ও কাহিনী নিয়ে অখণ্ড তিনটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন। লায়লা-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, শিরিন-ফরহাদ এর অমর প্রেম কাহিনীগুলি ইসলামিক সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ও মনোজগতে প্রবেশ করেছে। সিরাজ তার রূপ দিয়েছেন কথাসাহিত্যে। স্বভাবতই মিথ নানারূপ নেয়। সিরাজের উপন্যাসে লায়লা হুজ্জা গোষ্ঠী প্রধানের কন্যা। কায়েসকে দেখানো হয়েছে সুলতানের পুত্র হিসেবে। দুজনের প্রেম শেষ হয় মরণের মহামিলনে। ইউসুফ বা জোসেফের কাহিনী ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নেওয়া। কিশোর ইউসুফকে তার ভাইরা ষড়যন্ত্র করে দাস রূপে মিশরে বেঁচে দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ইউসুফ প্রতিকার নামক ক্ষমতাশালী সামন্ত প্রভুর গৃহে প্রধান অনুচরের পদে যোগ দেয়। তার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রভুপত্নী তাকে প্রেম নিবেদন করে। ইউসুফ প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হয়নি। প্রভুপত্নীর প্রেম প্রস্তাব তথা কু-

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে প্রভুপত্নী ইউসুফের বিরুদ্ধে ইজ্জত হানির অভিযোগ দিয়েছে। তার ইচ্ছায় ইউসুফের স্থান হয়েছে কারাগারে। ইউসুফের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যদ্বাণী করার। এর ফলে সে কেবল মুক্তি লাভ করেছে তাই নয়, মিশরকন্যা ফারাওয়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। দেশে রাজার পরেই তার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা। প্রভু পত্নীর কি হয়েছে তা বাইবেলে আর বলা হয়নি। এই কাহিনীকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কোরানে। আমরা জানতে পারি কোরানে নায়িকার নাম জুলেখা। ইউসুফের সাথে জুলেখার অবৈধ প্রেমের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। মিশরের অভিজাত নারীরা জুলেখাকে প্রশ্ন করেছে সে কেন এক বিদেশি দাসের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চায়। এই শুনে জুলেখা তার বান্ধবীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। অতিথিরা এসে ঠিক যখন ছুরি দিয়ে ফল কাটতে যাবে তখনই ইউসুফ ঘরে ঢুকেছে। রূপবান তরুণকে দেখে অভিজাত মিশরীয় রমণীরা দিশেহারা ও মোহিত হয়ে পরায় ছুরিতে তাদের হাত কেটে যায়। তারা বুঝতে পারে জুলেখার প্রেম অহেতুক নয়। বাইবেলের ইউসুফ-জুলেখা কাহিনী কোরানের মাধ্যমে বর্ধিত ও বিস্তারিত আরবি ও পারসিক কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই কাহিনী নিয়ে স্বতন্ত্র উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি সমান্তরাল রেখা টেনে আধুনিকতার সাথে আলোকলতার পরম পুরুষ মনসুরের প্রেমে ঘরছাড়া চাঁপা—এ যুগের জুলেখা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পদ্মাবতী' ও 'রূপবতী'। এখানেও মিথ ও ইতিহাস মিলেমিশে একাকার হয়েছে। বর্তমান আফগান প্রদেশ কান্দাহারের কাছে নুরিস্তান রাজ্যের উপজাতি হল কাথির। অধিকাংশ দেশে কাথিররা দস্যুরূপে ঘৃণিত ছিল। তবে পুরুষরা ছিল বীর ও সুদর্শন, মেয়েরা সুন্দরী। কাথির গোষ্ঠীপতির পুত্র, বিশ বছরের যুবক রুখ সমস্যায় পড়েছে। সে তার চাচাতো বোন রিয়ার সাথে বাগদত্তা। কিন্তু রুখ তাকে বিয়ে করতে চায়নি কারণ সে জানতে পারে রিয়া তার দেহ মন অন্য পুরুষকে দিয়েছে। হাতে প্রমাণ না থাকায় রুখ নিজের সমস্যার কথা বলতে পরামর্শ নিতে গেল পির সামান্দেশের কাছে। যদিও একজন কাথিরের পক্ষে সেখানে যাওয়া বেশ বিপজ্জনক। পির সামান্দেশকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, মনে করে তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সামান্দেশ কাথির রুখকে অভ্যর্থনা জানালেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে। তারা একসাথে গিয়েছেন কাথিরদের দেশে। তাদের

সাথে এলো পদ্মাবতী, সুলতান কালো বারহামের প্রধান মহিষী। পদ্মাবতীকে পূর্ববঙ্গের, পদ্মানদীর তীরের কন্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাকে ছলে বলে ধরে এনে অশ্ব ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সৈন্যরা সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিল। কারণ সুলতান এ ধরনের স্নিগ্ধ-শ্যামল বর্ণ পছন্দ করতেন। কিন্তু সুলতানের অনুপস্থিতিতে হারেম পদ্মাবতীর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তাই সামান্দেশ তাকে নিজের সাথে কাথিরদের রাজ্যে নিয়ে গেলেন। সুলতানার পরিচয় হল বৌদ্ধ শ্রমণা বা সন্ন্যাসিনী রূপে।

উপন্যাসে দেখা যায় সামান্দেশ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক অগ্নি গোলকের বা অ্যাপ্রনের ব্যবহার জানতেন। বিষয়টিকে লোকজন অবশ্য অলৌকিক শক্তির পরিচয় মনে করতো। তিনি কাথিরদের নতুন রণবিদ্যায় প্রশিক্ষণ করতে উদ্যোগী হলেন। সামান্দেশ আশা করেছে একদিন স্বাধীন কাথির বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যে সুলতান যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। সামান্দেশ পদ্মাবতীকে কাথিরদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তাকে মিলিত জনজাতির সমক্ষে নিয়ে আসে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে রুখ পদ্মাবতীকে সর্বসমক্ষে তুলে নিয়ে বিবাহ করেছে। কাথির মতে এমন বিবাহ সিদ্ধ। এই ঘটনায় সামান্দেশ মর্মাহত হয়ে পদ্মাবতীর পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করেছে। সামান্দেশ শোকে-দুঃখে বেরিয়ে পড়লে পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহে পদ্মাবতী যে সুখী সেকথাও সিরাজ তুলে ধরেছেন।

সিরাজ 'পদ্মাবতী' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি রুক্ষ অথচ সৌন্দর্যপ্রিয় জাতির জনজীবনকে দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন। সামান্দেশ একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র, তার জ্ঞান অসীম। অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি তাকে করেছে প্রায় মিথের ব্যক্তিত্ব। লোকে বিশ্বাস করে, তিনি বহু শতাব্দী জীবিত ছিলেন। মানুষের সব ভাষা তো বটেই, পশু-পাখির ভাষাও তিনি বুঝতেন। যুবক রুখের আকস্মিক আবেগ সামান্দেশের স্বপ্ন ধ্বংস করে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাকে মুসলিম জনসমাজ পির বলেই সম্মান করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। তিনি কাথির প্রাচীন দেবতাদের সাথেও পরিচিত ছিলেন। সিরাজের মতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনেও সে পারঙ্গম। একাধিক ধর্মের সংমিশ্রণ একটি মিথের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রূপবতী'। এই উপন্যাসে জর্জিয়ার খ্রিস্টান রাজকন্যা সামানি ফিজিলবাশ তাপাশের মহিষী হয়েছে। ফিজিলবাশ বা লাপ মেয়েরা ছিল দুর্ধর্ষ তুর্কী যোদ্ধা। মাথায় চুনি বসানো শিরস্ত্রাণের জন্য তাদের এই নাম। তাপিন শরবারি খাসের কাটা মুণ্ডু পারসিক শাহকে উপহার দিয়ে কুহিস্থান রাজ্য পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল। যদিও এর মধ্যে ছিল শঠতা। তাপিন শরকরির প্রকৃত হত্যাকারী ছিল না। তাপিন রূপবান ও শক্তিমান হলেও প্রকৃত অর্থে পুরুষ ছিল না, সে নারী সেজে নৃত্য-গীত ভালোবাসতো, আকৃষ্ট হয়েছে পুরুষদের প্রতি। এমন বিষয় সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসেও দেখিয়েছেন। গ্রামীণ বনদেবীর ছদ্মবেশে জর্জিয়ার রাজকন্যাকে হরণ করে এনে মহিষী করলেও তার কৌমার্য গ্রহণ করতে পারেননি। পাশাপাশি দেখতে পাই সামানি সুদর্শন তরুণ বারমাকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। তাপিন বান্দা বাখারকে বাধ্য করেছিল সামানির নগ্ন সৌন্দর্য দেখতে; সামানি সেকথা জানতে পারে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সামানি বারমাককে উত্তেজিত করে বাধ্য করেছে তাপিনকে হত্যা করার জন্য। হত্যার পুরস্কার স্বরূপ বারমাক সামানিকে বিবাহ করে বসেছিল মসনদে। এই উপন্যাসে সিরাজের একটি প্রাচীন কিন্তু সুবিদিত মিথ ইতিহাসের সাথে মিশে গেছে। হেরেদোতাস এর বর্ণনা নিয়ে সিরাজ তুলে ধরেছেন লিদিয়ার রাজা কাঁদল বা কান্দলের পরমা সুন্দরী রাণীর কথা। নিজের আনন্দ আর কারোর সাথে ভাগ না করলে কাঁদলের তৃপ্তি ছিল না। একদিন তিনি সেনাপতি গাইসনকে বাধ্য করলেন মহিষীর নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করতে। সেকথা জানতে পেরে অপমানিতা মহিষী সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাণী সেনাপতিকে জানায় তার অনাবৃত, অনুপম সৌন্দর্য দেখেছে এমন দুজন পুরুষ জীবিত থাকতে পারে না; হয় রাজাকে মরতে হবে, নয় সেনাপতিকে। সেনাপতি রাণীর কথায় রাজাকে হত্যা করেছেন। এইভাবে সেনাপতি মসনদ এবং অন্যান্য মহিষীদের করায়ত্ত করেছে এবং লিদিয়াতে নতুন রাজবংশের সূচনা হয়।

সিরাজ হয়তো প্রাচীন মিথ থেকে কাহিনির এই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর অবশ্য কাহিনির মোড় সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে যায়। আরব পর্যটক জাইদ ঘিন ইব্রাহিমের প্রভাবে বারমাক তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছে। বারমাক প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ছিলেন। শ্রমন আটক ও শ্রমণা শ্রেয়ধারার পুত্র ব্রক্ষক। বারমাক বা ব্রক্ষকের বাল্য স্মৃতির সাথে মিশে গেছে ভয়াবহতা। শ্রেয়ধারাকে ব্যভিচারের অপরাধে সংঘকর্তা মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়েছিল। যার অর্থ ক্ষুধা-তৃষ্ণার

কারণে তিলে তিলে মৃত্যু। বিদেশে দাস হয়ে ভিন্ন পরিবেশে বারমাক যা ভুলে গিয়েছিল; সেই স্মৃতি ফিরে আসায় সে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। সামানি, রাজ্য সব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। মায়ের অনুসন্ধানে সে মরুভূমিতে গিয়েছে। যদিও এতদিন পর অস্থিখণ্ড ছাড়া কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার অন্যদিকে বারমাকের ব্যর্থ প্রেমে তার প্রাক্তন প্রভুকন্যা বিলকিস আত্মহত্যা করেছে। বিলকিসের মায়ের ষড়যন্ত্রে আতস কাঁচের মাধ্যমে মরুসূর্য দেখতে গিয়ে বারমাক তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। বারমাক অন্ধ হলেও তার অন্তর্ভেদী মর্মদৃষ্টি দিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে। সামানির সাথে তার পুনর্মিলন হয়েছে। দু-জনেই পবিত্র নগর জেরুজালেম; যেখানে সামানির মা আগেই নিয়েছেন সেখানে আশ্রয় নেবে। এই ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে।

উপন্যাসে মিথের সাথে প্রতীক মিলেছে। প্রধান প্রতীক জল; যা মরুভূমির দেশে অমূল্য সম্পদ। বারমাক দিলরুদ নদীর উৎস আবিষ্কার করেছে। বণিক অবস্থায় সে মায়ের পরিণতির প্রতিশোধ নিতে সংঘ শেরকে পাথর মেরে হত্যা করেছে। পিতা আর্যক নির্দেশ দেন সহস্র তৃষ্ণার্তকে জল দিলে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে, বারমাক তাই করেছে। বহু সময়ের ব্যবধানের পর সহস্রতমা স্বরূপ সামানিকে পেয়েছে। বারমাক যেন জীবনদাত্রী জলের পুরুষ; যাকে অন্ধ করে দেয় বিপরীত মরুসূর্য। শিরিন-ফরহাদের মিথিক্যাল কাহিনীতেও জলের প্রাবল্য ও প্রতীক দেখা যায়। মিথ, ম্যাজিক ও বাস্তব সুদূর অতীতের কান্দাহার বা পারস্য, আধুনিক যুগে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম ও মহানগর, সিরাজ চিত্রিত ও চিহ্নিত করেছেন দক্ষতা ও সহমর্মিতা দিয়ে।

ঔপন্যাসিক সিরাজ শুধু কালের কিংবা যুগের পর্যবেক্ষক মাত্র নন। কাল ও যুগ অতিক্রান্ত জীবন ও সময় সত্য তাঁর উপন্যাসে অনায়াস কৌশলে ধরা পড়েছে। এই কাজে তিনি যুগকালের উপকথা, কিংবদন্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজেই লক্ষ মাত্রায় উন্নীত হয়েছেন। লোকায়ত মানবজীবন, ধর্ম, মনুষ্যত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস চেতনাকে সংমিশ্রিত করে তিনি এক আখ্যান ভুবন তৈরি করেছেন; যা সমকালীন লেখকদের থেকে তাঁকে আলাদা মাত্রা দান করে। এখানেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ঔপন্যাসিক সত্ত্বার কুশলী ও শক্তিশালী দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঙ. নিম্নবর্গের অবস্থান :

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদে নিম্নবর্গীয়দের জীবনকথা বেশ গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। চর্যাপদে সরব, ডোম, চণ্ডাল, কাঁপালি ইত্যাদি জাতির পরিচয় বেশ কয়েকজন পদকর্তার পদে চিহ্নিত। সরব জনজীবনের পরিচয় পাই ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক পদে। এই পদ দুটি থেকে জানা যায় সবররা বাস করতো পাহাড় কিংবা জঙ্গল ঘেরা জায়গায়। ময়ূরের পালক নির্মিত পোশাক ছিল তাদের পরিধানের বস্ত্র। ডোম জীবনের রূপ চিত্রিত হয়েছে ১০, ১৪, ১৮ ও ১৯ সংখ্যক পদে। কাঁপালি বা কাঁপালিক জীবনের ছবি পাই ১০ ও ১৮ সংখ্যক চর্যাতে। ৪৭ এবং ৪৯ সংখ্যক চর্যাতে রয়েছে চণ্ডালদের জীবনকথা। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অন্ত্যজ গোপ-জীবন ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ গোয়ালা বালক হিসেবে মাঠে রাখালি করে। নায়িকা রাধা গোপবধূ হাটে-বাজারে দুধ, দই বিক্রি করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই বেহুলা ও লখিন্দর ডোমের ছদ্মবেশে নিজ দেশে ফিরে এসেছে। বিজয় গুপ্তের কাব্য চণ্ডাল জীবনের কথা আছে। চণ্ডীমঙ্গল তথা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেখি কালকেতু ও ফুল্লরার অনুষঙ্গে ব্যাধ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র ও জীবনচর্যার ছবি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়েছে। ব্যাধ জীবনের খাদ্য; বস্ত্র, বাসস্থান, সামাজিক রীতি-নীতি-আচার, তাদের বিবাহাচার-অনুষ্ঠান-সংস্কার, তাদের সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক জীবন-জীবিকা সমস্ত কিছু উঠে এসেছে এই কাব্যে। শিবায়ন কাব্যেও ব্রাত্য মানুষের রূপচিত্র কবিরা অঙ্কন করেছেন। মৎস্যধরা ও শঙ্খপরা পালা দুটিতে কোচনী সমাজের কথা আছে। মৎস্য ধরা পালায় দেখা যায় দেবী পার্বতী বাগদিনী বেশে খাল-বিল সেঁচে মাছ ধরেছেন। পরবর্তীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, নানক, কবীরের প্রভাব—নিম্নবর্গীয় মানুষেদের জীবন চিত্রণে ব্যাপকতা এনে দিয়েছে। এই পর্যায়ে দেখা যায় ব্রাত্য মানুষ মর্যাদায় ভূষিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ব্রাত্য জীবনের রূপরেখা নানাভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তাদের প্রতি শতাব্দী পূজিত অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখকরা সোচ্চার হয়েছেন। আর্থ-সামাজিক এই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ব্রাত্য জীবনকে উপন্যাসে কীভাবে তাঁর দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সিরাজের 'তৃণভূমি' উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে আছে সোনাটিকুরির বিস্তীর্ণ অনাবাদি মাঠ-বিল-বাঁওড়। এই তৃণভূমি নিম্নবর্গীয় মানুষদের কাছে অমৃতের পসরা নিয়ে যেন বসে আছে। মাঠ চরানী মেয়েরা, বাথানওয়ালা, কিংবা ক্ষুধিত মানুষেরা অন্নের জন্য এখানে পড়ে থাকে। জলাভূমির বিলে কেউ মাছ ধরে, কেউ গুগলি, কাঁকড়া ধরে, শালুক তোলে, পদ্মচাকা ও পদ্মমূল তুলে খায়। খাদ্যের পসরা থরে থরে সাজানো এখানে। বন শিস, বন আলু, কুলশেপ ফুল, বৈচিঁ ফল হয়ে থাকে গাছে গাছে। নিরন্ন মানুষেরা তা সংগ্রহ করে, প্রাণে বাঁচে। ঢ্যামনা সাপ ধরে, সোনাগদি জন্তু-জানোয়ার মারে। পাখিওয়ালারা এসে পাখি ধরে নিয়ে বিক্রি করে। এ যেন রাজার এক ভাঁড়ার ঘর, যার দুয়ারে কোনো প্রহরী নেই। তাই এই প্রকৃতি ভাণ্ডার থেকে অঢেল সম্পদ কুড়িয়ে নিয়ে যায় গরীব-গুরবোর দল। খরকাটা, বাথানওয়ালা, গয়লা, রাখাল, মাঠ চরানী কন্যা, পাখিওয়ালা প্রত্যেকেই তৃণভূমিতে খুঁজে পায় বাঁচার আশ্বাস। তৃণভূমির সন্তান হয়ে বেঁচে থাকে তারা। সিরাজ লিখেছেন—"চোখের উপর ভাসছিল সেইসব ক্ষুধার্ত রাখাল ছেলেদের দৃশ্য—এক মুঠো চাল নালার হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে চারপাশে বিরাট যারা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব কুনাই বাউরি মেয়েদের কাঠকুটো শাক-মাছ-গুগলি-কাঁকড়া সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা, আর কতো মরিয়া চাষাভুষোর রক্ত জল করা ফসলের ক্ষেত ডুবিয়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর বন্যা, কতো যুগ-যুগান্তরকালের বার বার স্বপ্নভঙ্গের জীর্ণ চলচ্ছবি বুকে নিয়ে এই তৃণভূমি নিষ্ঠুর আর নির্বিকার হয়ে আছে।"[৩৮]

কলেজ ফেরত নিশানাথ ভুলতে পারেনি বাল্যসাথী মানিক, গঙ্গুদের কথা। তাই সে চলে গিয়েছে কুনাই বাউরি পাড়ায়, বিলের ধারে। মৃত মা রত্নেশ্বরীকে খুঁজে বেড়ায় প্রকৃতির মধ্যে। সম্পন্ন ঘরের ছেলে নিশানাথ কুনাই-বাউরি পাড়ার বুনো রাখাল, গয়লাদের সাথে মিশে তাদের পৃথিবীটাকে চিনতে পেরেছে—"প্রকৃতি জগতে পা দিলেই সব জ্বালা সব দুঃখ-কষ্ট হাস্যকরভাবে মিথ্যে মনে হয়। বেনা-উলু-কাশ-কুশের ওপর উড়ন্ত প্রজাপতি, ঘাস ফড়িঙের ছোটাছুটি হিজল বাবলার ডাল-পালার বনচড়ুইয়ের ঝাঁক-কতো রকম বিচিত্র কলরব, আর নিভন্ত রোদের বুকে প্রসারমান ছায়া।"[৩৯] মানিক, গঙ্গুরা তাকে বনের রাজা করে রাখে। নিশানাথ হয়ে ওঠে 'প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ুয়া'।

'তৃণভূমি' উপন্যাসে সবচেয়ে সংবেদী, বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী চরিত্র মানিক। মানিক, গঙ্গুরা বাথানের মোষ চড়ায়। তৃণভূমির কোটরে কোটরে ঘুরে বেড়ায়। মানিকে দুধে আলতা রঙের মোষ 'সোনালী' আর গঙ্গুর মোষের নাম 'আকালী'। তৃণভূমি মাতিয়ে বেড়ায় তারা মোষ নিয়ে। এইসব অন্ত্যজ শ্রেণির বাথানজীবিদের অন্নদাত্রী তৃণভূমিতে যেদিন যান্ত্রিক অভিঘাত নেমে আসে, সেদিন সর্বপ্রথম প্রতিবাদ এসেছিল মানিকের মন থেকে। মানিক জানে পরাশর কিংবা পালিত সাহেবরা যখন বাঁধ দিতে শুরু করবে, তেমনই দ্বারকার জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে তাদের সুখের বাঁধন। তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। সিরাজ লিখেছেন—"এক সময় একটা হিজল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা এ অরণ্যকে নতুন করে চিনে নিল। রক্ত ও হিংসার বাইরে আর এক শান্ত নির্জন জীবনধারা এখানে চলছে, যার মধ্যে পশুপাখি সরীসৃপ কীট-পতঙ্গের জীবজগৎ আবহমান কাল ধরে বড়ো নিরুদ্বিগ্ন, বড়ো আশ্বস্ত। ওরা পরস্পরকে স্পর্শ করে সেই আশ্বস্ত আর নিরুদ্বিগ্ন জীবনধারার স্পন্দন অনুভব করতে চাইল। গভীর বিহ্বলতায় দুটি ঠোঁট আর দুটি ঠোঁটকে ধরে রাখল কয়েক মুহূর্ত।"[৪০]

গ্রামীণ বৃত্তে বেড়ে ওঠা মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারই প্রান্তিক জনপথ কেন্দ্রিক উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস একক ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে না। মিখাইল বাখতিন-এর মতে—"The novel...that denies the absolutism of a single and unitary language as the sole verbal and semantic centre of the ideological word."[৪১]

একটি বৃহৎ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষিক সম্প্রদায় আধুনিক উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সিরাজ 'তৃণভূমি' উপন্যাসে সেই শর্ত পূরণ করেছেন। কুনাই-বাউরি-সাঁওতাল-আদিবাসীদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা এই উপন্যাসে সাবলীলভাবে খাপ খেয়েছে। যেমন—

১. "কী কপাল দ্যাগ গ, বিল বাদাড়ে, এটুকন সিঙ্গেল পাই না ঢুঁড়ে। ...হ্যাঁ গো ছোটোবাবু, কী মাত্তে বের্যালছ বুলোধিনি? পক্ষি না মানুষ? হঁ, বুলো, ডর কিসের? ই ত মানুষ মারা ঠাঁই বতে!"[৪২]

২. "হা দিদি। এখন ও মোনের কুটো বেল না। ওই লোকটা কি গুন করে এখেছে তুকে? ...আজিৎ জুড়ে তুর জয় জয়াক্কার দিদি গো, তমু তুর মনের ভরমাটি ঘুচল না।"[৪৩]

সিরাজের 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে মদনচাঁদ ফকির ও আবদুল্লার কথায় লেখক ইন্দ্রাবাদের মাদার পিরের মেলা দেখতে গিয়েছেন। সেখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মদনচাঁদের বাড়িতে। ফকিরের অভাবের সংসারে আতিথেয়তা গ্রহণ করে সবাই পিরের মেলায় যান। এই মেলা ফকিরদের মিলন মেলা। মেলার আধ্যাত্মিক গানগুলি সিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে দেখিয়েছেন কাঞ্চনের পরিণতির কথা। স্থূল লালসার কামনায় দগ্ধ হয়ে কাঞ্চনের শেষ আশ্রয় হয়েছে শহরের বাগান বাড়ির পতিতা পল্লিতে। সিরাজ এখানে নিম্নবর্গীয় মানুষদের বিলাভ-বৈভবে আকৃষ্ট হয়ে করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ব্যক্তি জীবনকেন্দ্রিক ব্রাত্য জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির কিছু কিছু কাহিনীতে দেখা যায় অত্যাচার লাঞ্ছিত ব্যক্তিজীবন উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এইসব কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্রাত্য মানুষ উচ্চতর শ্রেণি ও সমাজের মানুষের দ্বারা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে কিংবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে। সিরাজের 'নদীর মতন' উপন্যাসে দেখা যায় ব্রাত্য মানুষেরা নিম্নমানের আহারাদি গ্রহণ করে দিন যাপন করে চলেছে। তাদের বর্ণনায় সিরাজ লিখেছেন—"বাঁশ বনের আড়ালে হল্লা করে মুনিশরা মাটি ফেলছে। ধরিত্রী সাঁওতাল ডাঙায় ঢুকে দিরেংয়ের বাড়ির সামনের যায়। উঠোনে দিরেংয়ের মা শুকতে দেওয়া ধান নেড়ে দিচ্ছিল। ধরিত্রীকে দেখে মাছের চোখে তাকায়।"[৪৪]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বেদবতী', 'নীল ঘোড়া', 'জানমারি' প্রভৃতি উপন্যাসে বাগদি, ডোম, কুনাই, বাউরি সমাজের গোষ্ঠী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গাজন উৎসব উপলক্ষে এইসব মানুষেরা পড়ন্ত বিকেলে সমবেত হয়েছে মন্দির তলায়। বছরের প্রতিটি দিনই এদের জীবন দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে কাটে। আনন্দের পরশ বলতে এই গাজনের দিন। এই দিনটিতে পূজো উপলক্ষে পাঁঠা বলি দিয়ে রাতের অন্ধকার শুরু হতেই উন্মত্ত আনন্দে মেতে ওঠে। কণ্ঠ ভরে মদ খায় আর বিচিত্র রকমের সঙ সেজে আনন্দ উপভোগ করে। কেউ দারোগা

সাজে, কেউ হনুমান, কেউ বাবু, কেউ ছড়া কাটে, কেউ তাদের সমাজের কেলেঙ্কারি নিয়ে গান ধরে।

উপরিউক্ত ব্রাত্য জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনের পরিচয়। লক্ষণীয় বিষয় অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত এই মানুষগুলির প্রতি সিরাজের সহানুভূতি প্রায়ই দেখা গেছে। তাই তাদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের করুণ আর্তি মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে। উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বিচিত্র মানব-মানবীর পরিচয় পেয়েছি। সিরাজের উপন্যাসের পটভূমির বৈচিত্র্যও কম নয়; উঠে এসেছে বাংলার গ্রাম, নদী, দিঘি, প্রান্তর, শহর এবং শহরতলীর কথা। ঘটনা ও চরিত্রে নিম্নবর্গীয় মানুষের মুখের কথা ব্যবহৃত হয়েছে

তথ্যসূত্র

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তৃণভূমি', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ১৩১

২. তদেব : পৃ. ১৯

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'বাসস্থান', আনন্দ, ১৯৮৫, পৃ. ১

৪. তদেব : পৃ. ২

৫. তদেব : পৃ. ৩

৬. তদেব : পৃ. ১৪

৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'অলীক মানুষ', দে'জ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২

৮. তদেব : পৃ. ১০১

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'প্রেম-ঘৃণা-দাহ', রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭৫, পৃ. ১১
১০. তদেব	:	পৃ. ১২
১১. তদেব	:	পৃ. ১৩
১২. তদেব	:	পৃ. ২
১৩. তদেব	:	পৃ. ১৩
১৪. তদেব	:	পৃ. ৩৬
১৫. তদেব	:	পৃ. ৩৯
১৬. তদেব	:	পৃ. ১১৭
১৭. তদেব	:	পৃ. ৮৫
১৮. তদেব	:	পৃ. ১১৫
১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৭
২০. রায়, নীহাররঞ্জন	:	'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), ফাল্গুন, ১৪১৬, পৃ. ১১৯
২১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি', ঐক্য, ২০১৩, পৃ. ৩০-৩১
২২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'উপন্যাস সমগ্র-৩', দে'জ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৪২৯
২৩. তদেব	:	পৃ. ৪৩৫

২৪. তদেব : পৃ. ৪৩৬

২৫. তদেব : পৃ. ৪৪১

২৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'উপন্যাস সমগ্র-২', দে'জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৬০

২৭. তদেব : পৃ. ১৬১

২৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'বাসস্থান', আনন্দ, ১৯৮৫, পৃ. ১

২৯. তদেব : পৃ. ২

৩০. তদেব : পৃ. ৩

৩১. তদেব : পৃ. ১৫

৩২. মিত্র, অমর : 'কালুডিহির মানুষ', দরবারী সাহিত্য, ২০০২, পৃ. ২৮

৩৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'আত্মকথা', সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৩, পৃ. ৩১

৩৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'উপন্যাস সমগ্র-৩', দে'জ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১৭

৩৫. তদেব : পৃ. ৩৯

৩৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'উপন্যাস সমগ্র-২', দে'জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৫৭

৩৭. তদেব : পৃ. ১৫৮

৩৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘তৃণভূমি’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ১৩১

৩৯. তদেব : পৃ. ১৫৭

৪০. তদেব : পৃ. ১০১

৪১. Bakhtin, Mikhail : ‘The Dialogic Imagination : Four Essays’, edt. By Michael Halquist, University of Texas Press, Austin and London, 1981, P. 366 (www.google.com)

৪২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘তৃণভূমি’, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৩, পৃ. ২৪

৪৩. তদেব : পৃ. ২৭৬-২৭৭

৪৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘উপন্যাস সমগ্র-১’, দে’জ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৪৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

"সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিক"

দেশভাগ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একজন সফল ঔপন্যাসিক হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০ ২০১২)। তবে গল্পকার হিসেবেও তিনি আলাদা সম্ভ্রমের দাবী রাখেন। 'ইবলিশ' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা 'কাঁচি' (বহরমপুর, 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়)। বিশিষ্ট গদ্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন 'অমৃত' পত্রিকায় 'সীমান্ত থেকে ফেরা' (১৯৬২) প্রকাশিত হবার পর থেকে। ১৯৬৩ সালে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন' নামক গল্পে তাঁর প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। গ্রাম ও শহরের বৈচিত্র্যময় মানুষ তিনি দেখেছেন; শুনেছেন তাদের হাসি ও কান্না। যে অদৃশ্য তাঁতি আমাদের জীবনের তাঁতে সাদা-কালো বা রঙিন সুতো বুনে চলেছেন তার খবর তিনি দিয়েছেন। কখনো তিনি নিজে বক্তা, কখনো চরিত্রের ঘটনার ব্যাখ্যাকর্তা। শেষপর্যন্ত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মানুষের রক্ত-মাংসের চেহারাকে, হৃদয়ের রক্তমাখা শিরাকে ধরতে চেয়েছেন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা সিরাজের কথা সাহিত্যের আঙিনাতে মাঝে মাঝে এসেছে। আসলে তিনি ছিলেন গভীর জীবনবাদী। বিস্তৃত জীবনের পরিসরে ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাগুলিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর সেই পর্যবেক্ষণীর নিগূঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব, লোকজীবনের বিভিন্ন দিক, নাগরিক জীবনের কুটিলতা, সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রকৃত অর্থে একজন 'অলীক মানুষ'। সাহিত্য প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও গভীর জীবনবোধের সমন্বয়ে তিনি যে নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন গল্প-উপন্যাসে তা প্রশংসার অতীত। গল্প এবং উপন্যাস মিলিয়ে সিরাজের রচনা কম নয়। বেশ কয়েকটি উপন্যাস উচ্চ প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত। তাঁর উপন্যাসের জগত বিচিত্রময়। সেই অভিজ্ঞতা তথা অনুভব সঞ্চিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের গ্রাম, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনচর্যা

থেকে। সিরাজের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে তিনি শৈশবের প্রতি মাত্রাধিক দুর্বল ছিলেন—"আমাদের গ্রাম খোশবাসপুর থেকে নেমে গেলে দ্বারকা নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা। চাষাবাদ হত না। উলুকাশের জঙ্গল। খাগরি মানে ছোট ছোট নালার মতো আর বিল। বই ফেলে রাখালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো—এই হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ।"[১] সিরাজের অধিকাংশ উপন্যাস জুড়ে আছে এই প্রকৃতি এবং তার মানুষের কথা। প্রসঙ্গত বলা দরকার মুর্শিদাবাদের মাঠ, বিল, উদ্ভিদের বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়—"হাঁটতে হাঁটতে সে মাঠের আমগাছগুলোর নিচে চলে এসেছে। কি নিলুম! ...দূরে স্টেশনবাড়িটা শুধু জেগে আছে। ...তারপর হিজলের বিল। শেষ নাই তার। সে হিজলের জল পাঁচ বছরে মাত্র একবার পার হয়েছিল। দশ মাইলের ওপর বিলটা। যেন শেষ নাই। গ্রীষ্মে নদীনালায় কিছু জল থাকে—তারপরে খাঁ খাঁ প্রান্তর। খড়ের বন-মাঠ তামাটে রঙের হয়ে যায়। ...বর্ষায় তার রূপ ভৈরবী। দু-পাশের গ্রামগঞ্জ ঘেরি বন্যায় কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"[২] অতীনের গল্পের ভুবনে প্রকৃতির আমেজ থাকলেও সেখানে মানুষের অন্তর্গত শোক, দুঃখ, হতাশা, বেদনা ও স্মৃতির ক্ষরণ অধিক চিত্রিত হয়েছে। আর সিরাজের উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে হিংসা, কামনা-বাসনা, হত্যা ও প্রতিহননের কাহিনী। তাঁর কথায়—"যে অঞ্চলে আমার বেড়ে ওঠা, সেখানকার মানুষেরা খুব দুর্ধর্ষ ছিল। ভীষণ খুনে ছিল। খুন-খারাপি দেখতে দেখতে মানুষ হয়েছি। এই হত্যা, হিংসা দেখে দেখে আমি নির্লিপ্ততার পাঠ প্রকৃতি থেকেই পেয়েছি।"[৩]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) দেশ ভাগের ফলে বাঙালির শেকড় হারানো নানা সংকটময় দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল—'সমুদ্র মানুষ' (১৯৬০), 'সমুদ্র পাখির কান্না' (১৯৬১), 'একটি জালের রেখা' (১৯৬২), 'শেষ দৃশ্য' (১৯৬৪), 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮), 'ঈশ্বরের বাগান' (১৯৭৮), 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১), 'অলৌকিক জলযান' (১৯৭৫), 'মানুষের হাহাকার' (১৯৮১), 'নগ্ন ঈশ্বর' (১৯৮৪) প্রভৃতি। অতীনের লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস হল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের, ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন উপন্যাসগুলিতে নতুন ভাবে দেখা দিয়েছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের স্মৃতি, দেশ-বিভাগ, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, জমিদার প্রথার সম্পর্ক, আর সেই অতীতকে ফিরে না পাবার বেদনাই উপন্যাসটির কাহিনী জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপন্যাসটির শুরুতে আছে ঈশমের যাত্রা এবং শেষে তার প্রিয় শখের তরমুজ লতার ভিতরে ঘটেছে তার মৃত্যু। ঠাকুরবাড়ির অন্নে, স্নেহে, যত্নে মানুষ হয়েছে ঈশম; সে হিন্দু কি মুসলমান এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ পায়নি। কাজের মধ্য দিয়েই সে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু একদিন সব স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। মানুষ নয়, সেখানে বড়ো হয়ে উঠল জাত; মানবতার প্রশ্ন নয়, বড়ো হল হিন্দু না মুসলমান। অতীন সেই বদলে যাওয়া ইতিহাসের অধ্যায়কেই তুলে ধরেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথায় অনেকটা এইরকম—পথের পাঁচালীর পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হল 'অলৌকিক জলযান' (১৯৭৫)। প্রায় সোওয়া দুই লক্ষ শব্দের সুনিপুন সমারোহে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিশাল ইমারত, যা শুধু আয়তনে নয়, বহু বৈচিত্র্য বর্ণময় ঘটনায়, নিবিড় রহস্যময়তার এবং চমৎকারিত্বে অসাধারণ। দেশ-ভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পূর্বাপর সমন্বিত নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র কিশোর নায়ক সোনা উদ্বাস্তু হয়ে এই বাংলায় এসে প্রত্যক্ষ জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এম. এস মিউল ব্যাংক জাহাজে সবচেয়ে নিচু পদে কোলবয় হয়ে নিযুক্ত হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙে গেছে, এখন বর্তমানের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) এই সময়ের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। 'আত্ম প্রকাশ' (১৯৬৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস; স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাঙালি তরুণ-তরুণীর আশা ও বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন এই উপন্যাসে। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'অর্জুন' (১৯৭১), 'জীবন যে রকম' (১৯৭১), 'আমিই সে' (১৯৭৪), 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' (১৯৭৮), 'সেই সময়' (১ম খণ্ড ১৯৮১, ২য় খণ্ড ১৯৮২), 'প্রথম আলো' (১ম-১৯৯৬, ২য়-১৯৯৭), 'অন্য জীবনের স্বাদ' (২০০০) ইত্যাদি।

সুনীলের উপন্যাসে আছে সমকালের জীবন উত্তাপ। তাঁর উপন্যাস সমাজ-চেতনা ও জীবন-চেতনার ফসল। 'প্রথম আলো'-য় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার আখ্যান এসেছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদ, ত্রিপুরার রাজবাড়ি, পরাধীন বাঙালির হৃদয় যন্ত্রণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ জীবন পরিস্ফুট হয়েছে 'সেই সময়' উপন্যাসে। বাংলাদেশের নবজাগরণের বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসাশ্রয়ী চরিত্রগুলো যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। দেশ-ভাগের পর পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—দুই বঙ্গেরই সাধারণ মানুষ অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে সে কথাই বলেছেন।

'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে প্রতাপের ব্যক্তিজীবন, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি খুঁজে পাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রতাপের জন্মভূমি, পুকুরের মাছ, খেত-খামার সব হারিয়ে যায়। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয় অন্য আর এক ভুবনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল মানুষের সেই জবরদখল করা বাড়ি, অসিত বরণের মৃত্যু, বরদাকান্তের মৃত্যুর সঙ্গে পুরাতন সময়ের নিশ্চিত বিদায়ের আভাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর কলকাতার বৈশিষ্ট্য, নতুন গড়ে ওঠা ঝাঁ-চকচকে দক্ষিণ কলকাতার জনপদ, শিক্ষিতা নাগরিকার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ যেমন একটা সময়ের অনিবার্য পরিবর্তনশীলতার ছবিকে তুলে ধরেছেন তেমনই ওই সময়ের অনিবার্য প্রভাবে কি আশ্চর্যভাবে পাল্টে যাচ্ছে মানুষেরা। জাতপাত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অহং আচরণ, সৈয়দ বংশজাত মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতা সৈয়দ আব্দুল হাকিম সাহেবের হিন্দুদের নিচু জ্ঞান করা এ সব সময়ের দলিলরূপে সুনীলকে কখনো খুশি করেছে—কখনো তিনি নিছক ইতিহাসকার রূপে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতাপ, প্রতাপের স্ত্রী মমতা, বুলা, মামুন, মামুনের স্ত্রী ফিরোজা; এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সময়ের দলিল হয়ে আছে।

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল—'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৮), 'কেয়া পাতার নৌকা' (১ম-১৯৬৯, ২য়-১৯৭০), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪),

‘রামচরিত্র’ (১৯৮৫), ‘আকাশের নীচে মানুষ’ (১৯৮১), ‘সিন্ধুপারের পাখী’ (১৯৫৮), ‘ভাতের গন্ধ’ (১৯৮১), ‘মানুষের যুদ্ধ’ (১৯৮৩) ইত্যাদি। তাঁর ‘সিন্ধুপারের পাখী’ ১৯৮৩-তে বঙ্কিম পুরস্কার এবং ক্লান্তিকাল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পায়।

‘পূর্ব-পার্বতী’-তে এসেছে গোষ্ঠী জীবনের কথা। পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবনাচরণ, নাগা জীবনের কঠোর বাস্তব ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তাদের (নাগাদের) মুখে অভিনব বাংলা সংলাপ বসিয়ে লেখক সম্পূর্ণ অপরিচিত নাগা সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী জীবন স্বভাবকে বাঙালি পাঠকদের কাছে নতুন স্বাদে উপস্থাপিত করেছেন। ‘কেয়া পাতার নৌকা’-য় উদ্বাস্তু জীবন, প্রেম, সমস্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট চিত্রিত হয়েছে। বিনুর চোখ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ। ‘ভাগাভাগি’ উপন্যাসে একটি হিন্দু পরিবার এবং একটি মুসলমান পরিবারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। চূড়ান্ত পরিণতিতে দেখানো হয়েছে, আলী হোসেনরা ব্রিটিশদের ইন্ডিয়া ছেড়ে পালাতে চায়। আর এই সুযোগে মুসলমানদের একটা আলাদা রাষ্ট্রের দাবী উঠে আসে। তখনই গোলমাল বেধে গেল দুই পরিবারে। এরপর দাঙ্গা, ফলস্বরূপ বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

প্রফুল্ল রায়ের ‘রাম চরিত্র’ উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ রয়েছে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘উনিশ বিশের কড়চা’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসে যে অঞ্চলকে বাংলা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন সেখানকার মানুষের মধ্যে জাতপাতের সমস্যা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, মানুষের শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

‘আকাশের নীচে মানুষ’ উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে রাঁচির নিকটবর্তী গারুদিয়া অঞ্চল। এই খোলা আকাশের নীচে জমি অনেক থাকলেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটে নামমাত্র জমি। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কেতুপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা যেমন ভাবে মাথা গুঁজেছেন ঠিক একইভাবে ঘরের পিঠে ঘর বানিয়ে এলাকার মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছেন। জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও বেনামে জমি করায়ও করে রাখে এলাকার অধিপতিরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, উঁচু জাত বনাম নিচু জাত। অর্থাৎ মানবতার অপমানই রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে।

দেবেশ রায় পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন নানা পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন ঠিক তেমনই ভাবে উপন্যাসের তাত্ত্বিকতাকে অনেকটা স্বচ্ছ করেছেন। উপন্যাসের ফর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—"ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে যা উপন্যাসে পরিণত করে সেটাই তো কর্ম। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার নানা চেষ্টায় বার বার হয়তো এখানেই ঠেকে গেছি। ঠেকে যে গেছি তাও হয়তো সব সময় বুঝিনি, বুঝি না। যখন যখন নিজের অতীতটাকে একসঙ্গে দেখার মতো চড়াইয়ের দিকে চলেছি আর সেই চড়াই থেকে যতই চোখের সামনে বাংলা উপন্যাসের সমতল বিস্তৃততর হচ্ছে, ততোই অসহায় ও ক্ষমতাহীন ক্ষোভ বুঝতে পারছি—ইউরোপীয় মডেল আমাদের পরিত্রাণ নেই।"[৪]

তাই তিনি সর্বদাই নিজস্ব আঙ্গিকে উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন। দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের উত্তেজনা, নতুন মূল্যবোধ পঞ্চাশের দশকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্মম এবং জটিল বাস্তব অনুভবের গাঢ়তায় নির্মিত হয়েছে তাঁর কাহিনী বা আখ্যান। তাঁর রচনার মূল বিষয় মানুষ; নাগরিক ও গ্রাম্য উভয় স্তরের মানুষ। দেবেশ রায় সর্বাধিক অনুপুঙ্খ তথ্যসহ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন; যার জন্য চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে সজীব। তিনি এক বিশিষ্টরূপে মানুষের কথা ভাষারূপ দিয়েছেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য দেবেশ রায় সম্পর্কে বলেছেন—"তিনি উপন্যাসের মনোরঞ্জন ও ইচ্ছা পূরণের ধরনকে আমূল পাল্টে দিয়েছেন। অজস্র অন্তর্বয়ণে অনেকার্থ দ্যোতনার প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ বলে তিনি নির্দ্বিধায় বিচিত্র উপাদানের সংশ্লেষণ করে গড়ে তুলেছেন প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসের আদল। এতে মনন ও অনুভূতি, বাস্তব ও কল্পনা দ্বিবাচনিক ঐক্যে বিধৃত। আর, বাংলা সাহিত্যের সীমান্ত এতে প্রসারিত হয়ে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল ভারতবর্ষের উপস্থিতিকে উপন্যাস-গ্রন্থনার আধেয় করে নিয়েছে।"[৫]

প্রতিভাবান এই ঔপন্যাসিকের জন্ম বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মাতা অপর্ণা, পিতামহ উমেশচন্দ্র রায়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র জীবনে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'হাঁড়কাটা'। তিনি দীর্ঘদিন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস—'যযাতি'। দেবেশ রায়ের উল্লেখযোগ্য

উপন্যাসগুলো হল–'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' (১৯৭৯), 'যযাতি' (১৯৭৩), 'মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৬), 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'বেঁচে বততে থাকো' (১৯৮৪), 'আত্মীয় বৃত্তান্ত' (১৯৯০), 'খরার প্রতিবেদন' (১৯৯১), 'ইতিহাসের লোকজন' (১৯৯২), 'উপদেশ বিদেশ' (১৯৯৩), 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩), 'লগন গান্ধার' (১৯৯৫), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'তিস্তা পুরাণ' (১৯৯৭), 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১০) ইত্যাদি।

'যযাতি' থেকে তাঁর উপন্যাস লেখার যে ধারাটি তিনি প্রবর্তন করেছেন তাতে দেখা যায় প্রতিটি উপন্যাসের বিষয় যেমন আলাদা, তেমনই আলাদা উপস্থাপনের ভাষাও। তিস্তাপারের মানুষের জীবন বৃত্তান্ত হল 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদলে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ মানুষের জীবন প্রবাহের পরিবর্তন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'-র মতো তাঁর আর একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস হল–'তিস্তাপুরাণ'। দুটি উপন্যাসের সময়ের ব্যবধান ২০ বছর। এই উপন্যাসে পুরাণের মতোই তিস্তাপারের মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বংশ বর্ণনা, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস, পার্বণ, রীতি-নীতি, গান, ছড়া, ফাকালী, ছিলকা, প্রবন্ধ, রসরসিকতা, রাজনীতি ও বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে।

এই সময়ের আরও একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। পিতার চাকরি সূত্রে শীর্ষেন্দু বাল্য ও কৈশোর উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং দেখেছেন সেখানকার সাধারণ মানুষকে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজের একাকীত্ব, হতাশা, যন্ত্রণা; যা সিরাজের উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বহু উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল–'ঘুন পোকা' (১৯৬৭), 'উজান' (১৯৭১), 'পারাপার' (১৯৭১), 'মানব জমিন' (১৯৮৮), 'যাও পাখি' (১৯৯৩), 'পার্থিব' (২০০১) ইত্যাদি। প্রতিভাবান এই কথাসাহিত্যিক ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণ পোকা'-ই তাকে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই উপন্যাসের নায়ক জীবনে তথাকথিত সুখ পেয়েও বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায়নি। নায়ক শ্যাম আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সংকটকে নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। লেখকের ভাবনায় বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, মূল্যবোধের অপচয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজের একাকীত্ব, হতাশা, যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'যাও পাখি'। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র ব্রজ গোপাল ও ননীবালা বিশ্বসংসারের মানুষকে সুখী দেখতে চান। উপন্যাসে ব্যক্তি স্বার্থ নয়, সমষ্টি স্বার্থই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রেরা হল—রণেন, সোমেন, শিলা, ইলা এবং রণেনের স্ত্রী বীণা; তাদেরকে নিয়েই উপন্যাসের ঘটনা স্রোত আবর্তিত হয়েছে।

তাঁর 'উজান' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একান্নবর্তী পরিবারে পুরুষদের নিঃস্পৃহতার কথা, তাদের জীবনযাপনে বাউণ্ডুলে ও ত্যাগী মনোভাবের কথা। একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তিজীবন বলে কিছু হয় না, যা হয় সবটাই যৌথ জীবনের কথা। অর্থাৎ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক একান্নবর্তী পরিবারের ভালো-মন্দ এবং পরিণতিতে সময়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলা জীবনকথা তুলে ধরেছেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছে। তাদের বেড়ে ওঠা, জীবন-সংগ্রাম অনেক উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনই ভাবে 'পার্থিব' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গ্রামের দরিদ্র ঘরের ছেলে কৃষ্ণজীবন প্রতিভাবলে বিজ্ঞানী হয়েছে। কৃষ্ণজীবন চরিত্রের মানসিক স্তরের বিবরণ লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরেছেন। সে শহরে থাকলেও গ্রামকে ভোলেনি, তার বাবা মারা গেলে গ্রামে এসে পুকুরের জলে স্নান করেছে। এই উপন্যাসের বর্ণময় চরিত্রগুলি হল—বিষ্ণুপদ, রামজীবন, নয়নতারা, বীণাপাণি, চারুশীলা, অপর্ণা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আসেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। মুর্শিদাবাদ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তিনি ছিলেন সচেতন

বাস্তববাদী সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আধুনিক যান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনা শৈলীও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'বন্ধনী' (১৯৩১), 'শৃঙ্খল' (১৯৩২), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭), 'সোমলতা' (১৯৩৮), 'ক্ষুধা' (১৯৪৪), 'কালো ঘোড়া' (১৯৪৬), 'অনুষ্টুপ ছন্দ' (১৯৫১), 'নাগরী' (১৯৬১), 'নীল আগুন' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

তাঁর 'অনুষ্টুপ ছন্দ' উপন্যাসের নায়িকা সৌদামিনী। সৌদামিনীর বাবা শিবশংকর, ঠাকুরদা কালীশংকর। অন্যদিকে রয়েছে তার শ্বশুর প্রসন্ন, শাশুড়ি তরঙ্গিণী। সব কিছু নিয়ে একটি রক্ষণশীল সমাজের পরিচয় উপন্যাসে পেয়েছি। সমাজের পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছে ন্যায় পঞ্চানন। সৌদামিনীর স্বামীর নাম প্রণব; তার জীবনে আবর্তিত হয়েছে সৌদামিনী, সুচরিতা, অরুণার ভালোবাসা। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সৌদামিনী মারা যায়। তাঁর 'কৃশানু' উপন্যাসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শ্রী, ব্রততী, শুভেন্দু, ভুজঙ্গ ইত্যাদি চরিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। 'নীল আগুন' উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা, গৃহহারা মেয়েদের করুণ আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। 'কালো ঘোড়া' উপন্যাসে যুদ্ধ পরবর্তী কলকাতার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শ্রীমন্ত।

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে একজন অন্যতম ব্যতিক্রমী রচনাকার। তিনি ১৯৫৬ সালে 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে 'সাপ্তাহিক সচিত্র ভারতে' লেখা শুরু করেন। ঐ একই সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ঝাঁসির রাণী' জীবনীগ্রন্থ্। তাঁর রচিত অন্যতম উপন্যাসগুলি হল—'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুরে' (১৯৫৮), 'এতটুকু আশা' (১৯৫৯), 'তিমির লগন' (১৯৫৯), 'তারার আঁধার' (১৯৬০), 'বায়স্কোপের বাক্স' (১৯৬০), 'রূপরেখা' (১৯৬০), 'লায়লী আশমানের আয়না' (১৯৬১), 'অমৃত সঞ্চয়' (১৯৬২), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নটী' উপন্যাসের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে মোতির মা রোশনের মধ্য দিয়ে। রোশন নিজের প্রেমের বিস্তার খুঁজতে গিয়ে দু-বছরের মেয়ে মোতিকে রেখে মারা যায়। পরবর্তীকালে এই মোতি ঝাঁসির রাজদরবারে নর্তকীর পেশা গ্রহণ করে। মোতির সাথে যুক্ত হয়

সৈনিক খুদাবক্স। তাই দেখা যায় রাজনর্তকী ও সৈনিকের প্রেমের ভেতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে যায়। খুদা বক্সের মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব হাতে নেয় মোতি এবং যুদ্ধে তারও মৃত্যু ঘটে। এর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি প্রেমকে স্বদেশ প্রেমে উত্তীর্ণ করেছেন।

তিনি নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে 'মধুরে মধুরে' নামে একটি অসামান্য উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সাধন, রাধা এবং বৃন্দা। চরিত্রগুলির ভৌগোলিক বিস্তৃতি দেখানোর জন্য লেখিকা বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নির্বাচন করেছেন। যেমন—চট্টগ্রামের সাধন, প্রবাসী বাঙালি রাধা এবং বৃন্দাকে নির্বাচন করেছেন মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যের কুমার বাহাদুরের কন্যা হিসেবে। মধ্যযুগের বাউল সাহিত্যের মতোই বাউণ্ডুলে চরিত্রদের উপন্যাসে নিয়ে এলেন মহাশ্বেতা। এই সব চরিত্রের টানাপড়েন, আপদ-বিপদের কথা নিখুঁতভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে। শিল্পের জন্য জীবন-মরণ সমর্পণ করতে পারেনি বলে বৃন্দাকে একসময় চলে যেতে হয়; কিন্তু জীবন ও শিল্পের মাঝে সামঞ্জস্য করে রাধা এগিয়ে চলে। উপন্যাসে সাধনের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের জীবনকে নানা রূপে চিনতে পারি।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে মহাশ্বেতা উপন্যাসকে নানা রঙে, নানা ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সার্কাসের শিল্পীদের কথাও তিনি উপন্যাসে তুলে এনেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'প্রেম তারা'-তে দেখা যায় ৫ বছরের মেয়ে প্রেমতারা বাবার হাত ধরে সার্কাস দেখতে এসেছিল। প্রেমতারার প্রথমে ভয় হয় এবং ভয় ভাঙতে ভাঙতে সে সার্কাস দেখেছে। তার অনুভবে উঠে এসেছে শিল্পের কথা, একজন মানুষকে নানা শিক্ষাদীক্ষা আর সাধনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—এটাই সার্কাস। মহাশ্বেতা গড়িয়ে চলা শিল্প মাধ্যম ও তার ভেতরের চরিত্রগুলি নিয়ে উপন্যাসের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। ভূমিতে যোগ দেয় প্রেমতারা। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল—মনোহর, মালিক গোপী, প্রেমতারা এবং ট্রেনিং দেওয়া বাঘ বাদশা।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা। তাঁর 'এতটুকু আশা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্তের বিত্তবান হয়ে ওঠার স্বপ্ন ও বাস্তবতার কথা; বলাই ও

সুধীরের চাওয়া পাওয়া ভেতর দিয়ে সে কথাই তুলে ধরেছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'তিমির লগন'-এ দেখতে পাই চরিত্রদের উচ্চবিত্তদের জগতকে জানার চেষ্টা; নিশীথ, বাসবী, রজত ও মালতীর মধ্য দিয়ে তিনি সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রায় একই রকম বিষয় দেখতে পাই 'বায়স্কোপের বাক্স' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলা শেলী মাসির নিজস্ব ভাষার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় চেনা পথ থেকে অচেনাতে চলার কথা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। লেখিকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবলম্বনে এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি গড়ে তুলেছেন। আমরা জানি ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে দেশি ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে মুণ্ডারা বিক্ষোভ শুরু করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে; ভাতের স্বপ্ন তাদের আরও বেশি আলোড়িত করে। বীরসা মুণ্ডা যখন এই বিক্ষোভে যুক্ত হয়; তখন এই বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নেয়। বীরসাকে জেলখানায় পরিকল্পিত ভাবে মেরে ফেলা হয়।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ইতিহাসের একটি বিশেষ লগ্নকে নিয়ে এবং সেই লগ্নের নায়ক বীরসা। এই উপন্যাসের অন্যতম অংশ উপসংহার; বিষয়ের প্রাচুর্য এবং বিস্তার এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে নায়ক চরিত্রটিকে অনেকেই আদর্শায়িত মনে করেছেন। আমাদের সমাজ রাষ্ট্রের যখন ভাঙন ধরেছে, তখন লেখিকা নিজেকেও ভাঙছেন। ষাটের দশকে শাসকদলের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র দেশবাসীর মনে। বিকল্প আর্থ-সামাজিক ভাবনায় ভাবিত হয়েছে মানুষ।

পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা ও নির্মাণ রীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, জীবিকা সংস্থানের সমস্যা, ছিন্নমূল মানুষদের জীবন-জীবিকা—এই সব নিয়ে অনিশ্চিত জীবন। এই জীবনকথাই নিজ অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের দ্বারা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্যের পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুন্দর বন, জল-জঙ্গল, নিম্নবর্গীয় সমাজের নিত্য সংগ্রামের চিত্রকথা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'নদীর

সঙ্গে দেখা' (১৯৮০), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালী' (১৯৮১), 'বাগদা' (১৯৮৯) ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে সুন্দরবন, বাদা অঞ্চল, জল কর, আলাখেরি, নদীকেন্দ্রিক গ্রাম বাংলার জীবনচিত্র।

'বনবিবির উপাখ্যান' উপন্যাসের কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায় বন কেটে বসত করা, অনন্ত জলরাশির মাঝে মানুষের বসবাস এবং তাদের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সংস্কার, ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের কথা। উপন্যাসের কেন্দ্র ভূমি হল চৌধুরীদের আবাদ অর্থাৎ জলরাশি বেষ্টিত একটি দ্বীপ। এর পাশাপাশি রয়েছে ঘোষ বনের কাহিনী। এই দ্বীপের মানুষদের জীবনে ভয় আছে, মৃত্যু আছে, আছে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। হঠাৎ একদিন এই দ্বীপের ভেড়িতে আটকে থাকা একটি নৌকায় বসন্ত রোগাক্রান্ত একজন কিশোরীকে লোকজন দেখতে পায়। কিশোরীকে দেখেই সেখানকার মানুষজন দু-ভাগ হয়ে যায়—একদল তাকে সুস্থ করে তুলতে সেবা-পরিচর্যা করে, অপরপক্ষ কোনো ছলনাময়ী অপদেবীর আগমন ঘটেছে বলে মনে করে। এই পক্ষই মনে করে বন কাটবার আগে বনবিবির পুজো না হওয়ায় অমঙ্গল হয়েছে। এই উপন্যাসে লৌকিক-অলৌকিকের সীমানা একাকার হয়ে গেছে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বনবিবির পুজোর সাথে সাথে গান, নাচ, সারেঙ্গী বাজনা নিয়ে রজনী, বিশু, মকবুল, জগন্নাথ, প্রাণকেষ্ট, দীননাথ আনন্দে মত্ত। আবার এরই মাঝে দয়াল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দর্শন করেছে বলে মনে করে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যাসী বাওয়ালী' উপন্যাসের বিষয় হয়েছে বাঘ শিকারের কথা; এখানে কোনো জটিল জীবনভাবনা নেই। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে সুন্দরবনের বাঘের জীবন কথা, মধু সংগ্রহকারী সমাজের কথা অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবন-সংগ্রামের কথা। উপন্যাসের কথক সন্ন্যাসীচরণ বাওয়ালী, সদাশিব বাওয়ালীর পুত্র। তারা মূলত বাঘ শিকারি। লেখক এই উপন্যাসের মধ্যদিয়ে সুন্দরবনের সমাজ, বাঘের মনস্তত্ত্ব, সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কথক নিজের হাতে ন-বার বাঘ মেরেছে, অনেকবার বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকেছে। তার বাবাও ছিল বাঘ শিকারি। এভাবেই বাঘ শিকারের কাহিনী অগ্রসর হলেও একটি বাঘের আক্রমণে সন্ন্যাসীর হাত

দুর্বল হয়ে যায়। সন্ন্যাসী জঙ্গলের হাতছানি, বাঘের ইশারা, আকাশের চাঁদ, নদীর স্রোত, কান্না ও ব্যথা নিয়ে জীবন প্রবাহে এগিয়ে চলে।

সুন্দরবনের ভেড়ি অঞ্চলের জীবনধারা ও অর্থনীতির কথা তুলে ধরেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তার 'বাগদা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে বাগদা চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে। বিনোদ, শিবু, বিষ্টু সহ অনেকেই রাতে জলকর পাহারা দেয় এবং ভোর হলেই তাদের বাজারে পৌঁছানোর তৎপরতা থাকে। এখানে লঞ্চ ঘটায় একদল দেহ পসারিণী জায়গা করে নিয়েছে। অর্থাৎ এই উপন্যাসে লেখক ভেড়ি অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনগাথা তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে ভেড়ি অঞ্চলের দাঙ্গা, ডাকাতি, রাজনীতি, চিংড়ি চাষের পদ্ধতি, কাঁটাতার, দেহ ব্যবসায় যুক্ত মেয়েরা, ব্যক্তি ও শ্রেণি সম্পর্ক; অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জীবন বাস্তবতার চরম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে 'বাগদা' উপন্যাস।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীর সঙ্গে দেখা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে শিবনাথ চরিত্রের জীবন অভিজ্ঞতা লাভের কথা। সে মেদিনীপুরের চন্দনতলা থেকে গাইগাছার পাশের গ্রাম গোশিঙায় কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে সে গাইগাছায় বৃদ্ধ মধুবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়; সেখানে ঝড় বাদলের রাতে মধুবাবুর স্ত্রী ফুল্লরার আকর্ষণে এবং অপ্রতিরোধ্য দেহের তাগিদে তারা আত্মসমর্পণ করে। মধুবাবুর বাড়ির পাশে ধু ধু মাঠ, তারপর নদী এবং জঙ্গল। হঠাৎ করে তারা দেখতে পায় নদী প্রকাণ্ড ফেনা নিয়ে এগিয়ে আসছে, সাথে সাথে মানুষের চিৎকার, কান্না, আতঙ্ক। এই জল বাড়তে শুরু করলেই ভেসে যাবে তাদের গ্রাম। এবং শেষে শিবনাথের ঘরে ফেরার অগ্রসর হবার মধ্য দিয়ে উপন্যাস পরিণতি পেয়েছে।

এই সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি ছাড়াও বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নগর জীবন নিয়ে কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। যদিও এই উপন্যাসগুলি তাঁর যথার্থ অভিজ্ঞতার ফসল নয় তবুও উপেক্ষা করা যায় না। এইসব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ভাবনার বিশেষ বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। এই ধারার উপন্যাসগুলি হল—'কলকাতা কলকাতা' (১৯৭৬), 'অসতী' (১৯৮০), 'ঘাতক' (১৯৮২), 'ফাঁদ' (১৯৯১) ইত্যাদি।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কলকাতা কলকাতা’ নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গোপাল; তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। গতিশীল কলকাতার জীবনে এসে গোপাল স্ট্যাচু হয়ে যায়। পারিবারিক দায়বদ্ধতা, দায়িত্ব তার স্বাধীন জীবনের স্বপ্নময় গতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। গোপাল জীবনের অসংলগ্নতাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না; আবার ফিরেও আসতে পারে না সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। কলকাতা আর গোপাল যেন পরস্পর বিরোধী।

তাঁর একটি অন্যতম উপন্যাস হল ‘অসতী’। এই উপন্যাসের কাহিনীর উৎসস্থল দুলালের চায়ের দোকান। দুলাল বাধ্য হয়ে পুলিশের ইনফরমার হয়। খবর সংগ্রহ করার জন্য দুলাল জগদীশের ঘনিষ্ঠ হয় কিন্তু কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারে না। অপরদিকে জগদীশ খুন হয়। এই ঘটনার জন্য সিনেমা থেকে ফেরার পথে দুলালের স্ত্রী আরতির সামনেই কিডন্যাপ হয়। এক নির্জন ডেরায় নিয়ে গিয়ে জগদীশের লোকেরা জেরা করতে থাকে; পুলিশের ইনফরমার অভিযোগে সে মার খায়। স্বামীকে বাঁচাতে আরতি পিছন পিছন যায় এবং নিজেকে জামিন রেখে স্বামীকে মুক্ত করে এই শর্তে যে সে তিনদিন তাদের সাথে থাকবে। এই সময়কালে দুলাল স্ত্রীকে বাঁচাতে পুলিশের সাহায্য নেয়নি। তিনদিন বাদে ফিরে এসে আরতি স্বামীর কাপুরুষতা, আত্মগ্লানি এবং সর্বোপরি নির্যাতন ও অত্যাচারে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। এখানেই ঔপন্যাসিক আরতির মানসিক স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন ঘটিয়েছেন।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম উপন্যাস হল ‘ঘাতক’। এই উপন্যাসে রেবতীর স্ত্রী সুলতার আত্মহত্যার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর বিন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন সুলতা-রেবতীর প্রণয়, বিবাহ, সুলতার অসুস্থতা ও চিকিৎসা, কাজের মেয়ের স্বভাব ও কাজকর্ম এবং শেষে সুলতার আত্মহননের কথা। সুলতার দাদা, রেবতীর বন্ধু নিখিল সন্দেহবশত সুলতার হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়। শেষপর্যন্ত জায়ার মিথ্যা সাক্ষ্য ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট রেবতীর বিপক্ষে চলে যাওয়ায় তার ফাঁসির আদেশ হয়—এখানেই উপন্যাস শেষ হয়েছে।

তাঁর ‘ফাঁদ’ উপন্যাসে চমৎকারভাবে পরিবেশিত হয়েছে ছাপাখানার কর্মচারীদের সঙ্গে মালিকের বিরোধের পরিণতিতে ছায়া নামে এক প্রেস কর্মীকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়। ছাপাখানার অন্ধকারে সামান্য বেতনের বিনিময়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারা বিভিন্ন শ্রেণির

চাপে জীবন অতিবাহিত করে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন সাধারণ কর্মচারীদের স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের ইতিহাসকে; দেখিয়েছেন মালিকের অনৈতিকতা ও নীতি বিরুদ্ধতাকে। এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন যে মালিক কেবল ফাঁদ পাতে না, ফাঁদ পাতে সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, লম্পট স্বামী অর্থলোভে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করার জন্য ফাঁদ পাতে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমসাময়িক আরও একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হলেন মতি নন্দী। 'বেহুলার ভেলা' (১৯৫৮) উপন্যাস নিয়ে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পেশায় ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়ায় তার সাহিত্যে ক্রীড়া জগতের বিচিত্র আখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—'স্ট্রাইকার' (১৯৭২), 'স্টপার' (১৯৭৪), 'কোনি' (১৯৭৫), 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর' (১৯৮০), 'অপরাজিতা' (১৯৮০), 'সাদা ঘাম' (১৯৯০), 'মালবিকা' (১৯৯১) ইত্যাদি।

মতি নন্দী মানুষের জীবনের একাকীত্বের যন্ত্রণা ও অতীত জীবনের বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছেন 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৯) উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি প্রথমে 'ধুলোবালির মাটি' নামে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। গলিকেন্দ্রিক জীবন, স্বল্প পরিসরে অনেক মানুষের জীবন এবং তাদের সংকীর্ণতা, ভাঙন এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। প্রায় একইরকম বিষয় তথা মধ্যবিত্ত জীবনকথা উঠে এসেছে তাঁর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯) উপন্যাসে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে দেখানো হয়েছে গ্রামের ছোট্ট গলিতে সিনেমার নায়কের আগমনে মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে খণ্ড কাহিনী হিসেবে কয়েকটি পরিবার, কয়েকটি চরিত্র এবং কয়েকটি প্রশ্ন।

উপন্যাসে কিছু পারিবারিক বিখণ্ডায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নায়কের গাড়ি রাখা নিয়ে ঝগড়া, খেলার বল নিয়ে ঝগড়া, টিউবওয়েল বসানো নিয়ে ঝগড়া, মেয়েদের শরীর দেখা এবং তা নিয়ে বচসা অর্থাৎ ক্লেদাক্ত জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরুণ

মুখোপাধ্যায়ের মতে—“আধুনিক জীবনের ট্রাজেডি লুপ্তপ্রায় মানবিক মূল্যবোধের পুন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস ক্রিয়াশীল।”[৬]

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘স্ট্রাইকার’ অন্যতম। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে প্রসূন শিল্ড ফাইনালে চান্স পেয়ে গোল দেয়; এইভাবে সে পিতৃ অপমানের শোধ নেয় ও দলকে জয়ী করে। তাকে কেন্দ্র করে লেখক দেখিয়েছেন মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, ফুটবলারদের জীবন কথা। অপরদিকে ‘স্টপার’ উপন্যাসে মতি নন্দী দেখিয়েছেন কমল গুহ তার যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে চাইলেও তার ছেলে ফুটবল এবং ফুটবল প্রেমী বাবাকে ঘৃণা করতে থাকে। ঘটনা পরম্পরায় উঠে আসে উত্তেজনা, তার পাশে মানুষ এবং ভাগ্যের সংঘাত। অর্থাৎ লেখক বলতে চেয়েছেন মানুষ-মানসিকভাবে হারতে পারে কিন্তু তাকে ধ্বংস করে ফেলা যায় না। তাই খেলাধুলা শুধু শারীরিক বিষয় নয়; মানসিক ব্যাপারও বটে। উপন্যাসে আরও দেখা যায় খেলোয়াড়দের জীবন প্রসূত অভিজ্ঞতার কথা, তারা জীবনের সেরা সময় পরিশ্রম করে, পড়াশুনা অবহেলা করে খেললেও দলের সাহায্য তেমনভাবে পায় না। যতদিন মাঠে থাকে খেলোয়াড় ততদিনই মনে রাখা এই মানসিকতার কথাই লেখক তুলে ধরেছেন।

‘কোনি’ উপন্যাসেও মতি নন্দী খেলোয়াড়ের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি উঠে এসেছে ক্লাবগুলির ক্ষমতার লড়াই, গোপন হিংস্রতার কথা। কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনির গড়ে ওঠা অর্থাৎ তার ছোট্ট বেলা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ—এই দীর্ঘ যাত্রাপথ উপন্যাসে আছে। অনেক অসম্ভবকে যে সম্ভব করে তোলা যায় তা মতি নন্দী একাধিকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি উঠে এসেছে মেয়েদের পারস্পরিক হিংসা, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতির কথা। ‘ফেরারি’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে খেলাধুলার প্রসঙ্গ। উপন্যাসটির শুরুতে দেখা যায় মাঠে প্রিয় দল জিততে না পারায় সমর্থকদের গণ্ডগোল, পায়ে চাপে পিষে মারা যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা উঠে এসেছে। মতি নন্দী প্রায় একই বিষয়কে দেখিয়েছেন ‘দলবদলের আগে’ উপন্যাসেও; এখানে আছে খেলোয়াড়দের দলবল, টাকা নিয়ে ঝগড়া, ব্যবসায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এদের থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা। মতি নন্দীর কথা সাহিত্য সম্পর্কে ক্রীড়া

সমালোচক লীলা মজুমদারের সাথে আমরাও একমত—‘‘বাংলা শিশু সাহিত্যই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেই মতি নন্দীর একজনও জুড়ি দেখলাম না। গল্পের বিষয়বস্তু শুধু খেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলোয়াড় জীবন, খেলার পরিবেশ আর স্বাভাবিকভাবেই সব খেলাকে ঘিরে বিশাল দর্শক সমাজ তার ভাইতেও বড়ো কথা এ হল মনুষ্যত্বের কাহিনি।’’[৭]

পঞ্চাশের দশকে যে সব কথাসাহিত্যিকরা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন কবিতা সিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কয়েক দশক ধরে গল্প, উপন্যাস, কবিতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রতিভা ও শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ফুটে উঠেছে তাঁর কথাসাহিত্য জগত। যদিও সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—‘সলিল সীতা’ (১৯৫৪), ‘সোনা রূপার কাঠি’ (১৯৫৬), ‘পাপপুণ্য পেরিয়ে’ (১৯৬৪), ‘চারজন রাগী যুবতী’ (১৯৭৩), ‘পৌরুষ’ (১৯৮৪) ইত্যাদি।

সমালোচকদের মতে কবিতা সিংহের বিখ্যাত উপন্যাস হল ‘চারজন রাগী যুবতী’। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। রাগ বিষয়টা যে শুধু ছেলেদের একচেটিয়া নয়; অবলা মেয়েরাও রাগতে জানে তার কথা উপন্যাসে আছে। এছাড়াও উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন সেই সময়কার নকশাল আন্দোলনে কলকাতার মনসিক অবস্থা ও মধ্যবিত্ত পরিবারে তার উপর প্রভাবের কথা। উপন্যাসের নায়িকা চুনির তিন সঙ্গিনী সুমনা, বুলান ও রেণু; সুমনা বাদে সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। চুনির মা আবেগের বশে একজন মিস্ত্রির হাত ধরে গৃহ ত্যাগ করে। তার বাবা ঘরে তোলে গোলাপবালা নামী মহিলাকে। এই নতুন মা তার সাথে খারাপ ব্যবহার না করলেও চুনি নিজের করে ভাবতে পারে না। বুলার, রেণু গরীব ঘরের মেয়ে, তাদের দিদি হাসি চাকরি করে সংসার চালায় অথচ তাকে কোনো পাত্রপক্ষ পছন্দ করে না। সুমন সচ্ছল ঘরের মেয়ে হলেও তার মনে দুঃখ আছে কারণ তার বাবা-মা-র মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একদিন চারজন ঘুরতে বেরিয়েছে, দিনটিই চুনির চিন্তা স্রোতের মাধ্যমে অতীতের স্মৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটে উঠেছে।

কবিতা সিংহ-এর ‘পতনের বিরুদ্ধে’ উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, তবে এখানে রাজনীতি, সমাজনীতির কথা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের রাজনীতির

ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক রবির মনে পড়েছে ছেলেবেলার শিক্ষক অশনিবাবুকে, যিনি পরাধীনতার জ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। রবির পিতাও আগস্ট আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল অর্থাৎ তার পরিবার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী। রবির সমসাময়িক প্রজন্মের চোখে স্বাধীনতার তেমন মূল্য নেই। কারণ তাদের মনে হয়েছে স্বাধীন ভারত এক দারিদ্র্য ও দুর্নীতিতে ভরা।

তাঁর 'একটি খারাপ মেয়ের গল্প' উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে পাপপুণ্যের কথা। নায়ক মধ্যবিত্ত সূর্যের জীবনে দুজন নারী—প্রেমিকা রুমা ধুনী এবং পরবর্তীতে অলকা। সূর্যকে ভুলে রুমা কমলের দিকে মন দিলে তার জীবনে এসেছে অলকা অর্থাৎ লেখিকা একজনের প্রস্থানের সাথে সাথে আর একজনের প্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কবিতা সংহের 'পৌরুষ' উপন্যাসটি ভিন্নধর্মী। দেশ আধুনিক প্রযুক্তির দিকে এগোলেও সামাজিক-মানসিক দিক দিয়ে অনেকেই মধ্যযুগীয় প্রথায় পা দিয়ে চলে। হিজড়াদের অস্তিত্ব—নারী না পুরুষ; তারা যে বিধৃত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় তার জন্য প্রকৃতি দায়ী বলে লেখিকার মনে হয়েছে। পাশাপাশি সমাজকেও দায়ী করেছেন। এর সাথে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষদের কাহিনীও যুক্ত করেছেন। এই দুটি প্লটই সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে।

'পাপ পুণ্য পেরিয়ে' উপন্যাসে তিনি বিশেষ রূপে তুলে ধরেছেন পাপ বোধের কথা। কয়েকজন চক্রান্তকারী নায়ককে বুঝিয়েছে তার মৃত্যু আসন্ন এবং প্রেমিকাই তার পক্ষে অশুভ শক্তি হয়ে দেখা দেবে। কাহিনীতেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আর পাপবোধের বিচিত্র পরিণতির জট উন্মোচন করা হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা ঘরে বাইরে অস্তিত্বের জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।

আনন্দ বাগচী পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিশালী কথাকার। তিনি একইসাথে কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিক যান্ত্রিক সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসে। তাঁর রচনা শৈলীও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দেশভাগ মানুষের জীবনে চরম সংকট এনে দিয়েছে; এই সংকটে লেখক বিধ্বস্ত হয়েছেন। আনন্দ বাগচীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি

হল–'চক খড়ি' (১৯৫৭), 'বিকালের রঙ' (১৯৫৯), 'রাতের বাসা' (১৯৫৯), 'যাদু ঘর' (১৯৬৩), 'পরমায়ু' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চক খড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি শৈশবে কলকাতা দেখেছেন, প্রচুর ভালোবাসা আর অন্তরঙ্গ জীবনের স্বাদের কথাই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অনেকের কাছে কলকাতা বিপ্লবের উপযুক্ত পটভূমি, কারও কাছে আমোদ প্রমোদ বা কাম ও ভোগের জায়গা। সময় পাল্টে যায়; মহানগরের রাণী বালারা মাটির ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসে। তাদের কলকাতার জমিদারেরা, ধনবানরা আহ্লাদে কুঠিবাড়িতে তুলে আনে। লেখক এই পাল্টে যাওয়া সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে।

তাঁর 'ছায়ার পাখি' উপন্যাসটিও নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবী রেখেছে। এই উপন্যাসে ভুল চিকিৎসা এবং তার পরিণামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ডা. নন্দী একটি গ্রামে ডাক্তারি করতে আসেন। তিনি বড়ো হাসপাতালের প্রফেসর এবং বিলিতি ডিগ্রি রয়েছে। লোকে তাকে ধন্বন্তরি বলে মনে করে। তিনিই একবার ভুল করে রোগীকে গলব্লাডারে সার্জারি করার পরামর্শ দেন অথচ একজন জুনিয়র ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও অতীন রোগীর বুক পরীক্ষা করে জানায় গলব্লাডার অপারেশন করার কোনো দরকার নেই কারণ রোগীর নিউমোনিয়া হয়েছে।

আনন্দ বাগচীর একটি অসামান্য উপন্যাস হল 'ফেরা না ফেরা'। এই উপন্যাসে তিনি মানুষের জীবনের নানা ঘোরপ্যাঁচের কথা তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবন পথ অনেক বড়ো, ঘুরপাক খেতে খেতে চলতে হয় আগাম কোনো লক্ষ ছাড়াই। প্রত্যেকেই চলতে চলতে একদিন গিয়ে বুঝতে পারে মানুষের ভালোবাসার কথা, নানা সম্পর্কের কথা, আশা-নিরাশার কথা, ব্যথা-বেদনার কথা; এই সম্পর্কগুলি গড়তে গড়তে মানুষের জীবনটাই ক্ষয়ে যায়। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র তপতী ও ধূর্জটি ত্যাগে, আত্মদানে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিজেদের জীবনের মানেটাই হারিয়ে ফেলেছে। এই রহস্যময় সত্যকথা অবশ্যই লেখকের নিজস্ব অনুভবের থেকে উঠে এসেছে।

'বিকালের রঙ' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে শোভন-বিনীতার বেদনাময় কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির কথা। লেখক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন এক বয়সে যা সম্ভব, আরেক বয়সে তা সম্ভব নয়; এইভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষার পালাবদল উঠে এসেছে। মনস্তত্ত্বের অভিঘাতে বিপন্ন

ঘর সংসার হারিয়েও বিনীতা সংস্কারের দেওয়াল ধরে বাঁচতে চেয়েছে। এই ঘটনাগুলি বানানো বলে ঔপন্যাসিকের প্রতি তথা উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এখানে উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"আসলে উপন্যাস লেখক জীবনকে দেখেন, জীবনের বিচত্র স্বাদ পেয়ে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হন এবং সেই বিস্ময়ের উদ্বোধনকে অনিবার্য ভাবেই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করতে চান গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই পরিবেশনায় ঔপন্যাসিকের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেলে তবেই তার তৃপ্তি। জীবনই হল সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউই বোধহয় অতটা জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন।"[৮]

সিরাজের সমসাময়িক একজন উল্লেখযোগ্য কথাকার হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়; তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের খুলনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা করা। তিনি 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল–'বৃহন্নলা' (১৯৬১), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২), 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'পর স্ত্রী' (১৯৭১), 'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২), 'নির্বান্ধব' (১৯৭২), 'ঈশ্বরী তলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'অগস্ত্য যাত্রা' (১৯৭৬), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭), 'সাহাজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস হল 'বৃহন্নলা'; পরবর্তীকালে উপন্যাসটির নামকরণ হয় 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক যুগের সংকটের সাথে সাথে নায়কের সংকটকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে রিক্ততাবোধ, অসহয়তাবোধ এবং শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কুবেরের বিষয় আশয়'। উপন্যাসটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক কুবের সাধুখাঁ বন্ধুর সঙ্গে বাইজি শেফালীর ঘরে গিয়ে অসুস্থ হয়। তার মনে হয়েছে পাপের জন্যই এই অসুখ। সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের এই পাপবোধের কথা জানিয়ে অনুশোচনা করেছে। উপন্যাসটি যখন রচিত হয় অর্থাৎ বিশ শতকের ষাটের দশকে মধ্যবিত্তদের তথা মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের অবস্থা

মোটেই ভালো ছিল না। এই বিষয়গুলি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসেও অনিল এবং তার স্ত্রী পুতুলের সাংসারিক জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস 'রূপোকথা'-তে উঠে এসেছে গ্রামীণ জীবনের কথা এবং এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বরীতলা গ্রামের মানুষজনের কথা, প্রকৃতি ও কীটপতঙ্গের সাথে অনাথবাবু ও তার পারিবারিক জীবনচিত্র। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই কমবেশি আত্মজৈবনিক উপাদান আছে বলে মনে করেন সমালোচকগণ। তবে আমাদের মনে হয়েছে তিনি বাস্তব ও কল্পনা মিলেমিশে উপন্যাসের জগতটি তৈরি করেছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই কখনো উপন্যাসে কুবের আবার কখনো অনাথ হিসেবে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে অথচ আঞ্চলিকতার সাথে এর কোনো যোগ নেই। তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও খুব সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাম। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। অসামান্য অনুভূতিশীলতায় ঔপন্যাসিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে সময়ের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই, দেশ বিভাগ ও তার কারণে নানা বিপর্যয়ের কথা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'আগামী' (১৯৫১), 'তৃতীয় ভুবন' (১৯৫৮), 'শোক মিছিল' (১৯৭৩), 'বিবাহবার্ষিকী' (১৯৭৬) ইত্যাদি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারো বছর বয়সে লিখেছেন 'আগামী' উপন্যাসটি। এখানে তিনি মানব জীবনের সমস্যার গভীরে আলো ফেলবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসে উঠে এসেছে দাঙ্গাবাজ মানুষের কথা, স্বার্থান্ধ শক্তির কথা; যারা প্রচার কৌশলের সাহায্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। ছাত্র জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি তুলে ধরেছেন 'তৃতীয় ভূবন' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এখানে 'জয়তী' নামক একজন তরুণী মেয়ের সাথে আসাদ নামে এক মুসলমান যুবকের সাথে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্যতাকে সঙ্গে নিয়ে জয়তী সকালের স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নিয়েছে এবং সে দুপুরবেলা যায় তার নিজের

কলেজে। এখানে তার প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠলে জয়তী বাবা-মা, বড়ো বোনের অসম্মতিতে অসবর্ণ বিবাহ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

'শোক মিছিল' উপন্যাসে আছে মানব জীবনের বিকারগ্রস্তের কথা। সাম্যবাদী বিনয় ভূষণ এবং পারুলের চোখের সামনে পার্টি দু-টুকরো হয়ে যায়, অনেকেই শহীদ হয়। বিনয়ের সাথে তার পুত্র অজয়ের চলে রাজনৈতিক বিতর্ক। উপন্যাসে এই সংঘাতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'বিবাহবার্ষিকী'-তে উঠে এসেছে মণি মোহনের বেদনার কথা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র জীবন থেকে মার্কসীয় সমাজ দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর দরদ, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন বন্ধু বৎসল। যে মধ্যবিত্ত জীবন তাঁর চারপাশে প্রবাহিত ছিল সেই সংগ্রামময় জীবনের ভাঙাচোরা, অস্তিত্বের সংগ্রামকে উপন্যাসগুলিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে বিশ্ববীক্ষা, জীবনবোধ, ইতিহাস চেতনা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল সংলাপ রচনার নতুনত্ব—চরিত্রের শ্রেণিগত, শিক্ষাগত, পরিবেশগত অবস্থানের কথা মনে রেখে তিনি সংলাপ রচনা করেছেন। এগুলির জন্যই তাঁর রচিত সাহিত্যের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। আবহমান সময়ের স্রোতে নতুন নতুন কালের প্রয়োজন উপলব্ধিতেই মানুষের আসা-যাওয়া; জীবন থাকলে কথকতা থাকবে এবং কথকতা থাকলে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। এবার, আমরা উপরিউক্ত ঔপন্যাসিকদের রচনার সাথে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যের বিশেষত ঔপন্যাসিক সত্ত্বার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

নাগরিক মননের আলোকে গ্রাম ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্য বার বার মায়া বাস্তবতার রূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে সিরাজের রচনাগুলিতে। 'জানমারি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ', 'অমৃত প্রেমকথা', 'গোপন নির্জনে', 'নিলয় না জানি' ইত্যাদি তারই সাক্ষ্য বহন করে। গ্রাম জীবনের কোনো পারিবারিক গল্প নয়; যা চিরকালীন জীবনের গূঢ় কথন ও প্রকৃতিতে মানুষের চূড়ান্ত অসহয়তার দলিল। অদিপাউস, মার্কস, ডারউইন, ফ্রয়েড, জাং, জোলা, লুসুন, পাভলভ—সবাই একাকার হয়েছেন সিরাজের সাহিত্যে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যকর্মের এটাই বড়ো দিক।

তিনি একে একে তুলে ধরেছেন চলমান স্রোতে দুঃখ-বিচ্ছেদ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, পিতৃত্ব, মাতৃত্বের স্নেহবৎসলতা, নৈতিকতার টানে অন্যের সন্তানকে আপন করা, উপেক্ষা-প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধের বাসনা, উদ্দাম যৌবনের ঝড়ে টালমাটাল, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অবিরাম আসক্তির কথা। একইভাবে উঠে এসেছে মিথ, আখ্যান, প্রবাদ-প্রবচন ও লোকজ সংস্কৃতির ধারা। সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, উভচর, পাখপাখালি, যৌনাসক্তি, প্রজনন প্রবাহ মানুষের মননে জাগিয়ে তোলে কামজ আবেদন। 'দেহমনের স্বাদ' আস্বাদনে 'স্বামী ও প্রেমিক'-এর দ্বন্দ্ব, 'বাদশা'-র বাদশাহি মেজাজ, 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত'-এ ফালতুর জন্ম বৃত্তান্ত এমনই করেই তিনি ভালোবাসায় মুখরিত পরস্পর নির্ভরতার সম্পৃক্ত জীবন কথা তুলে এনেছেন। 'ফৌজী জুতো' গল্পে বাবুরাম সাহানী খৈনির ব্যবসায় ডুবে জীবনের মানেটাই বুঝতে পারেনি। অর্থাৎ প্রকৃতির আদিমতম চাওয়া-পাওয়ার মায়াবী চরাচরে মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা-প্রতিশোধ, নৈরাজ্য-নির্লিপ্ততার সার্থক কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

সুফিতত্ত্ব ও বাউল জীবন দর্শনে সচেতন বাংলা কথাসাহিত্যের অমর কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখলেন 'নিশিলতা', 'অমর্ত্য প্রেমকথা', 'উত্তর জাহ্নবী', 'তৃণভূমি', 'গোপনে নির্জনে', 'হিজল কন্যা', 'কিংবদন্তির নায়ক', 'মায়ামৃদঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'বাগাল', 'সূর্যমুখী', 'গাছটা বলেছিল', 'ভারতবর্ষ', 'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে', 'বুঢ়া পিরের দরগাতলায়', 'সরাইখানা', 'বাদশা', 'সাক্ষীবট', 'গোঘ্ন', 'স্বামী ও প্রেমিক', 'ডালিম গাছের জিনটি', 'গাজনতলা', 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি কালজয়ী ছোটগল্প। এক সময় পাঠককুলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড', 'টোপ', সমরেশ বসুর 'আদাব', 'কিমলিশ' ইত্যাদি। বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তারই ধারক ও বাহক হয়ে উদার উন্মুক্ত আকাশ, ধু ধু মাঠ, রাখাল বালকের বাঁশি, পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী, জঙ্গল-গাছপালা, ঝোপঝাড়, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন কথাসাহিত্য। তাঁর লেখার পটভূমিতে উঠে এসেছে বহরমপুর, লালবাগ, ভগবান গোলা, কৃষ্ণপুর, লালগোলা,

ব্রহ্মপুর, হরিণমারা, গঙ্গা-পদ্মা-দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী, জলঙ্গি নদী অববাহিকা তথা রাঢ় বাংলার জনজীবন কথা। আমরা 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে জানতে পেরেছি রাঢ় বাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতের কথা। উপন্যাসটিতে ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালের কোলাজ, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তিতুমিরের বিদ্রোহ, বীরভূম-মুর্শিদাবাদের লোকজ সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছোটবেলায় ছিলেন অস্থির প্রকৃতির, বোহেমিয়ান স্বভাব তাকে পেয়ে বসে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, পঞ্চ ইন্দিয় ভেদ করে তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে আঘাত করেছে। মায়ামৃদঙ্গ তাকে অদৃশ্য টান দেয়। তিনি আত্মকথাতে লিখেছেন—"১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীণ মিথের সুপরিচিত জগতে। কাটতে থাকল দিনরাত্রি গাঁয়ে গঞ্জে হাটে বাজারে মেলায়-মেলায়। অজস্র মানুষ দেখলাম—বিচিত্র, বিস্ময়কর সব চরিত্র। মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগণা দুমকা ঘুরে বেড়াই আলকাপ দলে। আড়াই হাজার রাত—ষাট হাজার ঘণ্টা কেটে যায় সৌন্দর্য ও যন্ত্রণার মধ্যে। মেয়েদের হৃদয় ও মুখমণ্ডল বিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীরে কিংবদন্তির গ্রাম পরিরা কীভাবে অনুপ্রবেশ করে দেখেছি। আলকাপ দলের নাচিয়ে 'ছোকরার' প্রেমে পড়েছি। অচরিতার্থ কামনার জ্বলে মরেছি।"[৯]

'সিরাজ মাস্টার' নামে তিনি আলকাপ দলে পরিচিত ছিলেন। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ভাবনাকে সিরাজ আলকাপে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আলকাপের বিষয় নিয়েই 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে মায়া-বাস্তবতার এক ইন্দ্রজাল তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে তিনি 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিয়ে আউল-বাউল—পির-ফকির-দরবেশদের কথা নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে মদন চাঁদ ফকিরের গানগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তিনি গেয়েছেন—

"তিরপিনীর ঘাটেতে এক মড়া

ভাসতেছে।

মড়ার বুকে সর্পের ডিম্ব।

হরিণ চরতেছে। ...”[১০]

এর সাথে মিল চর্যাপদের কথার–

“তিন ন বছুপই হরিণা পিবই ন পানী।

হরিণা হরিণির নিলঅ ন জাণী।”[১১]

সিরাজ অভিজ্ঞতা দিয়ে আধুনিক মননের আলোকেই মদনচাঁদ, আবদুল্লা ফকিরের মুখ দিয়ে গুহ্যকথা শুনিয়েছেন। যাকে দার্শনিক ভাষায় বলা হয় Thing in itself বা পরম সত্য বা অবভাসতত্ত্ব; এর মধ্যে উঠে আসে Appearance এবং Reality, মদনচাঁদ প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক ও সুফি সাধক মনসুর হেল্লাজের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে–“মনসুর হেল্লাজ ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার প্রখ্যাত সুফি দার্শনিক ও সাধক। প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। পরে সাধুসন্ত হন।”[১২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কথাসাহিত্যের গতানুগতিক প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে একান্ত নিজস্ব ঘরানা প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতা-সংস্কৃতির উপরিতলের মায়ার ছলনায় প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃত গ্রাম ভারতবর্ষের শিকড়ের সন্ধান করেছেন। তাঁর আধুনিকতার আরও একটি অনবদ্য উপন্যাস ‘জানমারি’ (১৯৮৯)। গতানুগতিক ধারায় সম্পূর্ণ অচেনা গ্রাম বাংলার চিত্রকল্প ও রূপকল্প হল ‘জানমারি’ উপন্যাস। এখানে দেখানো হয়েছে সোনারু পাগল নয় অথচ লোকে তাকে পাগল ভেবে মারতে চায়, তাড়া করে। সোনারু চায় এই পৃথিবী থেকে সব রকমের জানমারি বন্ধ হোক; কেউ যেন কারও প্রাণ না নেয়। সেও আর উপলব্ধি করেছে কেউ যেন মাছও না ধরে, পাখি শিকারও না করে, পরবে কোরবানি না দিলে খুব ভালো হবে। এই সোনারু কারও কাছে অপদেবতা আবার মুসলমানদের কাছে ক্ষতিকর জিন। সোনারু ধর্মে মুসলমান হয়েও নিরামিষ ভোজন করে, দুর্গা পূজার সময় হিন্দু পাড়ায় নাচে। সিরাজ লিখেছেন–“তিনি মানুষতার সীমান্ত থেকে পলকে শাস্ত্রে সরে এসে বললেন, ‘মসজিদে আওরত লোকের পা দেওয়া

হারাম। তুই খবিস, বুঝিবি না...তুই বেশরা...ওরে শয়তান, তুই হিঁদু সাদুর মতন...শুনেছিলাম, হিঁদুর দুগ্গিচালির ছামুতেও নাচ নেচেছিলি!''[১৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতানিক'-কে আলকাপের জীবনকথা উঠে এসেছে; সেই হিসেবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' এই বিষয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস। আলকাপ জীবনের কথা অবিমিশ্রভাবে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এককথায় আলকাপ হল আমোদ-প্রমোদ মূলক নাটিকা। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে সোনা ওস্তাদ জাহান্নামের কথা ভেবেও সুবর্ণর হাত ছেড়ে দেয়নি। সুবর্ণর মেয়েদের মতো চুল, দু-হাতে চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা পরে, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফর্সা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ—নারী অথচ নারী নয়। আবার পুরুষ হয়েও পুরুষ নয়, নয় তৃতীয় লিঙ্গের। সে এক অমর্ত্য মায়া, সুবর্ণদের নিয়েই দেশে দেশে মৃদঙ্গ বাজে। ওস্তাদ, আলকাপের ঝাঁকসুকে কেন্দ্র করে আশা-নিরাশা, আলো-আঁধার, পাপ-পুণ্য, মায়া-বাস্তবতার অপূর্ব চিত্রণ ঘটেছে উপন্যাসে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মফস্বলীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে চিরন্তন মানুষের চাওয়া-পাওয়া, তাদের আপেক্ষিক সুখ-দুঃখ, অবচেতন মনের লিবিডোপ্রবাহ, প্রকৃতির কাছে মানুষের চিরকালীন অসহায়তা, লোককথা, তাদের মিথলজি—সব কিছুকেই তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যের পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বা তার বিপরীতমুখী বিষয়গুলিকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার পর্যন্ত কথাসাহিত্যের নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১১৮

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন : 'মানুষের ভূমিকা' (গল্প সমগ্র ১), করুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৩

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৪১

২০০১, পৃ. ১৩৫

৪. রায়, দেবেশ : 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২১

৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'দেবেশ রায়ের প্রতিবেদন-চতুষ্টয়', উপন্যাসের নতুন ধরণ; র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৩

৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩৪৫

৭. মজুমদার, লীলা : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৬-৯-১৯৯০

৮. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, ১ম প্রকাশ, ৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃ. ৩

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'আত্মকথা', সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩১

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'নিলয় না জানি', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৪৪১

১১. দাশ, নির্মল : চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩১

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নিলয় না জানি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৪৩৮

১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : জানমারি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

"সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলী অন্বেষণ"

সৃষ্টির একটি নির্দিষ্ট রূপ থাকে। সেই রূপ কল্পনা যখন লেখার মধ্য দিয়ে বিবৃত হয় তখন লেখার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে তার শৈলী। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসেরও একটি আঙ্গিক থাকবে, সেকথা বলাইবাহুল্য। আঙ্গিকহীন কোনো সাহিত্য রচিত হয় না। লেখকের লেখার মধ্যে একটি অবয়ব থাকতে বাধ্য। সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে থাকেন; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও তার ব্যতিক্রম নন।

নিঃসঙ্গতাকে সাথে নিয়ে বেড়ে ওঠা 'ইবলিশ' তথা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নিসর্গের প্রতি ছিল দুর্বার টান। সেই প্রকৃতির টানেই বারবার তিনি ফিরে এসেছেন নিজস্ব পরিচিত জগতে এবং সেখান থেকেই কিছু বিস্ময়কর ঘটনা আবিষ্কার করে পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন। আবার অনেক সময় দেখা গেছে তিনি সাধারণ ঘটনাকেও জীবন্তরূপ দিয়েছেন। সিরাজের সাহিত্যিক জীবনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে আলকাপ দল থেকে 'সিরাজ মাস্টার' হয়ে ফেরার পর। এখানে উল্লেখ করতেই হয় সহধর্মিণী হাসনে আরা সিরাজের কথা, তিনিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবে তাঁর রক্তেই রোপিত ছিল সাহিত্য সৃষ্টির বীজ। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরের সিরাজ মাস্টার। বিস্তৃত জীবন পরিসরে ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাগুলিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আর এই অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে। লোকজীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষত গ্রামীণ জীবনের কুসংস্কার-সংস্কার, কুটিলতা, মিথ, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি ঘুরে ফিরে এসেছে।

সিরাজের লেখনী শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—"আমি মরে যাব, কিন্তু সিরাজের সাহিত্য বহুদিন বেঁচে থাকবে।"[১] সিরাজের সাহিত্য কীর্তি এবং এই

কৃতিত্ব অর্জনের অন্যতম কারণ হল তাঁর সাহিত্য মাটির বুক থেকে উঠে এসেছে। সিরাজের সাহিত্য শুধু বাংলা ভাষাভাষী পাঠককে মুগ্ধ করেছে এমন নয়, প্রায় এগারোটি ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে সারা ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে, অখণ্ড বাঙালি জীবনের রূপ চিত্রাঙ্কনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিল্প সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন যে কজনমাত্র ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। গ্রাম ও শহর জীবনের বহুমাত্রিক জীবনচর্যা, প্রান্তিক মানুষদের সংস্কৃতি, লোক-ঐতিহ্যের সাবলীল ও লক্ষভেদী ব্যবহার—সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের থেকে তাকে আলাদা করেছে। বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা সিরাজের উপন্যাসের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো—

১. সমাজের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিকে শিল্প সম্মত রূপদান করেছেন। যেমন—‘বাসস্থান’, ‘তখন কুয়াশা ছিল’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘নিশিলতা’ ইত্যাদি।

২. সিরাজের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর জীবনদর্শন তথা তাঁর আত্মজীবনের নানা উপাদান পাই। সেই অর্থে তাঁর রচিত কিছু উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক। এখানে দেখা যায় তিনি স্থানিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহৎ জীবনে প্রবেশ করেছেন। যেমন—‘অলীক মানুষ’, ‘তৃণভূমি’, ‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’ ইত্যাদি।

৩. তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাই আদিম প্রবৃত্তির কথা অর্থাৎ কামনা জাত প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ জীবনের কথা। তিনি উপন্যাসের পাতায় পাতায় প্রবৃত্তি বিক্ষোভ ভেসে যাওয়া বিপর্যস্ত মানুষের অবস্থা এবং তাকে সংযমে বেঁধে নতুন জীবনে এগিয়ে যাওয়ার কথা শিল্প সম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন—‘প্রেম-ঘৃণা-দাহ’, ‘বিভ্রান্ত’, ‘নদীর মতন’, ‘অরূপ রতন’, ‘গোপনে নির্জনে’ ইত্যাদি।

৪. সিরাজ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তির রূপকে কাল ও যুগকে তুলে ধরেছেন। এইভাবে সাহিত্যে মিথ, রাজনীতি, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, ব্রাত্যজীবন কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষের মানসিকতার পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব উঠে

এসেছে তাঁর উপন্যাসে। যেমন—'অলীক মানুষ', 'রেশমির আত্মচরিত', 'নীল ঘোড়া', 'বেদবতী', 'উত্তর জাহ্নবী' ইত্যাদি।

৫. গোষ্ঠী জীবনের রূপ চিত্রাঙ্কনে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন সিরাজ। তাঁর রচিত উপন্যাসে সুফি, বাউল তত্ত্বের মধ্য দিয়ে সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। অনেক সময় সমাজ স্তরের নীচের তলায় অবস্থান করা মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন—'জানমারি', 'অলীক মানুষ', 'নিলয় না জানি', 'জনপদ জনপথ', 'বিভ্রান্ত' ইত্যাদি।

সিরাজের উপন্যাসে প্রোথিত উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এবং উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর রচিত উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলী সন্ধানের চেষ্টা করবো। একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্বের কথাসাহিত্যিকেরা নিজস্ব রচনা রীতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ করে থাকেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যই ঔপন্যাসিকের নিজস্ব শৈলী; এখানেই ঔপন্যাসিকের অমরত্ব নির্ভর করে।

সমাজের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত চরিত্রের আত্মসমীক্ষা, বিষণ্ণতা এবং নানা রহস্যময় মুহূর্ত ফুটে উঠেছে সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীন হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে; যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে আছে আদিম অন্ধকার। এখানে সেইসব চরিত্রেরই দেখা পাই যারা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে চেয়েছে জীবনের স্বাধীন ভূমিতে। এই উপন্যাস স্বাধীনতা অভিলাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার উপাখ্যান। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এইভাবে—"রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়ড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচ্যাঁয়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডঠো ভয় পেয়েছে।"[২]

'বাসস্থান' উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে শরীরী অনুষঙ্গ, "মাগীরা এতকাল চোখঠার, একঝিলিক হাসি, দদুল্যমান বক্ষ এবং পশ্চাদ্দেশ দেখিয়েই কতো মন লাক্ষ্য ছিঁড়েছে বলা নয়।"[৩] কিংবা দিয়ড়িরা যখন নবাবগঞ্জের বাজারে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে তখন "ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টিজনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের

ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন তৃষ্ণার দিনে নিটোল তুরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।"[৪] এখানে প্রতীকের ব্যবহার আলোড়িত করে আমাদের। মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন সিরাজ। তাদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিরাপত্তাহীন জীবনে জৈব তাড়নাই বড়ো কথা। সেখানে মনের টান সেভাবে নেই। তাই মামুনের অন্তর্বাস্তবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এক চরম সত্য—"ডুমুর তার বউ হবে কী! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্থ মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে। বড়ো জোর এটা শরীরিক কিছু ঘটানো যায় কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগানো কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।"[৫] এখানে চরিত্রের সামগ্রিক জীবনচর্যায় যৌনতার যে ভূমিকা স্পষ্ট, তাকে নিতান্ত অতীন্দ্রিয় মনে না করে কেউ যদি একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সামগ্রিকতায় বিন্যস্ত করতে চান, তাহলে তাকে কিন্তু হেয় করা চলে না।

'তখন কুয়াশা ছিল' ৮০-র দশকে 'বাসস্থান'-এর সমসাময়িক উপন্যাস। এখানে আছে এক সরল, লাজুক একটি ছেলের কথা; যাকে সকলে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতো। পরবর্তীকালে তাকে একটি মেয়ের দায়িত্ব দিলে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জেগে ওঠে পৌরুষ, শুরু হয় তার নয়া রাস্তার অন্বেষণ। এই উপন্যাসের সিরাজ যেন সার্চলাইট ফেলে নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের অন্ধকূপে নিমজ্জমান গ্রাম-বাংলার ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। অনুভূতি দিয়ে তিনি দেখেছেন, বিজ্ঞানের অন্তহীন সফলতার যুগে গ্রামের মানুষের কাছে নেই জাগতিক আলো। তারা নিরক্ষর, দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যায় হেমন্তের ঝরা পাতার মতো। সিরাজের কথায়—"দেখলাম জানালা-কপাটের ফাঁকে উঁকি দেওয়া মুখগুলো ক্রমশ বিবরে অদৃশ্য হচ্ছে। বারীনদার দোকানের সামনে গিয়ে রিকশটা থামলে গঞ্জুবাবু ভয় পাওয়া গলায় বললেন, চল জগাই! কেটে পড়া যাক। গতিক ভালো নয়। জয়, এখানে দাঁড়িও না! বাড়ি চলে যাও অন্য পথে। ..."[৬] আসলে সিরাজ সাহেব গ্রামের ঘটনাকে ভিত্তি করে নিজ কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন। এই উপন্যাসগুলি তাঁর মনন ঋদ্ধতার ফসল, এর সাথে রয়েছে লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি।

১৯৫০-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছ-সাতটা বছর সিরাজ ছিলেন আলকাপ দলে। সেখানে তিনি তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের মতো নেচে নেচে ঝুমুর দলে গান করেছেন।

এই দলের মানুষজনকে নিয়েই তার সময় কেটেছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। এই সময়ের প্রতিফলনই 'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৮৪) উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক সনাতন কুমার রায় বা সনাতন মাস্টার। সনাতন সাঁওতাল পাড়া আলকাপ দলের মাস্টার। উপন্যাসে সনাতন মাস্টারের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই ঔপন্যাসিকের জীবনাগত। সনাতন একসময় বাঁশি বাজাত এবং হাবোল গোঁসাইয়ের কাছে গান শিখত; যা ঔপন্যাসিকের জীবনেও ঘটেছে। এইভাবে তিনি একের পর এক ঘটনা বুনে বুনে চলেছেন, যা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। এই উপন্যাসের নায়ক অনেকের মাঝখানে থেকেও আশ্চর্য একা। চারদিকে তার নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধ্য বলয়। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে সিরাজ জানিয়েছেন—"প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভবনাপূর্ণ ছ-সাতটা বছর—তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।"[৭]

উপন্যাসে সাঁওতাল পাড়ার দলের অন্যান্য সদস্যরাও বাস্তব। একমাত্র কালা আর কাবুল ছাড়া প্রত্যেকেই সাঁওতাল পাড়ার লোক। কালা, কাদের, নফর আলি স্ব-মহিমায় বর্তমান। সুধাও বাস্তবভিত্তিক চরিত্র। 'মায়ামদঙ্গ' সিরাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফল। এই উপন্যাস দুঃখী মানুষের চিরন্তন অপ্রাপ্তির ইতিহাসে পূর্ণ। অ-সুখের অপূর্ণতা তাদের মনের মধ্যে অনুভূতির স্পর্শ আনে। অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শিল্পীত ফর্মে নির্বিশেষ করতে হয়, ব্যক্তিসমূহ এবং ইতিহাসে ব্যক্তিকেও নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে একই সঙ্গে আনতে হয়, তার মহৎ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে। সিরাজ বলেছেন—"আমার এ বই উপন্যাস এবং মূলত অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক, তত্রাচ অকপটে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক।"[৮]

জীবনবোধের গভীরতা সিরাজের ভাষায় কাব্যসৌন্দর্য দিয়েছে। কাহিনিতে 'ক্যারেকটারস পোরশান' কাটা উক্তি-প্রত্যুক্তিতে রচিত। এই প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার নাশে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তাকেও লেখক হাজির করেছেন। এখানে খুঁজে পাই একজিস্টেশিয়ালিজমের অমোঘ ছায়া। 'নিশিলতা' উপন্যাসটি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানিচকের রুদ্রদেবের মেলাই এই উপন্যাসের ভিত্তিমূল। সেই মেলাতেই দেখতে পাই পান বিক্রেতা বিনোদিনী ও তার সদ্যযুবতী ভাইঝি

নিশিলতার। মেলার করুণ অভিজ্ঞতা তাকে দীর্ণ করে। তীক্ষ্ণধী স্রষ্টা তার মননে নিশির অন্তর্বাস্তবের অনবদ্য মূলটিকে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন।

'নিশিলতা' উপন্যাসে নিশি ও গোবরা নির্মম একাকীত্বের শিকার। সংকটের তীব্রতার পরিবেশে চরিত্রগুলির অন্তর্বাস্তব থেকে উঠে আসে বিপন্ন অস্তিত্বের অসহায় ক্রন্দন। তাদের আত্মা কাফকা কথিত 'Nihilistic fragment'-এর তীব্র যন্ত্রণাবোধে পীড়িত। তাই তারা মনে করেছে 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ'। কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারে না কেউ। যে মানুষ-মানুষীর দল নিজেদের গভীরতম সংকটময় দুটি সত্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে—গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা তো নিশ্চিতভাবেই জীবন প্রেমিক। শব্দ দিয়ে আঁকা হয়েছে, তা যেন রসঘন হয়ে ছবি মুছে গিয়ে সৃষ্টিতে পরিণত হয়। সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতায় ছবি এঁকে সংগীতের রণনে তুলে আনলেন নিশির অন্তর্বাস্তবকে।

সিরাজের শহুরে জীবনবোধ সম্পর্কিত উপন্যাসগুলির দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। এখানে সব থেকে প্রথমে যে উপন্যাসের নামটি মনে আসে সেটি প্রেম-ঘৃণা-দাহ; যার পরিবর্তিত নাম 'লাল নক্ষত্র'। এই উপন্যাসের প্রথমেই পাই চারটি মহিলার কথা—রুচি, অশ্রু, বিবি বা বৈজয়ন্তী ব্যানার্জী এবং ঋতু। "রুচির বয়সের গাছপাথর নেই।"[৯] ঋতু মসলমানের মেয়ে, অশ্রু অর্থাৎ অশ্রুকণা সরকার খ্রিস্টানের মেয়ে। কিন্তু সে মাথার কাছে যীশু বা মেরির ছবি রাখে না, গির্জায় যায় না। অশ্রু নরম ও চাপা স্বভাবের। কেউ কখনো ওকে ভারি বা ভিজে মুখে দুঃখিত হতে দেখেনি। এই চারটি চরিত্রে অন্তর্বাস্তবে রয়েছে নবপদ্ধতি বিন্যাস ঋতু আর রুচি আঁচ করে "ওর পেছনের জীবনে কিছুটা রহস্য আছে।"[১০] "আবার ঋতু বা অশ্রুও ভাবে রুচির পেছনের জীবনটা যত স্বল্পপরিসর হোক, তা কোনো সাংঘাতিক রহস্যে ভরা। কিন্তু তারা কেউ-ই সেটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাদের মনে হয় "সবার সব রহস্যের চাবিকাঠি বিবির হাতে। যেন বিবি সবই জানে...বিবির ভূমিকা যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মতো।"[১১] তাই রুচির অনুভব "বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তার বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে। অত সুন্দর করে কেউ কথা বলতে জানে না, কেউ অমন সুখে কিংবা দুঃখে বাঁচতেও জানে না। রুচি তার আঠারো বছরের জীবনে—যে জীবন অনেক পোড়খাওয়া, অনেক গোপন কদর্যতার ক্ষত চিহ্নে ভরা—এমন মানুষ দেখেছি। রুচির এতো বল এসেছে বুকে,

এত সুখ!”[১২] রুচি এই তিনজনের থেকে অন্তত এনাটমির ক্ষেত্রে সুন্দর। বিবির ঝলমলে রং, একরাশ আলুথালু চুল, ছন্দিত শরীর-রুচির পাশে ফ্যাঁকাসে লাগে। “এই মহিলা মেসে রুচি একটা শান্ত সৌন্দর্য।”[১৩]

উপন্যাসের এই চারটি চরিত্রের মধ্যে রুচি, অশ্রু আর ঋতুর চিন্তা স্রোতধারাই ঘটনা গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ‘স্ট্রিম অফ কনশাসনেস’-এর অবাধ যাতায়াত এখানে। তাই অশ্রুর নিভৃত অবচেতন স্তরের মানস-কূটগুলি ক্রমশ ফুটে ওঠে—রুচির চাকরিটা অশ্রু খুব ভালো মনে করে না। যেমন সে বরাবর রুচিকেও খুব একটা নির্ভেজাল মেয়ে মনে করে না। আবার সে ভাবে “রুচি যখন বাসায় থাকে, তখন তার মধ্যে একটা কেমন যেন বিষণ্ণতা, বালিকাসুলভ ছন্দ আর অসহায়তার আমেজ থাকে যা—রুচির সাত খুন মাফ করত ওস্তাদ।”[১৪] এই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে চরিত্রগুলি আলোড়িত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

অশ্রু কেবলই ভাবে, সে আর টিউশনি করবে না। তার মতো হিসেবি মেয়ের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয়। আবার পরমুহূর্তেই তার অনুভব—“কঠিন নয়-কিন্তু...কিন্তু তারপর? জীবনে তার পরেরটা কি? ...কোথায় পৌঁছোতে চায় সে। একইরকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে অর্থাৎ নিছক বেঁচে থেকে? তবে পৌঁছোবার একটা জায়গা কেন সে খুঁজে পাচ্ছে?”[১৫] মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, নিরাপত্তার অভাব থেকেই অশ্রু গড়ে নিয়েছে স্বপ্ন-অবচেতনা-অনুভবের একটা অন্যভুবন। কখনো তার মনের অন্দরমহলে ভেসে ওঠে, “সে একটা ছোট্ট পোকার মতো এক জায়গা আটকে থেকে এই স্ফীতি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছে।”[১৬] তখন ফ্রানৎস কাফকার মেটামরফসিস-এর কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে অস্বস্তিকর এক স্বপ্ন দেখে ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে গ্রেগর সামসা দেখতে পায় সে একটা বিশাল কীটে পরিণত হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। ‘অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময়’ অশ্রুর ‘অন্তর্গত রক্তের ভিতরে’ খেলা করে।

ঋতুর একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতার বীজ তার চরিত্রের অন্দরমহলেই সম্ভাবিত ছিল। সে ভেবেছে—“তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব? সে যদি হিন্দু মেয়ে হতো, তাহলে কি প্রচুর গভীরতার সঙ্গী পেত তাকে ভালোবাসার মতো? হিন্দু-মুসলমান

কোনো পুরুষই ঋতুর বিদ্রোহী ভাবটা মেনে নিতে পারেনি। তারাও যেন বলতে চেয়েছে, ঋতু, তুমি নিজে মুসলমান মেয়ে। এতখানি তোমার সাজে না! স্মৃতিপ্রবাহ ও চেতনাপ্রবাহ বেয়ে নির্বাচিত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মনের নানা স্তরে চলেছে তার অশান্ত অন্বেষণ। ঋতু তাই বলেছে; মানুষ এটা কেন বোঝে না যে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তার পর ধর্ম বা সম্প্রদায়?"[১৭]

সিরাজ তার সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি কখনো–তিনি জানেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', এক অদৃশ্য জীবন-সংগ্রামে আপাত শিথিল গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে ঋতুর মধ্যে এক অখণ্ড জীবনবোধ গড়ে ওঠে। চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাবিহারের আড়ালে নগ্ন হয়ে রইল তার আত্মকথন। তার মনোগহনের জটিল আঁধারে সিরাজ আলো নিক্ষেপ করেছেন–"মনে মনে বিবিদি মিঠে হাসছে নিঃশব্দে এবং স্নেহে, তার উজ্জ্বল মুখে পৃথিবীর ময়লা ও অসুখ-বিসুখের কোনো ছায়াই পড়ে না। রুচি...হ্যা, তার পক্ষে সম্ভব। ...রুচি খুব স্বার্থপর টাইপের। মেয়ে, কুচুটে, সারাক্ষণ তার মনে অন্য এক চালাক চতুর মন নিয়ে সে থাকে–কাকেও জানতে দেয় না।"[১৮] চরিত্রগুলির মনোগহনে যে নিরন্তর যন্ত্রণা বাসা বেঁধে আছে তাকেই সিরাজ উপন্যাসে শৈলীর দক্ষতায়, আপাত সরল অবয়বে উদ্‌ঘাটিত করে চিত্রিত করেছেন।

স্থানীয় মানুষজন জাগতিক ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য, স্বার্থপরতার টানাপড়েনকে ছাড়িয়ে যেন মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ জাগতিক সুখ-দুঃখ, হতাশা গতিপ্রাপ্ত মানুষকে আটকে রাখতে পারে না; এইভাবে মানুষ আনন্দ থেকে মহানন্দের পথে যাত্রা করে। সিরাজ উপন্যাসে এই কথাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এই বিষয়গুলি সিরাজের জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন বা ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার কথা যুক্ত করে নতুন আঙ্গিকে উপন্যাসকে রূপদান করেছেন। সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন–"ছ-সাত বছর সে এক আশ্চর্য জীবন। সৌন্দর্য ও পাপ, অমৃত ও বিষ নির্দ্বিধায় পান করতে থাকলেন। নীলকণ্ঠ শিবের দুঃসাহসে।"[১৯] তাঁর জীবনের এই কথাগুলিই 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের বিষয়। আলকাপ দল, দলের লোকজন এবং নিজেকে নিয়েই তাঁর এই সময় অতিবাহিত হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশের মধ্যেই পেয়েছিলেন এই সব অভিজ্ঞতা। আপাত ছন্নছাড়া কৈশোর ও সদ্য যৌবনে অজস্র মানুষের সাহচর্য ও তাদের প্রতি মমত্ব তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করেছে। উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয় হয়েছে আলকাপ এবং সেই দলের কুশীলবরা। তাঁদের সম্পর্কে সিরাজ জানিয়েছেন—"উপন্যাসের চরিত্রেরা নামে-স্বনামে এখনও বেঁচেবর্তে আছে এবং পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপার-ওপার যোজন বিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ হাটমেলায় উৎসবে-নিরুৎসবে লোকগাথা বিস্ফোরণ করেছে। এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্য-রীতির জনপ্রিয়তা লোক সমাজে শ্রেষ্ঠতম। আবার বলছি, শ্রেষ্ঠতম। অবশ্য, আরও লোক শিল্পের মতনই এর গায়েও মৃত্যুর ধূসর ছায়া পড়েছে।"[২০] আলকাপ দলের শিল্পীরা যে মোহিনী মায়ায় জড়িয়ে থাকে উপন্যাসটি তারই আখ্যান।

মালদা, বীরভূম, রাজশাহী, সুমকা, সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি জেলার জনপ্রিয় লোকনাট্য হল আলকাপ। ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপধর্মী রঙ্গ রসাত্মক লোকনাট্যই হল 'আলকাপ'। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের প্রতিভাবান শিল্পী ধনঞ্জয় সরকার এই জেলায় আলকাপকে কিছুটা সংশোধন করে পঞ্চ রসে রূপান্তরিত করেন। ৬-৭ জন শিল্পী নিয়ে এক একটি দল গঠিত হয়। 'আলকাপ' কোনো ধর্মমূলক গান নয় এবং বছরের যে কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই দলে নারীবেশী পুরুষ অভিনেতাদের বলা হয় ছোকরা এবং যিনি ছড়া, গান, কাপ, পালা রচনা করেন তাঁকে বলা হয় 'মাস্টার' বা 'ওস্তাদ'।

এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ওস্তাদ ঝাঁকসুর কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এক পড়ন্ত বিকেলে ঝাঁকসু গঙ্গার তীরে তার ছোকরা শান্তি ও স্ত্রী গঙ্গামনিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে। তারই চোখের সামনে প্রিয় মানুষদের এমন অবস্থায় পেয়ে সে অসহায়তা বোধ করেছে। তার চোখের সামনে দিয়েই নদী সাঁতরে পালিয়ে যায় শান্তি। ঘটনাক্রমে এই দিনই তাদের দলের বায়না ছিল। বায়না অনুযায়ী শ্রোতাদের মন জয় করতে পারবে কি না সেই আশঙ্কা দলে তৈরি হয়েছে। ওস্তাদের মনে হয়েছে শান্তি ছাড়াও তার দল আসর জমিয়ে দিতে পারবে। ওস্তাদকে তাড়া করে বেড়ায় গঙ্গামনি ও শান্তির মিলন দৃশ্য। সিরাজ এই উপন্যাসে এক অদ্ভুত মায়ার জগতের কথা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

'আলকাপ' দলে কম বয়সী, কমনীয় পুরুষকে দলের ওস্তাদেরা শিখিয়ে-পড়িয়ে নারীতে রূপান্তরিত করে তোলেন। দলের এই মোহময়ী নারীবেশী পুরুষ শিল্পীরাই 'ছোকরা'। ছোকরাদের শেখানো হয় চলনে, বলনে, শয়নে, স্বপনে নারীদের মতো করে চলার পথ। এই নিরন্তর চর্চা থেকে জন্ম হয় দলের সার্থক ছোকরার। তাই শান্তি পালিয়ে গেলে দলের সবারই মনে একটা শূন্যতা বোধ তৈরি হয়েছে—"সেই স্ফূর্তিবাজ লোকগুলো আজ বিমর্ষ। শান্তি নামক তাপকুণ্ড না থাকাটা আজ এত স্পষ্ট যে, ক্রমাগত শীতের আঙুল ওদের শরীরকে নীল করে ফেলছে। ওরা টের পাচ্ছে কী ছিল কী হারিয়েছে।"[২১] ওস্তাদের বউ গঙ্গামনি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল পুরুষকে নারী না করে মেয়েদের নিয়েই তো আলকাপ করা যায়। কিন্তু ওস্তাদ ঝাঁকসু তা মানতে নারাজ—"তাতে মায়া জমে না। ...গম্ভীর হয়েছে ওস্তাদ। হ্যাঁ, তার নাম মায়া। সে তুমি বুঝবে না। সে বড়ো গুহ্য তত্ত্ব। দ্যাখ না ছোটবউ, ঝুমুরকে তাড়িয়ে ছিল আলকাপ। বীরভূম ছিল ঝুমুরের আদি ঠাঁই। বীরভূমে আজ ঝুমুরের মেয়েদের অন্ন জোটে না। রক্ত-মাংসের শেষকথা রক্ত-মাংস—ব্যস, কথা ফুরুলো, নটে মুড়ুলো। কিন্তু মায়ার শেষ কথা নেই।"[২২]

এইভাবে উপন্যাসে সংযোজিত হয় বিবিধ ঘটনাবলি। গঙ্গামনির আত্মহত্যার খবর পেলেও ওস্তাদ ঝাঁকসু বাড়ি ফেরেনি। সংসারের সমস্ত দুঃখ ও অশান্তিকে দূরে ফেলে আলকাপের আসরে যোগ দেয় ফজল, ভানু। ভানুকে ভাড়া করে নিয়ে এসে ছোকরার অভিনয় করানো হয়। সিরাজ বলেছেন—"শান্তির নয়—তবু ছোকরার হাত তো বটেই। শীতের পথে আলকাপওয়ালাদের এইটুকুই যা উত্তাপ।"[২৩] কিন্তু শান্তির নারী নির্মাণ তার দলের কাছে যত সূক্ষ্ম বলে মনে হয়, ভাড়া করা ছোকরা ভানু তার মতো হতে পারে না। এই শান্তির চলে যাওয়া প্রসঙ্গে ঝাঁকসুর মনে পড়ে দশ বছর আগে চলে যাওয়া আর এক ছোকরা সুফলের কথা। সুফল আলকাপ ছেড়ে চলে গেলে ঝাঁকসু বলেছে—"পাগল হয়ে বসে থাকতাম গঙ্গার ধারে। তখন আমার প্রথম যৌবন। বড়ো বউ ধরে নিয়ে আসে বাড়ি। প্রহ্লাদের মা তখন প্রতিমার মতো রূপসী—অ্যাঁ? হঠাৎ সশব্দে হো হো করে হেসে ফেলে ধনঞ্জয় সরকার। ...তবু শালা এ পাপীর মন ভরল না, হৃদয় জুড়াল না। ...শালা ঢ্যামনা আমার বুক খালি করে দিলে। বুকখানা গ্রীষ্মকালের আকাশের মতো জ্বলে। বিবাহ করলাম। বুক ভরবার বড়ো আশা নিয়ে বিবাহ করলাম। কিন্তু ফজল কী হল? সে জ্বালা তো শেষ হল না। সুফল যা দিয়েছে তা তো কেউ দিতে পারলো না। জ্বালা নিয়ে ছটফট করে মা

জাহ্নবীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। একদিন হঠাৎ যেন মা আমার বড়ো দয়া করে সামনে তুলেছিলেন ওই শান্তিকে। আঃ ফজল রে, সে কী দিন, সে কী আনন্দ। ফের আকাশের চাঁদ পেলাম হাতের মুঠোয়।”[২৪]

ওস্তাদ ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় সরকারের আখ্যানে এই মায়াকাহিনীর সূচনা; আর তার বিস্তার হয়েছে সনাতন মাস্টারের আখ্যানের মধ্য দিয়ে। সনাতন মাস্টার ছিলেন উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশীয়, কম বয়সী প্রতিভাশীল যুবক। সে নতুন যুগের আলকাপ দলের প্রতিনিধি হয়েছে। একসময় তিনি গানের নেশায় ঘর ছেড়ে এসে শেষপর্যন্ত আলকাপ দলে ভিড়ে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। ভদ্র সমাজে আলকাপের প্রতিষ্ঠা নেই; তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সে ভাবে আলকাপ দল থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যেতে পারেনি—“গায়ে সবুজ বুশশার্ট, পরনে সবুজ পাজামা, মুখে জ্যোৎস্নার রঙ, চুলে অন্ধকার, সে পুরুষ-তবু পুরুষ নয়, নারী-তবু নারীও নয়-তার নাম সুবর্ণ। তাকে সাধ যায় ডাকতে সুবর্ণলতা।”[২৫] এই সুবর্ণের কারণেই সনাতন বাবু আলকাপ ছাড়তে পারেনি। তার আরও মনে হয়েছে সুবর্ণ শুধু ব্যক্তি মাত্র নন, এর সাথে জড়িয়ে আছে মায়া। সিরাজের মতে—“কতো জন্মের আরব্ধ দায়িত্ব রয়েছে সনাতনের কাঁধে, একটা অসম্পূর্ণ প্রতিমাকে সম্পূর্ণ করে তোলার দুশ্ছেদ্য দায় আছে চেপে। আর সেই সম্পূর্ণতা হয়তো সনাতনকেও সম্পূর্ণ করে তুলবে সঙ্গে সঙ্গে।”[২৬] সুবর্ণর সাথে সনাতনের যে মান-অভিমান ছিল তা কমে শেষে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। তার মনে হয়েছে—“ভুলে ভরা থাক, ভুলেই জীবনটা ডুবে থাক। এই মিথ্যে নিয়েই চিরকাল যেন বাঁচতে পারি।”[২৭]

এরপর সনাতনের সঙ্গে ধনঞ্জয় ওস্তাদের দেখা হয়। আলকাপে দুজনের গানের পাল্লা হয়। সুবর্ণকে নিয়ে সুর আর মায়ার জগতে নিমজ্জিত হতে থাকে সনাতন কিন্তু প্রবহমান জীবনস্রোতে নতুন আবর্ত সৃষ্টি করে তার জীবনে এসেছে সুধা। তার বাল্য সঙ্গী, প্রৌঢ় পণ্ডিতের বৌ সুধা তাদের গ্রামের মেলায় আলকাপ দেখতে এসে খুঁজে পায় সনাতনকে। সনাতনের মধ্যে সে ক্লান্ত, বিরক্ত জীবন থেকে মুক্তি খোঁজে। সনাতন সুধাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে স্থির করলে তাকে বাঁধা দেয় সুবর্ণ। সুধার বাহুপাশে থেকেও সনাতন সুবর্ণর অভাব বোধ করে আবার

ফিরে আসে আলকাপের আসরে। আর তার দলের নন্দ এবং কাবুলের হাতে ধর্ষিত হয়ে মারা যায় সুধা।

সনাতনের এই আখ্যান শেষ হওয়ার আগেই ধনঞ্জয় ফিরে গেছে নিজ গ্রাম ধনপত নগরে। সনাতন জানতে পেরেছে ধনঞ্জয় ওরফে ঝাঁকসু ওস্তাদ মায়ার বাঁধনে বাঁধতে পারেনি শান্তিকে; শান্তি ভয় পেয়েছে ওস্তাদ ঝাঁকসুকে। অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর এই ব্যবধান ধনঞ্জয়কে নতুন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে—"ওস্তাদ ঝাঁকসু বলে, হু। আমার স্মরণ করতে দে। সে রাতে আমি গঙ্গামনির কাছে শুলাম। গঙ্গামনি জড়িয়ে ধরল। বড়ো ক্লান্ত ছিলাম। আর কতদিন থেকে নারীসঙ্গ আমার ভালো লাগে না। তেতো লাগে সব! ...গঙ্গামনি বললে, আমি শান্তি হলে তো মুখে মুখ দিয়ে শুয়ে থাকতে। ...আসলে খুব ঘুম পেয়েছিল আমার—কালঘুম রে শান্তি! ...আহা! কতো আশা ছিল মেয়েটার! দেহের আশা-মনের আশা। ...শান্তি, আমি-আমি আর গান করবো না রে! করবো না। বড়ো অশান্তির আগুন মনে। বিবাহ করেছি। এখনও দুই বহু ঘরে। পুত্রকন্যা আছে। আমি বাবা রে শান্তি—তবু সব ভুলে হঠাৎ গর্জে ওঠে সে। সব ভুলে তুই হারামি পুরু বেশ্যাদের ভাগাড়ে রাহুচণ্ডাল সেজে বসে আছিস। কেন তোদের জন্ম হয়েছিল রে গিদ্‌-ধড়ের বাচ্চারা।"[২৮] মায়ার এই দ্বন্দ্বে বিক্ষত ধনঞ্জয় শেষপর্যন্ত আশ্রয় চেয়েছে মর্ত্য মায়ার কোলে; সংসার-সন্তানের আকর্ষণে সে আবার ঘরে ফেরার কথা ভেবেছে। অপরদিকে সনাতন বাবু সুবর্ণকে নিয়ে মায়ার খেলাতেই মগ্ন থেকেছে। সুধা মারা যায়, সনাতন-সুবর্ণও দল ছাড়ে। সিরাজ জানিয়েছেন যে তারা পরস্পর-পরস্পরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ—"আপের স্টেশন পাঁচ মাইল দূরে। হনহন করে হাঁটে দুজনে। কোনো কথা বলে না। ...আর যেতে যেতে বিহ্বলতায় হঠাৎ থেকে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। আর ঘৃণা নয় সোনা ওস্তাদের। এই আবেগ, এই ভালোবাসা এই শরীর ছোঁয়া। আবেশ-মায়া নামে নারীর উদ্দেশ্য। যে নারী নটী-যার ছায়া পড়েছে এক কিশোর পুরুষ দেহে, যে ছায়া সারা বেলা নাচে। সেই ছায়াকে নিয়েই যত খেলা। যত পালাগান, কান্না, সুখ, ভালোবাসা।"[২৯]

সনাতন ও সুবর্ণ শপথ নেয় পরস্পরকে ছেড়ে না যাওয়ার, ওস্তাদ ঝাঁকসুর কাছেই তারা যাবে বলে স্থির করেছে। শিল্পের উদ্দেশ্যেই তারা নিজেদের সমর্পণ করতে চায়। সিরাজ এখানে

পাঠককে আখ্যানের পথ ধরে জীবনসত্যের দ্বার প্রান্তে এনে উপনীত করেছেন। যে অমর্ত্য মায়াকে নিয়ে এই উপন্যাস তা নান্দনিকতার তৃষ্ণা ও অন্বেষণকে দ্যোতিত করেছে। তাই এই সন্ধান শেষ হয় না, দেশে দেশে মায়ামৃদঙ্গ বাজতে থাকে। ধনঞ্জয় মাস্টার থেকে সনাতন মাস্টার অর্থাৎ সেকাল থেকে একাল তার ছন্দে পা মেলায়। সৌন্দর্য অন্বেষার প্রয়াস, বিরল মায়ার অনুসন্ধানেই যত ট্রাজেডি। আবার সেই ট্রাজেডির পরিণামেই মানবজীবন সার্থক। উপন্যাসটি তাই আলকাপ দলের প্রতি দৈনিকতার আখ্যানেই সীমায়িত হয়নি, বৃহত্তর শিল্পলোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে।

নাগরিক জীবনবোধ সিরাজের উপন্যাসে এবং গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করলেও তার শিকড় প্রোথিত আছে গ্রামে। একখণ্ড প্রাকৃতিকতার উদাসীন পটে ধরা থাকে জীবনের নির্যাস। সিরাজ আত্মকথায় জানিয়েছেন—"আসলে লেখক লেখেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে। নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, শুধু নিছক অভিজ্ঞতা নয়-যিনি সেই জীবনকে মূল অবধি দেখতে পান—তিনি নগরকেন্দ্রিক লেখা লিখবেন। যিনি তার বাইরের ব্যাপারগুলো জানেন, গ্রাম গঞ্জ যাই হোক, তাই নিয়ে লিখবেন। এতে কোনো শ্রেণির পার্থক্য টানা মূর্খতা। এতে আধুনিকতা-অনাধুনিকতার প্রশ্ন অবান্তর। তাহলে তো অনেক লেখকই নাগরিক কথা বস্তু নিয়ে লেখেন, তাঁদের লেখায় তথাকথিত আধুনিক প্রসঙ্গ...থাকে—তবু তাঁদেরকে কেউ আধুনিক লেখক বলবেন না। দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাই আসল। প্রকৃত আধুনিকতা থাকে লেখকের মনে। তাঁর চেতনায়-চোখ ও মগজে। এবং হৃদয়েও।"[৩০] প্রকৃতির সাথে লেখকের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যদিও পরবর্তীতে প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ধীরে ধীরে বদলে গেছে। তিনি বুঝেছেন দ্বন্দ্বহীন প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মানুষের সকল দ্বন্দ্বের হেতু। রাঢ় ভূমির মহাশক্তি সিরাজকে প্রভাবিত করেছে। 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি'—উপন্যাসে সিরাজের এই জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে আছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্ধকারময় জীবনচর্যার কথা। শিক্ষক ননী এবং তার বোন কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের আখ্যান এগিয়ে গিয়েছে। কাহিনীর অন্দরমহলে এই দ্বৈত ব্যক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। মানবচরিত্রের জটিল, রহস্যময় জীবন এবং তৎসম্পর্কিত গুহাহিত রহস্য সম্পর্কে লেখক পাঠককে কৌতূহলী করে তুলেছেন। উত্তেজনাময় ঘটনার চমৎকার বিবরণ, চরিত্র বিন্যাসের পারম্পর্য, ঘটনার দ্রুতগতি উপন্যাসটি শিল্প সার্থকতার শিখরে

পৌঁছে দিয়েছে। মানুষকে ননী ভালোবেসেও বিবাহের পথে পা বাড়ায়নি; একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার। মানুর ভাই জন কৃষ্ণাকে শ্লীলতাহানি ও শেষপর্যন্ত মেরে ফেলে—এই খবর ননীকে বাক্যহারা করে দেয়। মানু ভাইয়ের অপরিনাম দর্শীতায় লজ্জিত হয়ে ননীর পদতলে আশ্রয় নেয়; শুরু হয় তাদের নতুন দিগন্তের অন্বেষণ। সিরাজ ননীর অন্তর্লোক আলোড়িত করে এক অমোঘ সত্য কথা বলেছেন—“সেক্স মানুষকে মেরে ফেলে। ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।”[৩১] উপন্যাস কাঠামোর মধ্যে প্রলম্বিত রয়েছে জগত ও জীবনের চলার গতি। চরিত্রগুলিকে শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখা হয়েছে। হৃদয়ের গভীরে প্রেমের নিগূঢ় আর্তিকেই সিরাজ চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সিরাজের চরিত্রেরা তাদের নিজস্ব মিথ ও ভাবনার জগতে বিচরণ করে। তাই গভীর অন্তর্বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিকার গভীরে সিরাজ সহজেই প্রবেশ করতে পারেন। ব্যক্তির ইতিহাস তার নানা ছন্দে, নানা লয়ে অবশ্যই কখনো চোট খায়। সময়ের ফ্রেমে সিরাজ তাকেই ধরতে চেয়েছেন। তিনি চরিত্রের সাথে খুব সহজেই সেলফ আইডেন্টিফিকেশন করে নিতে পেরেছেন। এখানেই ‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’ উপন্যাসটি শিল্প সার্থকতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

স্বজাতিপ্রীতি ও স্বাদেশিক সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে মানুষকে জীবনের আলো দেখাতে পেরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসগুলিতেও তারাশঙ্করের শিল্পরীতির মিল পাওয়া যায়। নিসর্গের সবুজ আর সংসারের নানা রং নিয়ে ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসের ঘটনাকে গতি দান করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি মুর্শিদাবাদের দ্বারকা নদী তীরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত তৃণাঞ্চল। সোনাটিকুরি পেরিয়ে চালু আবাদি মাঠের পর কূলহীন ধূসর সমুদ্রের মতো তৃণভূমি। সিরাজের লেখক জীবনের মূল ভূখণ্ড হল এই তৃণভূমির জগত। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ কিংবা ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে নদীই নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস, আর একে কেন্দ্র করেই লেখকের গোষ্ঠী ও শ্রেণিচেতনা, নাটকীয় আবেগ ক্রমশ দানা বাঁধে। সাঁওতাল চাষি, অর্থলিপ্সু বণিক, জমিদার, শিল্পপতি সকলেই এই বেষ্টনীতে আবদ্ধ। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে আছে জমি, চাষি এবং কারখানা। করালির সঙ্গে বনোয়ারীর সংঘাত একটি জনপদের পটভূমিতে অভিনব রসমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। এর উত্থান-পতনকেই সিরাজ ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসে প্রাধান্য

দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দুর্যোগের পটভূমিতে হিজল বনের প্রকৃতিলালিত মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী এখানে চিত্রিত। উচ্চবর্ণ, হিন্দু-মুসলমান সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করেছে তৃণভূমি। আদিনাথ, নিশানাথ, সরযূ, রাখাল কবিরাজ, চন্দনা, সীতা, ঝুমরি, তোরাপ, সেতাপ, পরাশর, সৌমেনরা নিজ রাজ্যেই মহীয়ান। অনেকে মনে করেছেন তারা দেশ কালের গণ্ডি অতিক্রম করে কোনো বৃহত্তরলোকে পৌঁছোতে পারেনি। অবশ্য এই মানুষদের সেরকম কোনো প্রয়োজন নেই, হয়ও না। তবু এরই অন্তরালে তিনি প্রকৃতির মায়ামদিরায় আকৃষ্ট হয়েছেন। ঘননীল কুয়াশার চাদরে নিজেকে মুড়ে লেখক পৃথিবীর রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। বন আর বিল-অঞ্চলের নিসর্গ প্রকৃতি যেমন মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে ওঠে, তেমনই উদ্দাম হয়ে ওঠে এই অঞ্চলের মানুষজন।

সিরাজের ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসের নায়ক নিশানাথ। জমিদারি পরিবেশে লালিত হলেও প্রকৃতির রহস্যমর্মরিত গোপন জায়গায় তার অনবরত যাতায়াত। তার কাছে আজীবন পরিচিত অরণ্যভূমি বড়ো অপরিচিত মনে হয়। বাবার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হলেও সকলের প্রতি নিশানাথের সমান ভালোবাসা। সৎমা সরযূও তার শ্রদ্ধাভাজন। বুক ভরা ভালোবাসা নিয়েই নিশানাথ, প্রহ্লাদ, ঝুমরি, সুধন্য, গঙ্গু, মানকে হাজি সাহেবদের দুঃখ কথা শুনেছে। তাদের দুঃখ নিরসনের কথাও চিন্তা করে। এর সাথে লৌকিক পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ গ্রাম-জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতীকরূপেও নদীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা এই উপন্যাসে শিল্প স্বীকৃতি পেয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনের সেরা উপন্যাস ‘অলীক মানুষ’। উপন্যাসটি জীবনের প্রায় শেষ পর্বে এসে লেখা। তিনি পির-ফকির পরিবেষ্টিত মুসলিম জনসমাজের চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। এই ধ্রুপদী উপন্যাসটি ভুয়ালকা, বঙ্কিম, আকাদেমি পুরস্কারের সম্মান লাভ করে। উপন্যাসটির বিষয় ভূমির কেন্দ্রে অবস্থান করেছে ফরাজি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণিত ধর্মগুরু বদিউজ্জমান। তাকে সামনে রেখেই বিষয়বস্তু এগিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সিপাহী বিদ্রোহ, ভারত ভাগের কথা। তিনি মুসলিম জনসমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সুদীর্ঘকাল ভারতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু থাকায়

মুসলমানদের মধ্যে অহংকার বোধ অন্যদিকে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় ক্রমাগত মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্য হীনমন্যতা বোধ ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

৩২০ পৃষ্ঠার (দে'জ) এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসে অভিনিবেশ দেওয়ার আগে নজরে পড়ে যায় সূচক মলাট লিখন। উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পির-পরিবারে লৌকিক-অলৌকিক ওতপ্রোত জীবনের কাহিনি 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের উপজীব্য। মূলত দুজন হারিয়ে যাওয়া একলা হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প। বাস্তব ও পরাবাস্তবের দ্বন্দ্বে দুটি মানুষ দু-রকমভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয়। একজন ধর্মবন্দী ও একজন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিগত পরিত্রাণের পথ খুঁজে নিতে চেষ্টা করে এবং প্রকৃতির রহস্যময়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বে একটি অশ্বের চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। ওই চিত্র সাদা এবং কালো। ছবি রঙিন হলে অশ্বের শরীরে সিঁদুরের লালছোপ দেখা যেত। কারণ পিরের সাঁকোর নিচে এরকম দেখা যায়, একে বলে টোটেম। আবার তা মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার ঘোড়া বা 'বোররাখ' হতে পারে। এই ঘোড়ায় চড়েই কি শফিউজ্জমান মৌলাহাটে তার আম্মির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা জানতে পারি সেদিন তার সঙ্গে কোনো ঘোড়া ছিল না। জনশ্রুতি অনুযায়ী একটি কালোজিন ঘোড়ার রূপ ধারণ করে শফিকে মৌলহাটে পৌঁছে দেয়। বিষয়গুলি জানামাত্রই পাঠক চমকে ওঠে। চমকে ওঠার কারণ উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন, উপন্যাসের নায়ক শফিউজ্জমানের ফাঁসির হুকুম হয়েছে, সেই নির্দেশ শোনার পর শফিউজ্জমানের চোখে একজন কালো জিন ও একজন সাদা জিন ভেসে উঠে।

এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুটি—ধর্মগুরু বদিউজ্জমান এবং তার নাস্তিক ও বিদ্রোহী পুত্র শফিউজ্জমান। পিতা মনে করেন মানুষের ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর, পুত্র মনে করেন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। কেবল মুসলিম জীবনভাষ্য নয়, একদিকে যেমন মুসলিম পির, তেমনই অন্যদিকে ব্রহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের পটভূমি এসেছে ঘুরেফিরে। হিন্দু-মুসলমান আন্তঃসম্পর্কের উদ্ভাসন হয়ে উঠেছে কাহিনির অন্যতম উপকরণ। বাংলা ভাষী মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফাসসি শব্দগুলিও সিরাজের তীক্ষ্ণ, সাবলীল গদ্যের ভেলায় চড়ে এগিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। ধর্মগুরু বদিউজ্জমানের এক বিশেষ মুহূর্তের অবাস্তব প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন— "চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে

ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসজিদ সুদ্ধ তাকে যেন গয়রত (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন।"[৩২] আবার প্রবৃত্তিবশীভূত শফিউজ্জমানের পরাভূত হওয়ার ভঙ্গিটিতে সিরাজের সংযম প্রশংসার যোগ্য। যা আধুনিক কবিতার পর্যায়ে উন্নিত—"...জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিস ফিস ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জামবাটিটি তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাসঢাকা মাটিতে বিধিতে মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগলো। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পরোপরি—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।"[৩৩] নিসর্গ আর মানুষ এখানে একাকার। এখানেই সিরাজের বিশিষ্টতা। প্রতিটি চরিত্রের আত্মান্বেষণের রক্তাক্ত পথে, নির্মম বিশ্লেষণে মগ্নচৈতন্যের গভীরে অবগাহন স্নানের আনন্দলাভ করেছেন ঔপন্যাসিক।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ইতিহাস চেতনা এই উপন্যাসটিকে একটি ভিন্নমাত্রা দেয়। টুকরো টুকরো কোলাজ মিলে জন্ম নিয়েছে এক অপরূপ চিত্রলিপি। তাঁর বাক্যতত্ত্বের নিজস্ব আবিষ্কারে রয়েছে অসাধারণ কুশলতার পরিচয়। নিজস্ব জীবনবোধের দ্বারা লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার প্রতিস্পর্ধী-গতির মাঝখানে সংগ্রামী মানুষ কেমনভাবে অলীক মানুষ হয়ে ওঠে তা-ই বর্ণিত হয়েছে। কেবল ফরাজি-ওয়াহাবী আন্দোলনই নয়, ব্রহ্ম আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের বিকাশ এবং এদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সবই ধরা পড়েছে লেখকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে। তাই—"হরিবাবু কাঁধে হাত রেখে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাই শফি! লোহাগড়ার কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। তবে যা হয়, মঙ্গলের জন্যই হয়। কৃষকদিগের ব্যাপারটা হল হড়কা বানের মতো। ওরা আদর্শ বোঝে না। বৈষয়িক স্বার্থ বোঝে। কিন্তু এই বিরাট কাজে আদর্শবাদেরই প্রয়োজন। আদর্শবাদ শিক্ষা ছাড়া গড়ে ওঠে না।"[৩৪] সেজন্যই তারা যোগদান করেছে স্বামীজি সংঘে। সেই সময়ে শফিউজ্জমানের অভিজ্ঞতা—"স্বামীজি সংঘের সদস্য হওয়ার পর একটা বিষয় লক্ষ করি ক্লাব ঘরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সাধু সন্ন্যাসী দিগের চিত্র লটকানো ছিল। সকলেই হিন্দু। মধ্যস্থলে দেবী কালিকার প্রকাণ্ড ছবিটির সামনে দাঁড়াইয়া সকল সদস্য কড়জোড়ে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া প্রণাম করে এবং অনুচ্চ স্বরে 'আমি দেশ মাতৃকার জন্য প্রাণবলিদানে প্রস্তুত' এই বাক্যটি মন্ত্রবৎ উচ্চারণ করা

হয়। ধর্মের প্রতি ঘৃণাহেতু প্রথম প্রথম সংকোচবোধ করিতাম। মুসলমান বংশজাত বলিয়া নহে। পড়ে এই প্রক্রিয়ার প্রতি সংকোচ কাটিতে থাকে। ...কিন্তু আশঙ্কা করিতাম, এই প্রক্রিয়া মুসলমানদিগের দূরে সরাইয়া রাখিবে।"[৩৫] মুসলমানরা কীভাবে নিজ সম্প্রদায়ের ব্রাত্যধর্ম নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তা শেষ দুই পঙক্তি থেকে বুঝতে পারা যায়।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসের লক্ষণীয় বিষয় হল গীতা, উপনিষদ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ধৃতি এবং প্লেটো, হোমার, হুগো, কীটস, বোদলেয়ার আরও আরও অনেক মনস্বী লেখকের প্রামান্য কিছু পঙক্তি। যদিও এগুলি এসেছে শফিউজ্জমানের সূত্র ধরেই। এছাড়াও রয়েছে দান্তের "ইনফারনো', কাফকারের 'মেটামরফসিস'-এর কথা। এরই সঙ্গে সহজ সহাবস্থান প্রাক ইসলাম যুগের আরব কবি জুয়াহের বিন্ আবসালমা এবং বৌদ্ধ দার্শনিক পকুধ কচ্চায়নের। শফি কচ্চায়নের অনুরাগী। সিরাজ তাঁর 'দীর্ঘনিকায়' গ্রন্থ থেকে নানা দার্শনিক উক্তি উপহার দিয়েছেন অলীক মানুষ উপন্যাসে। এই প্রাঞ্জল উদ্ধৃতিগুলি চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে একটি নতুন পথের অভ্রান্ত নির্দেশ দেয়। এখানে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি ভাষার নিপুন প্রয়োগকে কুর্নিশ জানাতেই হবে আমাদের। এখানে সৈয়দ মুজতবা আলির যথার্থ-উত্তরসূরি হয়ে ওঠেন সিরাজ।

উপন্যাসের অভিনবত্বের দিকটিও আমাদের মুগ্ধ করে। প্রতিটি পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে এক একটি নতুন শিরোনামে। আর আশ্চর্যের কথা এই নিশানা যেন গোটা অংশটির সারাংশ বা 'Synopsis'। কাহিনীর চারধারে পরিধিই যেন অঙ্কিত হয়ে যায়। তাই 'আরও একটি ব্যর্থতা' নামাঙ্কিত অংশে পাওয়া যায়—

"তবে বদিউজ্জমানের জীবনে এও আরেকটি ব্যর্থতা—তার নিজের কাছে।"[৩৬] কিংবা 'একটি কথোপকথন' অংশটি শুরু করে শেষপর্যন্ত নানা চরিত্রের মেলা। 'রক্ত তিলক' অধ্যায়টি শুরু হয়েছে এইভাবে—"বাংলা ১২২৯ সনের শুভ ১০ই বৈশাখ সন্ধ্যারাত্রে আমার প্রথম নরহত্যা।"[৩৭] 'স্তম্ভ ও নারী' শীর্ষক অংশে পাই বদিউজ্জমান ও মানতরত এক জেনানার কথা। 'স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ' অধ্যায়ে শফির অনুভব—"এক আশ্বিনের দিনে বৃষ্টিবাদলার শেষে ধূসর আলো-আঁধারে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপর সেই প্রথম নারী শরীরের স্বাদ পেয়েছিল।"[৩৮] —অলীক মানুষের এই ভিন্নতা সিরাজের ট্রাডিশন বহির্ভূত। এতদিনের অর্জিত গ্রাম, প্রকৃতি,

আদিমতার পরিমণ্ডল ভেঙে অলীক মানুষ এক নতুন প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। এই ত্রিবেণী সঙ্গম অবগাহন করেই সিরাজ স্বতন্ত্র পথের সন্ধান করেন। এই উপন্যাস নানা দিক থেকে তাই ব্যতিক্রমী বাসাবদল।

উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নারী আয়মনি আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জল। গ্রামীণ নারীর রক্ত রাঙা বুকের ব্যথা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। ফরাজি-ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবে গ্রাম-বাংলার রমণীরা তাদের আপন সত্তা লোকসংস্কৃতির ধারাকে বিসর্জন দিতে বসেছিল। আয়মনির মতো সাহসী মহিলা সেই ক্ষীণতোয়া ধারাটিকে পুনর্জীবিত করতে সহায়ক হয়েছিল। আর এক স্মরণীয় চরিত্র শফিউজ্জমান প্রকৃতি, নারী ও জীবনকে ভালোবেসে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছে—"নারীর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে নিরন্তর নারীর সঙ্গে স্পর্শে-সাহচর্যে বেড়ে উঠতে উঠতে তারপর সে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে।"[৩৯] কিন্তু একসময় নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট তাকে অচ্ছুত করে ফেলে। নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে প্রিয় একজগত; আবার তার আকুতি—"নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট এবং নারীর জরায়ু—শরীরের পৌরুষ্যের যৌবনের রক্তমূল্য দিয়ে সকল পেশির শক্তি দিয়ে হবে তার প্রত্যাবর্তন জনিত পুনরাভিষেক?"[৪০]

এই উপন্যাসে রয়েছে সিরাজের চিন্তার সূক্ষ্মতা, যুক্তির অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ। তিনি একটি বিলীয়মান গোষ্ঠীকে ঘিরে নিছক আবেগাপ্লুত অশ্রুপাত করেননি। শফি তাই কখনো কখনো সিরাজের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিয়েছে। তার চোখ দিয়েই সিরাজ সকলকে দেখেছেন। সচেতন যত্নে সংগৃহীত উপাদান ও উপকরণের সঙ্গত ব্যবহারে এই উপন্যাসে সিরাজ এক অভাবনীয় ধ্রুবতা দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবন দর্শন জনিত একটি বিষয় লক্ষ করা যায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নতুন আঙ্গিকের অন্যতম উপন্যাস হল 'আগুনের চারপাশ'। উপন্যাসে সিরাজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন গ্রাম গঞ্জে পার্টি পলিটিক্স কীভাবে সুস্থ জীবনের ফুসফুসে সংক্রামিত হচ্ছে; যাকে তিনি খরিস সাপের সাথে তুলনা করেছেন। খরিস এমন এক বিষধর্মী সাপ যার একটি ছোবলের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। লাউডগা সাপ হিস হিস করে হাওয়ায় ভেসে এক গাছ থেকে অন্যগাছে চলে যায়। গ্রাম গঞ্জের পার্টি পলিটিক্স হাওয়ায় ভেসে গ্রামের সুস্থ পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। আগুন এক অস্থিরতার প্রতীক। লেলিহান শিখার ভয়ংকরী রূপ। উপন্যাসে সিরাজ সাহেব নেতাদের ভয়ংকর লেলিহান রূপটিও দেখিয়েছেন।

উপন্যাসে নেতাদের যে বর্ণনা পাই তাতে গ্রামের নেতা অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী। গ্রামের জমিদারদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধকে উগরে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল গণতন্ত্রের মুক্ত আকাশ।

সিরাজের অন্যতম উপন্যাস 'নদীর মতন'-এ এক আশ্চর্য চরিত্র ধরিত্রী। পৃথিবী বদলে যাওয়ার মতোই সেও রূপান্তর এবং পরিবর্তনের আধুনিক প্রতিমা। ধরিত্রীর সব আছে—স্বামী আছে, সংসার আছে। কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। এসবের বাইরেও একটি জিনিসকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছে—সে হল তার স্বতন্ত্র, স্বাধীন জীবনবোধ। অথচ বাঁধা ধরা পথ ছাড়লেই পুরুষ শাসিত এই সমাজে নানা বাঁধা এসে হাজির হয়। আগাগোড়া সিরাজ কিন্তু ধরিত্রীকে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। ধরিত্রীর জীবনে নানা সংকট কীভাবে এল এবং কেমনভাবে গ্রামীণ স্বার্থজট তার ভাইকে উপলক্ষ করে আঘাত হানে—উপন্যাসের মূল আখ্যান সেটাই। আসলে ধরিত্রীর মতো মেয়েরা পুরুষের সংরক্ষিত কর্মচক্রে অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে অনেক সময় অর্জন করে নেয় নিজের অস্তিত্ব। ধরিত্রী কল্পনায় সিরাজের চরিত্রগুণের এখানেই চরিতার্থতা। ধরিত্রী পঞ্জাত দিদি হয়েও নারীত্বের মৌল প্রেরণা হারিয়ে ফেলেনি, সে প্রেরণা চিরন্তন ভালোবাসার। পার্টির উপরে মানুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্ন। 'বাবু দিদি' এই বিচিত্র অভিধার মধ্যে গ্রামসমাজ তার কর্মের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছে। ফুলশেখর আর বিপ্রশেখরের মাঝখানে নদীটি আসলে ধরিত্রীর প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের সাম্প্রতিক প্রতিনিধিরা কিন্তু টাইপ চরিত্র সমাবেশে ও একটা গ্রামীন আধুনিক দলাদলি—এসবের পটভূমিকায় ধরিত্রী চরিত্র-কল্পনা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে, যা উপন্যাসটিকে অন্যমাত্রা দান করে।

প্রকৃতি নিয়ে লেখকের মনোভাব ধীরে ধীরে বদলে গেছে। সিরাজ বুঝেছেন দ্বন্দ্বহীন প্রকৃতিই শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে মানুষের সকল দ্বন্দ্বের হেতু। রাঢ় ভূমির মহাশক্তি সিরাজকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'প্রকৃতি' তান্ত্রিকের চৈতন্যময়ী মহাশক্তি। গ্রামের মানুষজন, ঝোপের পাশের জীর্ণ কুঠির, নদীর তীর বেয়ে দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ, শ্মশান কবরস্থান—এসব নিয়ে একাধারে গ্রাম জীবনের প্রাচীন মনস্তত্ব, অন্যদিকে পরিবর্তিত গ্রামের ছবি সবই সিরাজের রচনায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক প্রাকৃত জনসমাজের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে তার 'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান' উপন্যাসটি। উপন্যাসে মুসলিম জনসমাজের

জাতপাত প্রথার কথা থাকলেও সিরাজ শেষপর্যন্ত উপন্যাসটিকে প্রেমের অনবদ্য আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। উপন্যাসটির বৃহত্তর পরিসরে গ্রাম-বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিকে লেখক তুলে ধরেছেন। একদিকে রাঢ় বাংলার তথাকথিত উচ্চবিত্ত পরিবারের ক্রমাগত বিপর্যয় ও পতন এবং অন্যদিকে রেবেকা ওরফে রুবি ও সানুর অন্তঃসলিলা। দুই মেয়ে আফসানা ও রেবেকাকে নিয়ে মবিন খন্দকারের সচ্ছল পরিবার। মেয়ে আফসানা টেনেটুনে বি.এ. পাশ করার পর সে মেয়েকে এক শ্যামবর্ণ বেঁটেখাটো গুঁফো রেজিস্টারের সাথে বিয়ে দেয়। রোকেয়ার জামাই পছন্দ ছিল না। রোকেয়ার ভাই ফজু মিয়াঁ তার সুন্দরী ফর্সা মেয়ের জন্য মানানসই পাত্রের সম্বন্ধ এনেছে। কিন্তু গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বে রোকেয়ার ইচ্ছার কথা মনেই চেপে রেখে দিতে হয়। কেননা খন্দকারের নজর ছিল উচ্চ খানদানের দিকে। খন্দকার এক প্রজন্মের প্রতিনিধি; যাঁর মধ্যে বংশগরিমা এবং ইসলামি কৌলীন্য প্রবলভাবে বহমান। দেশভাগের বিচ্ছেদরেখায় মুসলিম জনসমাজে মিয়াঁ-খানদানির সবকিছুই যে ভেঙেচুরে গেছে ভেতরে ভেতরে সেটাও প্রকাশিত। তিনি যে সময়ের মানুষ তাঁর চারপাশে তখন নতুন পৃথিবী গড়ে উঠতে শুরু করেছে। জমিদার প্রথা নিঃশেষ কিন্তু তার শেষ রেখাটুকু শ্বাস ফেলছে আকাশে বাতাসে। উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এই শ্রেণিচ্যুতির দ্বান্দ্বিক অভিঘাত। ফজু মিয়াঁ অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনস্ক, তিনি মনে করেছেন যে রক্ষণশীলতা আঁকড়ে থেকে কোনো লাভ নেই। অতএব পাল্টে-যাওয়া সমাজকে তিনি মেনে নিতে পেরেছেন। ঐতিহ্য রক্ষার সঙ্গে আধুনিকতা গ্রহণ হল সিরাজের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; যার প্রতিফলন এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় পড়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রেশমির আত্মচরিত’ উপন্যাসে পিতৃবন্ধু হিন্দু-পৌঢ়ের প্রতি মুসলমান যুবতী রেশমির পিতৃসুলভ সম্পর্ক, ধর্মশাসিত সমাজ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের মনোভাবের কথা উঠে এসেছে। রেশমি সচ্ছল বনেদি মুসলিম পরিবারে হয়ে উঠেছে। বাবা কাজী মোতাহার হোসেন নামজাদা উকিল এবং তহমিনা রক্ষণশীল পর্দাপ্রথায় বিশ্বাসী মহিলা। অবশ্য রেশমি তার মায়ের মত অন্তঃপুরে দিন কাটায়নি। বাবার ইচ্ছা আর প্রেরণায় সে শহরে কলেজে পড়াশোনা করে বি.এ. পাস করে। তবু অন্তর থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠা রেশমির জীবনের এই একুশটা বছরেও সম্ভব হয়নি। বিশেষত বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠায় স্বাধীন চলাফেরার

ওপরেও মায়ের বিধিনিষেধ চেপেছে অনেক বেশী। রেশমির এই নিস্তরঙ্গ জীবন যাপনে বিপুল তরঙ্গের অভিঘাত এনেছিল পিতৃবন্ধু একদা বিপ্লবী চিনু সামন্ত। কলেজে পড়ার উত্তাল দিনগুলিতে রাজনীতির অলিন্দে বহুবার নাম শোনা সেই মানুষটি কোনদিন যে সরাসরি এসে পড়বে তাদের নির্জনতায় ঘেরা বাড়ির মধ্যে তা স্বপ্নেও ভাবেনি রেশমি। চিনুকাকার অস্তিত্বের মধ্যেই রয়ে গেছে নিয়ম ভাঙ্গার মন্ত্র। সেই টানে রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের প্রচলিত নিয়ম তন্ত্রের অজান্তে অনেক রদবদল ঘটেছে। রেশমির আত্মকথনে উঠে এসেছে সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত—"একটা অদ্ভুত নিয়ম, দলিজ ঘরে কোন অতিথি এলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে না। আমি নিজে থেকেই যাই, তাতে মায়ের চাপা আর্তনাদ শুনে মনে হবে, সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে।"[৪১]

রেশমির মায়ের বিশ্বাস আল্লা মানুষ আর জিন সৃষ্টি করেছেন। মানুষ মাটি দিয়ে গড়া, জিনরা কিন্তু আগুন দিয়ে তৈরি। চিনুকাকার আগমনে এতোদিনের সেই আড়াল ভেঙে গেল শুধু তাই নয়; প্রথম সাক্ষাতে চিনু সামন্ত রেশমিকে বলেছে—"রেশমি! এস, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, সত্যি তুমি রেশমি কি না।"[৪২] রেশমি তথা তার মায়ের কাছে এই ঘটনা অভাবনীয়। সিরাজ তাই রেশমিকে দিয়ে বলেছেন—"আমি মুসলিম মেয়ে। আমার অঙ্গ স্পর্শ করা যায় না, শুধু স্বামী বাদে। আমি সাবালিকা হওয়ার পর বাবাও আর আমাকে স্পর্শ করেন না। কিন্তু এও যেন একটা বিপ্লব। আমার কাঁধে পর পুরুষের হাত। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে মনে ভাবছি, উনি তো আমার বন্ধু। আমার কাকু বলে ডাকার নিয়ম। অথচ উনি যে পরপুরুষ, এটা ভুলে যাই কি করে? আমার দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষ আমার কাঁধে যে হাতটা রেখেছেন, সেই হাত... একজন বিপ্লবীর হাত। কিংবদন্তি নায়কের এই হাত। কি অবিশ্বাস্য ঘটনা আমার জীবনে!"[৪৩] চিনুকাকুই রেশমির নারীজীবনে প্রথম দেখা পুরুষ। বাবা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ছাড়া জীবনে কোনো বাইরের পুরুষ মানুষকে সে এতো কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখেনি; দেখতে ইচ্ছেও করেনি। তিনিই রেশমির ধর্মবোধ ইশ্বর বিশ্বাস—সবকিছুকেই নতুনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

সিরাজ 'হিজল কন্যা' উপন্যাসে নতুন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগের কাঠামো তৈরি করেছেন। উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মাটির যৌবনের কাহিনী; তার সুখ-দুঃখ, স্মৃতি-স্বপ্ন। সেই

সাথে সিরাজ দেখিয়েছেন ইতিহাসের উদ্ধত রথের চাকায় অনেক সময়ই ব্যক্তি মানুষকে নির্মম বলি হতে হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন বহু দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষকে; কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলের বাঘিনী মেয়ে কদর আলীর মাকে দেখেছেন। সে বিশাল হেসো নিয়ে নেতৃত্ব দিত, মূলত মাটি নিয়েই সংঘাত। সিরাজ আত্মকথায় জানিয়েছেন—"হাতে বিরাট হেসো নিয়ে সে গর্জন করতো, যদি আমার তোনের (স্তনের) দুধ খেয়ে থাকিস ছেলেরা অক্তে আমার পা ধুয়ে দে! ...এই দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে আমি ভালোবাসতাম। তা পেতে চাইতাম। এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড়ো আদিম সেই জগত। ...সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা।"[৪৪]

এককথায় 'হিজলকন্যা' কথাটির অর্থ খারাপ মেয়ে, মতান্তরে বুনো বাঁ বনচরা মেয়ে। কিন্তু অন্য অর্থ পাওয়া যায় তা হল সাহসিনী। এখানে সাহসিনী স্বভাবের তিন হিজল কন্যাকে দেখতে পাই—রাহেলা, ফুলি এবং চুমকি। সিরাজের দেখা কদর আলির মার ছায়া আছে রাহেলার মধ্যে; যে হিজলের যুবকদের নেতৃত্ব দিয়েছে। তার সাহসের কথা গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে গেছে। গোরা সাহেব তাকে 'Brave mother' বলেছে। এই রাহেলার সাথে বড়ো বাড়ির ছেলে আব্বাসের প্রণয় ছিল; যদিও কুলমর্যাদার তফাৎ হওয়ায় বিয়ে হয় না। রাহেলা অভাব, অতৃপ্তি নিয়ে দিন কাটায়। অপরদিকে সজল শেখের কন্যা ফুলি বাঁ ফুলকি। এদেশে তখন ইংরেজ ব্যবসা শুরু করেছে; কোম্পানির প্রতিনিধি রবার্ট মোরেল এবং তার ম্যানেজার গ্রেগরি। অজান্তে রবার্ট ফুলিকে ভালোবাসে, তার দুরন্তপনা ভালোলাগে। কিন্তু গ্রেগরি শুধু হত্যা, শিকার, মদ্যপান ও নারী সম্ভোগ নিয়ে থাকতে চায়। তাই রবার্টের অনুপস্থিতে সে ফুলিকে কুঠিতে ধরে আনে। পরে রবার্ট এসে ফুলিকে উদ্ধার করে। অথচ ফুলির হাতে এক দাঙ্গার সময় রবার্ট নিহত হয়। উত্তেজনার বশে রবার্টকে মেরে ফেলে ফুলি যন্ত্রণায় নীড়হারা হয়েছে। শেষ হিজল কন্যা হিসেবে উপন্যাসে উঠে এসেছে চুমকির কথা। বেদের মেয়ে চুমকি ভালোবেসেছিল আকাশকে। চুমকির সাথে আকাশের মেলামেশা কেউ পছন্দ করে না। তাই চুমকি সুযোগ খুঁজে বেড়ায় কীভাবে আকাশকে করায়ত্ত করবে। সরল আকাশকে সে বলেছে এমন গন্ধলতার শেকড় এনে দেবে, যাতে জীবন সুখের হয়। আকাশ চুমকির সাথে গন্ধলতা খুঁজতে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে

দেহের রহস্যে ডুব দিয়েছে। সিরাজ রাঢ়ের মাটি নিয়ে লড়াইয়ের কথা লিখতে গিয়ে আসলে এইসব নারীদের বঞ্চনা আর যন্ত্রণার দিকগুলি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তির রূপকে কাল ও যুগকে তুলে ধরার পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন মিথ, লোকসংস্কৃতি, ব্রাত্যজীবনের কথা। এখানে স্থানিক মানুষজন জাগতিক ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতার টানাপড়েনকে ছাড়িয়ে যেন ব্রহ্মাণ্ডের মহাব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে জাগতিক দুঃখ, দৈন্য, হতাশা—গতিপ্রাপ্ত মানুষকে আটকে রাখতে পারে না। সে মানুষ ছোট সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্রের সাথে সম্পৃক্ত হতে হতে মহানন্দের পথে যাত্রা করে।

সিরাজ রচিত এই শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল ‘অলীক মানুষ’। উপন্যাসের বিষয়ভূমির কেন্দ্রে অবস্থান করেছে ফরাজি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণিত ধর্মগুরু বদিউজ্জমান। তাকে সামনে রেখেই বিষয়বস্তু ক্রমশ এগিয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সিপাহী বিদ্রোহ, ভারত ভাগের কথা। উপন্যাসটিতে মুসলিম জনসমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সুদীর্ঘকাল ভারতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা থাকার কথা সিরাজ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্য হীনমন্যতা বোধ এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পুনরায় তাদের গৌরবের উচ্চশিখরে পৌঁছানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় বদিউজ্জমান, তার বড়ো ছেলে নুরুজ্জামান, আব্দুল বারি চৌধুরী, বড়োগাজি, ছোটগাজি ইত্যাদি চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজের পাশাপাশি ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের ভাব-সংঘর্ষ, হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের কোণঠাসা করে রাখার জন্য মুসলমানদের মধ্যে দুঃখ-বেদনা ও অভিমানের কথা সিরাজ অকপটে বর্ণনা করেছেন। বদিউজ্জামানকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হলেও তার পরিবারের মধ্যেই ধর্মীয় আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে মতভেদের পাশাপাশি স্ববিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বদিউজ্জমানের ভাই ফরিদুজ্জমান এবং দুই ছেলে নুরুজ্জামান ও শফিউজ্জমান যেমন ভিন্ন পথের পথিক তেমনই বদিউজ্জমান চরিত্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি ধর্মীয় চাতুর্য,

কথা ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধিতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি মুসলিম ধর্মগুরু। তিনি পূর্ব বাংলার বিখ্যাত ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লার মুরিদ বা শিষ্য ছিলেন। এই ধর্ম মতের প্রতি তিনি এতই অনুগত ছিলেন যে নিজের সহোদর ফরিদুজ্জামান সুফি মজনুন হওয়ায় বদিউজ্জমান তা মেনে নিতে পারেননি। নিজের বড়ো ছেলে নুরুজ্জামানকে তিনি দেওবন্দের বিখ্যাত মাদ্রাসায় পড়িয়ে খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মৌলাহাটের অভিজাত মুসলমান ও নবাবী-এস্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী চৌধুরী আব্দুল বারির উৎসাহে তিনি ছোট ছেলে শফিউজ্জমানকে ‘দুশমন ইংরেজের খ্রিস্টানি এলেম শেখার জন্য হরিণমারায় পাঠায়। মেজ ছেলে প্রতিবন্ধী মনিরুজ্জমানকে নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য তিনি শফির জন্য নির্বাচিত কন্যা রুকুর সঙ্গে বিয়ে দেন। স্বেচ্ছা নির্বাসিত নিরুদ্দেশ শফিকে তিনি মৃত বলে মনে করতেন। অতিরিক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য যে বদিউজ্জমানকে খয়ড়াডাঙা ছাড়তে হয়েছে, তার মৃত্যুর পর অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তির ফলে তিনি নিজেই বদুপিরে পরিণত হয়ে যায়। আজীবন পির-পত্তির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলেও তিনি কিংবদন্তি আর লোককথার গুণে বলুপির থেকে অলীক মানুষ বা Mythical Manএ পরিণত হয়ে যান।

‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসে চরম বৈপরীত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বদিউজ্জমান ও শফিউজ্জমান চরিত্রে। শফি চরিত্রে নাস্তিকতা, অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে আত্মপীড়নকারী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় আসমার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক, সিতারার প্রতি আকর্ষণ, পান্না পেশোয়ারী, রেশমকুটীর অত্যাচারী মালিক স্ট্যালিন, অনন্ত নারায়ণ, কাল্লু, মুন্সি ও আব্দুর রহিমকে হত্যার ঘটনায়। স্বাধীনবালা ও রত্নময়ীর প্রতি তার আকর্ষণের মধ্যে সুক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারীর প্রতি শফির আদিম আকর্ষণ তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ফল মনে করা যায়। ঝড়ের রাতে মসজিদ থেকে কামনা পীড়িত অবস্থায় বদুপিরের সাইদার কাছে ফিরে আসা বা আব্দুলের বউ ইকরাতনের প্রতি আকর্ষণ পুত্র শফির চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তির রূপায়ণ উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

কুতুবপুরে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র জীবন যাপন, শফিকে নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করা, শফির হরিণমারায় ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়া, হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা, বারি চৌধুরীর শফিকে নিয়ে প্রফুল্লবাবুর আতিথ্যগ্রহণ, রত্নময়ীর বাবার আরবি-ফারসি প্রতি অনুরাগ, বাংলায়

উভয় শ্রেণির মানুষের জীবন যাত্রায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌভাতৃত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসটিকে সযত্নে সচেতনভাবে এপিকধর্মী বা মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যে ব্যালেন্স গ্রহণ করেছিলেন উপন্যাসে তাঁর সিদ্ধি ও সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায় চরিত্রগুলির বিচিত্র ঘটনা সমাহারের কোলাজের মধ্য দিয়ে।

ভালোবাসার সূত্রপাত ছায়ায় আর সমাপ্তি আলোয়। শফি একের পর এক হত্যায় জড়িয়ে পড়ছে আর প্রতিটি হত্যার ক্ষেত্রে তাকে প্ররোচিত করেছে কোনো না কোনো নারী। রোমান কবি ওভিদের বচন সে ভোলেনি; সে জানে হত্যার মতো কদর্য অপরাধ নদীর জলে ধোয়া যাবে না। শফি জানে এবার রত্নময়ীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। সত্যি ঘটনা যে উপন্যাসকে হার মানায় তা দেখানোর জন্য রত্নময়ী একখণ্ড কাগজ সেজবাতির আলোয় মেলে ধরে—

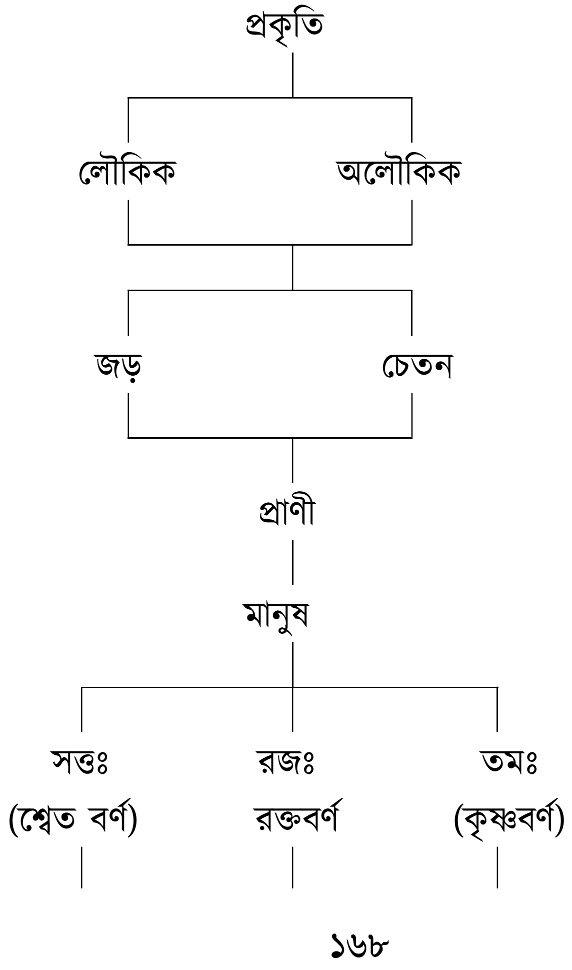

শাদা জিন আমি কালো জিন

এই কাগজ খণ্ডের মধ্যে ছিল রত্নময়ীর জীবনযন্ত্রণার ছবি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা এই দুইকেই সমমূল্য দিয়েছেন। ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নসাহিত্য কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে আগ্রহের কারণে সুদূর নয়। আবার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও মানুষের পট ও পটধৃত স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন করেছেন নিবিষ্ট মনে। সব মিলিয়ে তিনি মানববিদ্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর ভাবনার বিষয় মানুষ। জট-জটিলতা-গ্রন্থিল সম্পর্ক-সত্তার অবৈকল্য এবং বিকারে সে মানুষের যে বিপন্নতার মূর্তি—সেটাই সিরাজের কথাসাহিত্যের বিষয় হয়েছে। কথক বিশ্বের আঙ্গিকে রাঢ়ের মহাকাব্যিক প্রতিবেদন 'উত্তর জাহ্নবী'। মুর্শিদাবাদের শরীর জাপটে বয়ে চলেছে জহ্নুকন্যা, যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরাকথার যুগ নিঃশেষিত করে ইতিহাসের প্রাচীন যুগের পাঠ সমাপ্ত করে ইংরেজ উপনিবেশ ভারত গান্ধী ফরাজি ভাব আন্দোলন পাঠরত ভারতবর্ষের আধুনিক সময়স্বরকেও তিনি সফরসঙ্গী করেছেন। জহ্নু কন্যার অববাহিকা সংলগ্ন হিজলভূমির কথা যাত্রা এই 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাস। এই উপন্যাসটি একুশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, প্রত্যেকটির নামকরণের মধ্যে আখ্যান স্বরের স্তরগুলি পাঠকের সহজেই বোধগম্য হয়েছে।

'উত্তর জাহ্নবী'-র কথন বিশ্বে মূলত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর ঔপনিবেশিক গ্রাম ভারতকে কেমনভাবে দেখেছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন তারই কাহিনী। উপন্যাস কাঠামোয় লেখক নির্মমভাবে বিদেশী কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করে ও দেশীয় লোককথায় আখ্যান কাঠামোকে ব্যবহার করেছেন। একটা কাহিনী বলতে বলতে গল্পের প্রয়োজনে অন্য গল্পের সীমায় এখনও প্রবেশ ও প্রস্থান করেছেন। গ্রাম্য লোককথার আখ্যানের বোধকে সঙ্গী করে গ্রাম ভারতের মহাকাব্যিক আখ্যান এ উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। লোকগীতিকার মদন শেখের গানে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাঢ় বঙ্গের লোক-সংস্কৃতির নানাদিক পাঠক খুঁজে পায়। বাস্তবের সঙ্গে মিল-অমিল রেখে বক্তব্যগুলি লোকগীতিকার গলা থেকে ছড়িয়েছে। লোকগান, ছড়ায় উপন্যাসটির শরীরে গ্রাম্য সংস্কৃতির মূল কাঠামো পরিস্ফুট হয়েছে।

আজন্ম ইতিহাসের ঐতিহ্য বহন করে এখানকার মানুষ হিজলবন—আরোয়া জঙ্গল, জহ্নুকন্যা—বাঁকী নদী—স্রোতের স্নেহাদরে গ্রামপত্তনের উত্তরাধিকার পেয়েছে। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, গোবরহাটি, মধুপুর, বেলভাঙা, কোদালহাট, রাঙামাটি, ডাবকই, চাঁদপাড়া, যদুপুর আর অবশ্যই হাওড়া—আজিমগঞ্জ লোকাল মধ্যবর্তী রেলস্টেশন চিরোটিকে নিয়ে উত্তর জাহ্নবীর কাহিনির বিস্তার। অবশ্য এটি সিরাজের নিজস্ব গ্রাম চৈতন্যের ব্যক্তিভূমিও বটে। তাঁর শৈশব—কৈশোর—যৌবন যাপন যাত্রার কথা দিয়ে 'হিজল কন্যা', 'তৃণভূমি', 'অলীক মানুষ', কিংবদন্তির নায়ক' ও 'বন্যা' ইত্যাদি উপন্যাসে প্রকৃতির চেতনায় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ফতেপুর পরগণা থেকে আসা বিপত্নীক শ্রী গৌরাঙ্গবাবু বিধবা মেয়ে স্বর্ণলতাকে নিয়ে চিরোটি স্টেশন সংলগ্ন ডিসপেনসারিতে থাকে। হোমিওপ্যাথির ডাক্তার কোথাও ডাক পেলেই ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে পরে। সে চিরোটি স্টেশনের জন্মলগ্ন থেকেই সেখানকার বাসিন্দা। হেরু বাউরি সারাদিন রাস্তায়-মাঠে আটকে যাওয়া গরুর গাড়ি ঠেলে হাত খরচ চালায়। এই বাউরির ডাকাত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে উপজীব্য করে উপন্যাসের আখ্যানপথ বাঁক নিয়েছে। আরোয়ার জঙ্গল-বাঘ, সাপদের সহাবস্থানের মধ্যে বাউরি জাতিরা বাস করে। মূলত এখানে আদিম অধিবাসী, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, নর্ডিক জাতির মানুষেরা বাস করে। তবে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তফশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর মুসলমানদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সমস্বর—গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত, ফরাজি আন্দোলন বহুকৌণিক বক্তব্য আখ্যান সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। হিজল তৃণভূমির বন্য আবহে এখানে ইতিহাসের সমাজকথা পরিবেশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের একটি স্বীকারোক্তি গুরুত্বপূর্ণ—"জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশে সারা এলাকা জুড়ে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অনেকে দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষ ছিল, যাদের দু-চোখে ছিল হত্যার নেশা। ছেলেবেলা থেকে অনেক হত্যাকাণ্ড ও রক্ত দেখেছি। কথায় কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষি, বাগদি ও গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হতো। অবিকল যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে সশস্ত্র সৈনিকদের মতো তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হতো। মাঝে মাঝে মুখে হাত দিয়ে প্রচণ্ড রণ হুঙ্কার দিত আ-বা-বা-বা! রক্ত নেচে উঠত। তাদের মধ্যে মেয়েরাও ছিল।"[৪৫] রাঢ় ভূমির এই বন্যবোধ রঙ দিয়ে কথাকার এই উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে বর্ণময় করে তুলেছেন।

সিরাজের লেখা তিনটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'নিলয় না জানি' 'মায়ামৃদঙ্গ' ও 'অলীক মানুষ'। 'নিলয় না জানি' উপন্যাসটিতে তিনি আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন রাঢ় বাংলায় ব্যাপক যাতায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উপন্যাসটির মূল উপাদান হল সেই অঞ্চলের পির-ফকির দরবেশের বিচিত্র জীবনাচারন। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে লোকনাট্য আলকাপের সঙ্গে যুক্ত সিরাজের ব্যক্তিজীবন। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে ফিরে এসেছে পুনরায় পির-ফকির দরবেশের জীবনকথা। সুতরাং বলা যেতে পারে 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে যার সূচনা তার পরিণতি ঘটেছে 'মায়ামৃদঙ্গ' ও 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে। উপন্যাস তিনটিতে আখ্যানের ধারাবাহিকতা নেই বলে ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত না করা গেলেও তাদের মধ্যে উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিল লক্ষ করা যায়।

সিরাজ 'নিলয় না জানি' উপন্যাসটিতে সুফিবাদি সম্পৃক্ত আউলদের আধ্যাত্মিক জীবনাচরণের পাশাপাশি তার নিজের চলমান অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তিতারিত মানুষের জীবনের পরিণতি সমান্তরাল ভাবে বর্ণনা করেছেন। চিশতী মদনচাঁদ ফকিরের মেয়ে মরজিনা ও মখদুমী ফকির আবদুল্লার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, প্রেম-বিবাহ বিচ্ছেদ বেদনার করুণ রসে উপন্যাসটি অসাধারণ আস্বাদন যোগ্যতা লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে মুসলিম জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত আউল বা ফকির-ফ্যাঁকড়াদের জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা অসাধারণ দক্ষতার সাথে বর্ণিত করেছেন। সিরাজ উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়েছেন—"তখন রাঢ় বাংলায় জনপ্রিয় লোকনাট্য দল আলকাপের সঙ্গে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। দলের লোক আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখন আসরে আবেগে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনো বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অভাজন শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিই।"[৪৬] আজিমগঞ্জ নলহাটি লাইনের মরচে ধরা সেকালের রেলগাড়িতে দলবলের সাথে পাচন্দির মেলার আলকাপ গান গাইতে যাওয়ার পথে মদনচাঁদ ফকির ও আবদুল্লার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় লেখক তাদের গানের টানে, মদনচাঁদের আহ্বানে চলেগিয়েছেন ইন্দ্রা গ্রামে মাদার পিরের মেলায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রোববার মাদার পিরের একদিনের মেলায় গিয়ে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন উপন্যাসে তাই বর্ণিত হয়েছে। 'নিলয় না জানি' উপন্যাসের কতোগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—

১. লেখকের ব্যক্তিজীবনের পরিচয়;

২. দেশ-কালের কথা;

৩. সুফি দর্শন, আউল-বাউল, ফকির-দরবেশের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

৪. প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত গৌণ লোকধর্মের সাথে যুক্ত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষের জীবনের করুণ পরিণতি।

সিরাজ 'নিলয় না জানি' উপন্যাসটি রচনা করেছেন আত্মকথনের রীতিতে; কাহিনী বর্ণিত হয়েছে লেখকের নিজস্ব জবানীতে যার ফলে আলকাপ দলের নেমে বাঁশি ও হারমোনিয়াম বাজিয়ে নানা স্থানচারী মানুষ হলেও তিনি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"তুমি তো শুনেছ, আমি সৈয়দ বংশের ছেলে। আমার বংশ কিন্তু সুফি পীরবংশ।"[৪৭]

'নিলয় না জানি' উপন্যাসটির আখ্যানে রয়েছে ফকির, আউলদের কথা। আউল শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে সিরাজ জানিয়েছেন—"আগে ভাবতুম, আউল হয়তো বাউলেরই মুসলিম প্রতিশব্দ। কথাটা ভুল। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা একজাতেরই মানুষ। কিন্তু আউল কথাটি এসেছে আরবি ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পবিত্র মানুষ বা সাধু সন্ত। আবার আউল মানে আদি।"[৪৮] বাংলায় আউল-বাউল শব্দ দুটি একসাথে উচ্চারিত হলেও উভয়ের মত ও পথের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জরথ্রুষ্টিয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামি তত্ত্বের সংমিশ্রণে সুফিবাদের উদ্ভব। মুসলিম আউলের মতে আনাল হক অর্থাৎ সে নিজেই ঈশ্বর, নিজেই সত্য। আউলিয়াদের মতে আবার দুটি ভাগ রয়েছে চিশতী আর মখদুমি। চিশতীরা আজমীঢ় শরিফের খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর অনুগামি, মখদুমিরা খাজা বাবা মখদুম শাহের ভক্ত। চর্যার সাধন তত্ত্বে প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিবৃত্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা শবর-শবরী, ডোম্বী-কাঁপালি, হরিণ-হরিণী ইত্যাদি রূপকের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে; তেমনই মারফতি তত্ত্বেও বলা হয়েছে শবরূপে মহাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড 'কুল-মখ্‌খুলকাৎ' ভেসে আছে। তারমধ্যে সর্পবৎ বাসনার ডিম্ব। মদনচাঁদ ফকিরের মুখে ট্রেনে সোনা সেই গানটি মাদারপিরের মেলায় এসে লেখক পুনরায় শুনতে চাওয়ায় ফকির গেয়েছে—"তির পুনীর (ত্রিবেণী)? ঘাটেতে এক মরা ভাসতেছে/মরার বুকে সর্পের ডিম্ব/হরিণ চরতেছে। ভাইরে হরিণা চরতেছে/..."[৪৯]

আবদুল্লার প্রতি মদনচাঁদের মেয়ে বিবাহিতা মরজিনার প্রবল আকর্ষণ, মরজিনার স্বামী মনসুরের ক্রোধ, আবদুল্লার নারী বিদ্বেষী ঈশ্বর সাধনার মধ্যে এক রাত্রের ঘটনায় পদস্খলন, আবদুল্লা-মরজিনা জীবনের টানাপড়েন, আবদুল্লার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির ইঙ্গিতে গানটির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মদনচাঁদ ফকির এবং আবদুল্লার যৌথ আকর্ষণে লেখক ইন্দ্রাতে মাদার পিরের মেলা দেখার সুবাদে দরিদ্র ফকির মদনচাঁদের কুটিরে এসে তার অভাবের সংসারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পিরের মেলা হল ফকিরদের মিলন মেলা। আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলিম বা গাঁজার নেশায় আধ্যাত্মিক গান কীভাবে বিচিত্র জগত গড়ে তোলে তার বর্ণনা দিয়েছেন সিরাজ।

লোকজীবনের মূল সন্ধান করতে গিয়ে সিরাজ শুধু মারফতি ফকিরদের সংস্পর্শে আসেননি, লাভ করেছেন হিন্দু বাউল-বৈষ্ণবের সান্নিধ্য। তাই তিনি চেয়েছেন হরিপদ বাউলের বোস্টমি কাঞ্চনের পরিণতি। স্থূল লালসার কামনায় দগ্ধ হয়ে তার শেষ আশ্রয় হয়েছে শহরের বাগান বাড়ির পতিতা পল্লিতে। কাঞ্চন পতিতা, বারবনিতা আর মরজিনা নিজের ঘরকেই করে তুলেছে বারবনিতার গৃহ। লোকজীবন সন্ধানী লেখক হিন্দু মুসলমান দেহবাদী বাউল বৈষ্ণব, ফকির। দরবেশের আধুনিক যুগের বিলাস-বৈভব আর প্রচারের হাতছানিতে অদৃষ্ট হওয়ার করুণ পরিণতির ছবি অঙ্কন করেছেন 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে।

লোকনাট্য আলকাপের সঙ্গে সিরাজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে দুই ছোকরা শান্তি আর সুবর্ণকে নিয়ে। ছোকরা হল নারীরুপী কিশোর অভিনেতা। নাচ, গান, অভিনয়ে দক্ষ ছোকরা আসলে আলকাপ দলের মূল আকর্ষণ। ব্যাহিক অবয়বে তারা পুরুষ হলেও অন্তরে নারী। নারীদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না ঘটলে ছোকরার জীবন সার্থক হয় না। এই দলের সাথেই সিরাজ যৌবনের ছয়-সাত বছর কাটিয়েছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—"...আমার যা নিয়ে এবং যাদের সৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়ে এই উপন্যাস।"[৫০] এই উপন্যাসে সিরাজ তাঁর ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে তিনি আলকাপের উন্মেষ, গঠন ও তার পরিণত রূপের সার্থক প্রতিনিধি ওস্তাদ ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় সরকারের বিস্তৃত বর্ণনা করায় উপন্যাসটিতে মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন রাঢ় ও বাগড়ি অঞ্চলের সুপরিচিত লোকনাট্য আলকাপের

নামকরণ প্রসঙ্গে সিরাজ লিখেছেন—"আলকাপের পালার নাম 'কাপ'। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, সংস্কৃত মুল্লে কাপট্য থেকে কাপ-ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক। আর আল মানে মৌমাছি দের স্থূল, মধু খেতে গেলে হুলের জ্বালাও সহ্য করতে হবে।"[৫১] তিনি এই উপন্যাসে সমান্তরাল ভাবে দুটি কাহিনি বর্ণনা করেছেন। একটিতে উঠে এসেছে আলকাপের প্রবীণ ওস্তাদ ঝাঁকসু আর অন্যটিতে তরুণ মাস্টার সনাতনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

'মায়মৃদঙ্গ' উপন্যাসে ওস্তাদ ঝাঁকসু ও সনাতন মাস্টারকে নিয়ে সমান্তরাল ভাবে আখ্যান দুটি রচনা করা হয়েছে তার পটভূমি হল মুর্শিদাবাদ জেলার ভ্রাম্যমাণ লোকনাট্য আলকাপের দল। স্বাভাবিকভাবেই আলকাপের অনুসঙ্গ এই আলকাপের স্রষ্টা ও সৃষ্টি, আলকাপের গঠনরীতি, বিষয় কাণ্ড, আলকাপের বিভিন্ন মানুষজন, পরিবেশন রীতি ইত্যাদির পরিচয় থাকায় উপন্যাসটিতে আলকাপ তত্ত্ব, প্রয়োগ ও রস রূপে ধরা পড়েছে। ঝাঁকসুর জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে শান্তিকে নিয়ে আর সনাতনের জীবনের দোলাচলের মূলে রয়েছে সুবর্ণ চরিত্র।

কালুপাহারির কার্তিক সংক্রান্তির মেলায় চপওয়ালি গঙ্গামনি শান্তির বহু পত্নীক ঝাঁকসুর আকর্ষণে পালিয়ে আসে। কিন্তু ঝাঁকসু গঙ্গামনিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তার ঘরে রাত্রি বাস করলেও ছোকরা শান্তিকে নিয়ে রাত কাটায়। গঙ্গার প্রতি তার কোনো আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়না। গঙ্গা তাই ঝাঁকসুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে যাওয়ায় শান্তি পালিয়ে যায়। ঝাঁকসুর মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। শান্তি ঝাঁকসুর দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পড় গঙ্গামনির আত্মহত্যায় ঝাঁকসুর সন্দেহ তীব্র হয়ে ওঠে। আসলে আলকাপ দলের নারী বেশে সজ্জিত কিশোর বা দমনারিদের প্রতি দলের সকলের আকর্ষণের মধ্যে অবদমিত প্রচ্ছন্ন যৌন চেতনার বহিঃপ্রকাশ সমকামিতায় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রধানত 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে এই সমকামী যৌন চেতনার দিকটিকে আলকাপদলের শিল্প রীতির অনুসঙ্গে তুলে ধরেছেন।

অসবর্ণ ভালোবাসা বড়ো বিপদজনক—আর এর লেখ্য রুপ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে সুবর্ণ সনাতন মাস্টার আখ্যানের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। সনাতনের হাতের ছোঁয়ায় সাঁওটা পাড়া দলের আলকাপ হয়ে উঠেছে আধুনিক। সুবর্ণর কাছে নতুন মাস্টার সনাতন এক বিস্ময়ের বস্তু। দুজন অসমবয়সী পুরুষ মানুষের ভালোবাসা সনাতনের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। এই

দল ছেড়ে অন্যত্র চলে এসে চার পাঁচটা নতুন দলের কাছ থেকে মাস্টারির ডাক পাওয়া সত্ত্বেও আনিসের কথায় সনাতন পুরাতন দল বলে নয়, শুধু সুবর্ণর আকর্ষণে আবার সাঁওটা পাড়ার দলে ফিরে যায়।

সিরাজ 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে পির-ফকির পরিবেষ্টিত যে মুসলিম জন সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তার বিস্তৃতরূপ ফুটে উঠেছে 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটিতে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বদিউজ্জমান ওরফে বদুরুপিরকে অলীক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে কেবল মুসলমান সমাজের কথা বলা হয়নি, পাশাপাশি উঠে এসেছে ব্রাহ্মণ-হিন্দু সমাজের সংঘর্ষ, হিন্দু মুসলিম অধ্যুষিত বাঙালি সমাজে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমান দের কোণঠাসা করে রাখার জন্য মুসলমানদের মধ্যে দুঃখ-বেদনা ও অভিমানের কথা। বদিউজ্জমানের পরিবারের মধ্যেই ধর্মীও আচার-সংস্কার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে মতভেদের পাশাপাশি, স্ববিরোধের চিত্র নির্মিত হয়েছে। বদিউজ্জমান সহোদর ভাই ফরিদুজ্জামান, দুই ছেলে নুরুজ্জামান ও শফিউজ্জমান যেমন ভিন্ন পথের পথিক তেমনই বদিউজ্জমানের চরিত্রে বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের পাশাপাশি ধর্মীয় চাতুর্য, কথা ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধিতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তিন ছিলেন মুসলিম ধর্ম গুরু। তিনি পূর্ব বিখ্যাত ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লার মুরিদ বা শিষ্য ছিলেন।

উপন্যাসটিতে শরিফ আত্মগোপনের সুত্রে ব্রাহ্ম দেবনারায়ন রায়ের ব্রহ্মপুর ও ব্রহ্ম মন্দিরের মাধ্যমে ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কথা পাওয়া যায়। যামিনী বাবু, হরি বাবুর সূত্র ধরে ব্রহ্মপুরে গোপনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকালাপ শুরু হয়ে যাওয়া, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখিবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রয়াস উপন্যাসটি শুধু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়ায়নি, ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়কে অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বিশ্বস্ত রূপে বর্ণনা করেছেন। ঔপন্যাসিক সিরাজ 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটিকে সযত্নে সচেতন ভাবে মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী সিরাজ 'অলীক মানুষ' উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যে চ্যালেঙ্গ গ্রহণ করেছেন উপন্যাসে তাঁর সিদ্ধি ও সার্থকতার প্রমান পাওয়া যায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের বিষয়মাত্রা এবং শিল্পমাত্রা যেমন বিপুল তেমনই বৈচিত্র্যময়। যুগপৎ গ্রাম ও শহর জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন তেমনই আলকাপ দলে কাজ করা থেকে প্রথম শ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার) সাংবাদিকতা করা পর্যন্ত বহুমুখী কর্মজীবনের ব্যাপ্তি তাঁকে বিচিত্রগতি তাৎপর্যের উপন্যাস সৃজনে সাহায্য করেছে। নানামাত্রিক বিষয়কে শিল্প আঁধারে মূর্ত করে তিনি বহুমাত্রিক শিল্প ছাঁচ তৈরি করেছেন। উপন্যাসে ব্যঞ্জনাগর্ভ রীতির পাশ কাটিয়ে দেশজ-লোকজ ধাঁচে আখ্যান বিন্যস্ত করে উপন্যাস জগতে স্বতন্ত্র ধারাতে বিচরণ করেছেন। এখানে ছিল তাঁর সহজাত দক্ষতা। কাহিনীর সাথে রূপকথা-উপকথা-উপাখ্যান ধর্মকে সংযুক্ত করে এবং ছড়া-ধাঁধা-গান-শ্লোক ইত্যাদি লোক-সংস্কৃতির উপাদানকে অন্বিত করে রচনার দেশীয় ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি কাহিনীতে বহুধা গতি ও মানসিকতার জীবনভাবনা ও জীবনদর্শনকে তাঁর ভাববস্তুর কেন্দ্রভূমিতে রেখে সিরাজ তাঁর কথাসাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিটিকে পোক্ত করে গড়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি লেখকের সহানুভূতি জারিত হয়ে আনন্দ থেকে মহানন্দের পথের যাত্রী হয়ে মানুষের জন্য শিল্প—এ নন্দনতত্ত্বকে এক ধরে অসীমান্তিক ব্যাপ্তি দান করেছেন। এই ব্যাপ্তিতে তাঁর যুগপৎ গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের গল্পগুলিকে স্থানিকতার গণ্ডি ছিন্ন করে শিল্প ব্যাপ্তির বৃহত্তর ভুবনে উত্তরিত হয়েছে; যা সিরাজকে সমকালীন অন্য ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে।

বস্তুত, সিরাজের উপন্যাসে ঘটনার গতি-প্রকৃতি পাঠককে এক নির্মল আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনীর অন্তিমে কোনো সুখকর বা করুণ পরিণতি তিনি দেখাতে চাননি। মানব সম্পর্কের আলো-আঁধারি প্রদেশের জটিল অন্বেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের গঠন কৌশল নিপুণ, কোথাও বিদ্রূপ কোষমুক্ত তরবারির মতো ঝংকার তোলেনি। উপন্যাসের শিরায় শিরায় চাপা বিদ্রূপের আর্তনাদকেই লেখক বাস্তব ও সমকালীন জীবনের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন মণিমুক্তা রূপ ঘটনাকে; যা শিল্প মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে আমাদের মনে। কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনা শৈলী প্রচলিত ধরন থেকে যে পুরোপুরি আলাদা তা তাঁর উপন্যাসগুলির সূচনা বাক্যেই বোঝা যায়। সিরাজ আখ্যান নির্মাণের সব ধরনের মৌলিকতা, সময় ও পরিসরের ক্রম, কথক স্বরের বিন্যাস, বিভিন্ন চরিত্রের হঠাৎ আবির্ভাব ও কাহিনীর সাথে সংযুক্তি, বাচনিকতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে

যাতায়াতের যে কার্যকরণ সূত্র সব ভেঙে দিয়েছেন। আত্মকথায় সিরাজ লিখেছেন—"সাহিত্য লেখকের বাস্তব জীবনের সঞ্চিত ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়। আমার লেখার পেছনে কী ধারনা, কোনো দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপকরণ রয়েছে, এসব হল তারই সমীক্ষা। সম্ভবত অনেক লেখক লেখেন, জীবন সমাজ ইতিহাস ও সময় সম্পর্কে তাঁর একটা বলার কথা থাকে বলেই। আবার অনেক লেখক হয়তো নিছক দেখাদেখি লেখেন অর্থাৎ অনেকে যখন লিখেছে, আমি লিখি, কারণ, দেখা যাচ্ছে আমি লিখতে পারি। এই দ্বিতীয় শ্রেণির লেখকেরা স্বভাবসিদ্ধ—টেকনিক্যাল বা কারিগরি কুশলতাটা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ হল বক্তব্য। আমি নিজেকে বক্তব্যজীবী লেখক মনে করি। আত্ম-প্রকাশের ছলে কিছু কথা বলাই আমার লক্ষ্য।"[৫২]

তথ্যসূত্র

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল : 'লেখকের আগে লেখার সঙ্গে পরিচয়', দরবারী সাহিত্য, নববর্ষ ১৪০৯, পৃ. ১

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'বাসস্থান', আনন্দ, ১৯৮৫, পৃ. ১

৩. তদেব : পৃ. ২

৪. তদেব : পৃ. ৩

৫. তদেব : পৃ. ১৪

৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তখন কুয়াশা ছিল' (১ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ১

৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'মায়ামৃদঙ্গ' (২য় খণ্ড—ভূমিকা অংশ, ক), দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ১৬০

৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'মায়ামৃদঙ্গ' (২য় খণ্ড—ভূমিকা অংশ, খ), দে'জ

পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ১৬০

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘প্রেম-ঘৃণা-দাহ’, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭৫, পৃ. ১১

১০. তদেব : পৃ. ১২

১১. তদেব : পৃ. ১৩

১২. তদেব : পৃ. ২

১৩. তদেব : পৃ. ১৩

১৪. তদেব : পৃ. ৩৬

১৫. তদেব : পৃ. ৩৯

১৬. তদেব : পৃ. ১১৭

১৭. তদেব : পৃ. ৮৫

১৮. তদেব : পৃ. ১১৫

১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি’, ঐক্য, ২০১৩, পৃ. ৪০

২০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘মায়ামৃদঙ্গ’ (২য় খণ্ড—ভূমিকা অংশ, ক), দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ১৬০

২১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : ‘মায়ামৃদঙ্গ’, উপন্যাস সনগ্র-২, দে’জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ১৭১

২২. তদেব : পৃ. ১৬৬

২৩. তদেব : পৃ. ১৭১

২৪. তদেব : পৃ. ১৭০

২৫. তদেব : পৃ. ২০৪

২৬. তদেব : পৃ. ২০৪

২৭. তদেব : পৃ. ২০৪

২৮. তদেব : পৃ. ২৪৪

২৯. তদেব : পৃ. ২৬১

৩০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি', ঐক্য, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৪৫-৪৬

৩১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৭

৩২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'অলীক মানুষ', দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২

৩৩. তদেব : পৃ. ১০১

৩৪. তদেব : পৃ. ২৪২-২৪৩

৩৫. তদেব : পৃ. ২৪৩-২৪৪

৩৬. তদেব : পৃ. ১৫৭

৩৭. তদেব : পৃ. ১৭৯

৩৮. তদেব : পৃ. ১০৩

৩৯. তদেব : পৃ. ৯৯

৪০. তদেব : পৃ. ৯৯

৪১.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'রেশমির আত্মচরিত', উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৪৫১
৪২.	তদেব	:	পৃ. ৪৫২
৪৩.	তদেব	:	পৃ. ৪৫৩
৪৪.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি', ঐক্য, ২০১৩, পৃ. ৩০
৪৫.	তদেব	:	পৃ. ৩০
৪৬.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'নিলয় না জানি', উপন্যাস সমগ্র-৩, দে'জ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৪২৯
৪৭.	তদেব	:	পৃ. ৪৩৫
৪৮.	তদেব	:	পৃ. ৪৩৬
৪৯.	তদেব	:	পৃ. ৪৩০-৪৩১
৫০.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'মায়ামৃদঙ্গ', উপন্যাস সমগ্র-২, ভূমিকা অংশ, দে'জ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৬০
৫১.	তদেব	:	পৃ. ১৬২
৫২.	সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি', ঐক্য, ২০১৩, পৃ. ৩৫

উপসংহার

আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের বিভিন্ন দিক পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনায় যে প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে তা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের মর্মার্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে উপযোগী। সেই মর্মার্থ বিশ্লেষণে আমরা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রাঢ়ের সমাজ জীবন, প্রেম-প্রকৃতি-মানুষের চিত্রকল্প, মিথ-ইতিহাস, ব্রাত্য জীবন ও অন্যান্য বিষয়গুলি পেয়েছি। তাঁর উপন্যাসে এই বিষয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত বিরোধ চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, দৈনিক সংবাদ-পত্রের সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে 'আলকাপ' দলে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে উপন্যাসে।

সিরাজের লেখক জীবন শুরু হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে। উপমা, চিত্রকল্পের সাথে তাঁর গল্পভাষা হয়েছে কাব্যময়। সিরাজ নিজেই বলেছেন তিনি প্রকৃতির পাঠশালা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার কারণে হয়তো জীবনকে এতো সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। সঙ্গতি-অসঙ্গতি, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, ধার্মিকদের ভণ্ডামি, প্রেম-বাসনা, হিংসা-প্রতিহিংসা নিয়ে চিরকালের যে মানব জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তারই শিল্পরূপ উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক হিসেবেই খ্যাত। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপন্যাসের প্লট নির্বাচন করেছেন সামাজিক সমস্যা নিয়ে বা সভ্যতার আদি বিষয় কাম নিয়ে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসগুলি আকারে হয়েছে বড়ো; অনেক সময় বর্ণনা হয়েছে আবেগপ্রবণ বা পক্ষপাতযুক্ত। ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তিনি বাস্তব জগতকে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মুখের ভাষা অত্যন্ত বাস্তব ও চরিত্রানুকূল। কখনো কখনো তাঁর উপন্যাসে প্রতিবাদের ভাষাও লক্ষ করা যায়। লেখকের প্রতিবাদের মুখ ছিল; ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কমিউনিস্ট

দলের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন এবং এরই সূত্রে তিনি 'আলকাপ' দলের মধ্য দিয়ে সেই বার্তা প্রচার করতে থাকেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা এবং সর্বোপরি এক মানবিকতার বোধ অত্যন্ত সাবলীলভাবে মিশে গিয়েছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখেছি শিল্পী সিরাজ তাঁর জীবনের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই সেদিকটাও আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠে ঘাটে মেলায় পার্বণে ঘুরতে ঘুরতে সিরাজ আলকাপ দেখেছেন। বাঁশি বাজানো, অভিনয় করা থেকে অত্যাধুনিক 'কাপ' সৃষ্টিতে সিরাজ নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামকে ঘিরে সিরাজের মমত্ব মণ্ডিত ক্যামেরার চোখ একের পর এক ছবি তুলেছে। রূঢ় বাস্তবতার কর্দমাক্ত আভাসটুকু নয়, এখানে রয়েছে কল্পনার মধুর স্বরলিপিও। ফুটে উঠেছে লেখকের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। নির্জনতাও সেখানে কথা বলে ওঠে। মুর্শিদাবাদের নিসর্গ আর মানুষজন সূক্ষ্মতায়, স্থূলতায়, ভালো-মন্দ প্রকাশিত। সমকালীন সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে– "সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেরই বোহেমিয়ান হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। মনে মনে হলেও থাকে কেন না লেখক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর লেখালেখিতে আনে বৈচিত্র্য, আনে বর্ণময়তা, আনে ভিন্ন সুর। সেই প্রেক্ষাপটে স্মরণে রাখলে বাংলা ভাষার একজন সাহিত্যিক প্রকৃত অর্থেই ছিলেন বোহেমিয়ান, তিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।"[১]

সিরাজের উপন্যাস তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার এবং অনুভূতির আলোকে জারিত। অন্ত্যজ মানুষের হৃদয় অভ্যন্তরে যে কুটিল মানুষ বাস করে সিরাজ অনবদ্য দক্ষতায় সেই জটিল-কুটিল মানুষটিকে মূর্ত করেন তাঁর কথায়। আমরা গবেষণায় দেখেছি সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় হয়নি। তিনি বাংলার মানুষদের নিয়ে লিখেছেন; ঘটনাচক্রে তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান এই পর্যন্তই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদের চেতনাকে উসকে দেবার যে রাজনীতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি আজকের ভারতে, সিরাজের উপন্যাস তার বিষ-বাষ্প থেকে মুক্ত। আমরা যে মুসলমান সমাজের ছবি পাই তার পিছনের মানুষগুলির সুখ-দুঃখ তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য।

কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর উপন্যাসে যে জীবন সম্পৃক্ত প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন, তা রাঢ় বাংলার মানুষের দৈনন্দিন চোখে দেখা চিত্র। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের কথায়–"সিরাজ তার জন্মভূমিটিকে হাতের তালুর মতো চিনতেন। ডুব মেরেছেন লোকায়ত সংস্কৃতির গভীরে। এবং আমার মতে, সিরাজ-ই সেই বিরল কথাশিল্পীদের মধ্যে একজন, যিনি তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই ভারতটিকে, যে ভারতবর্ষ এদেশের কথাশিল্পে, কবিতায়, নাটকে নিজের মুখটি দেখানোর জন্য হাঁকুপাঁকু করছে।"[২] কথার বয়ানে মুর্শিদাবাদের অচেনা প্রকৃতিও চিরচেনা হয়ে উঠেছে।

গ্রাম থেকে নগর জীবনে এসে সিরাজ বুঝেছেন যে বাংলা সাহিত্যে গ্রামকেন্দ্রিকতা নেই বললেই চলে। সাহিত্যের উপকরণ হয়ে গেছে নাগরিক জীবন। তাই নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনি একটা লড়াই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এইজন্য সিরাজকে অনেকের অনেক উপহাস-উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে, জড়িয়েছেন অনেক তর্ক-বিতর্কে। কিন্তু তাঁর রচনার পাতায় পাতায় ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কথা। অনেক শিক্ষিত মানুষ মনে করেন গ্রাম মানেই চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' জাতীয় ব্যাপারে; আবার অনেকেই ভেবে থাকেন তারাশঙ্কর-বিভূতি তো লিখেই গেছেন, ওই যথেষ্ট। তাঁদের মতে গ্রামের বিষয়বস্তু মানেই অনাধুনিক ব্যাপার এবং গ্রামীণ চরিত্র মানেই আদিমতা ও সরলতা মিশ্রিত ব্যাপার, যা আধুনিক চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় না। এই প্রসঙ্গে সিরাজের বক্তব্য পরিধানযোগ্য–"প্রথমত, এঁরা সংবাদপত্রের সমকাল ও সাহিত্যের সমকালে গুলিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয়ত, এঁরা ভুলে যান যে সাহিত্যের মূল উপজীব্য মানুষ। যিনি সাহিত্যিক তিনি মনের দিক থেকে আধুনিক কিনা, তা-ই দেখতে হয়। বিষয় কী তা নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' গ্রামকেন্দ্রিক হলেও আধুনিক। শিল্পের আধুনিকতার সঙ্গে আদিম বা গ্রামীণ উপাদানের বস্তুত কোনো বিরোধ নেই। মানুষের সরলতা-আদিমতা, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আবার চারিত্রিক জটিলতাও তা-ই। গ্রামের মানুষ বা নিরাশার হলেই যে চারিত্রিক জটিল হবে না, একথা ভাবা ভুল। গেঁয়ো গাড়ল যেমন আছে, তেমন বিস্তর শহুরে গাড়লও আছে।"[৩]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লেখক হিসেবে নিজের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা জানি সাহিত্যে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধের প্রতিফলন ঘটে। সিরাজের সময়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি আন্দোলন হয়েছে, বিদেশ থেকে অনেক ভাবনা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। ফলে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি যা দেখেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন চিরকালীন মানুষের মন নিয়ে; সেটাই অভ্যন্তরীণ তাড়নায় লিখে গেছেন সিরাজ। তিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেছেন, প্রকৃতির কাছে গিয়েছেন; প্রকৃতিকে বুঝেছেন, সমাজের ময়লাগুলো ও দুঃখ শোক অনায়াসে শরীর-মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। সিরাজ জিম করবেটের লেখার ভক্ত; তাঁর একটি বইয়ে পড়েছেন–"হরিণী দেখল তার বাচ্চাকে বাঘে তুলে নিয়ে গেল। হরিণী কিছুক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাছের পাতায় মুখ দিল। এই নির্লিপ্তির পাঠ সিরাজ প্রকৃতি থেকে পেয়েছিলেন।"[৪] কিন্তু সিরাজ সরল প্রকৃতিবিলাসী ছিলেন না। তিনি প্রকৃতির ভয়াল রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের মধ্যেই। সিরাজ বুঝেছেন জীবন ও মৃত্যুর সব রহস্যের উৎস প্রকৃতি, অথচ জীবনের জন্য যেন তার কোনো করুণা নেই; মৃত্যুর জন্য নেই কোনো শোক, মানুষ তার কাছে অসহায়। তিনি মানুষের মধ্যেই প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের নানা রহস্য বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় গল্প আছে, ঘটনা আছে, চরিত্র আছে; সেই সাথে তাকে ঘিরে থাকে এক স্পর্শাতীত মায়াবলয়।

সিরাজকে কোনো বিশেষ ধর্মভাবনার খাপে ফেলা যায় না। ধর্ম নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি। যদিও সিরাজ ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে মাঝে মাঝে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের নিষ্ঠাশীল পাঠকরা জানেন ধর্মের ব্যাপারে সিরাজের মনে কিছুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। আসলে সিরাজ বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রথাগত ধর্ম, আচারগত ধর্মে তাঁর অনীহার কথা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হিন্দু পুরাণ ও শাস্ত্র, আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্র এবং ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে নিজেকে বহু সংস্কৃতির ধারক হিসেবে–সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তিনি বিখ্যাত মৌলানা বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। দাদু ছিলেন ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তিনি ধর্মপ্রচার করতেন। পিতাকে সিরাজ বলেছেন নাস্তিক। কিন্তু এগুলি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার; এর বাইরে সিরাজ পিতা ও পিতামহের কাছ থেকে

ধর্মের ব্যাপারে উদারতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিল্প-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন অবান্তর। তিনি বলতে চেয়েছেন, লিখতে চেয়েছেন মানুষের কথা। 'আত্মকথা'-য় সিরাজ জানিয়েছেন–"ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনে। লেখক হিসেবে আমি চরিত্র বেছে নেই দরকার অনুযায়ী। হিন্দু মানুষ মুসলমান মানুষ কিছু বুঝি না। মানুষ বুঝি। এই দেশের মানুষ। তাদের ঘনিষ্ঠভাবেই চিনি। আমার কোনো শুচিবায়ু নেই। মানুষ আমার কাছে শুধু প্রকৃতির সন্তান।"[৫]

সিরাজের লেখা সম্পর্কে অভিযোগ আছে যৌনতার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সর্বদাই সিরাজ সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রশংসাই করেছেন এবং তাঁর বইয়ের আলোচনায় ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত উদার। সিরাজ নিজেও সেকথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে বলেছেন–"আমার উত্তর জাহ্নবী উপন্যাসটা সুনীল নিজে সমালোচনা করেছিল, ফুল পেজ। খুঁটিয়ে পড়েছিল। যথার্থ সমালোচনা। তবে শেষে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। লিখেছিল, উপন্যাসের স্বর্ণ চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুনীল যখন প্রশংসা করে, এরকমই করে থাকে। খুবই বড়ো হৃদয়।"[৬] সিরাজ তো রক্তের কথা শুনেছেন অবাক হয়ে; যা শুনেছেন তা লিখেওছেন। ফরমায়েশ মতো যৌনতা আমদানি করা বা বই বিক্রি করার জন্য যৌন সুড়সুড়ি অপ্রাসঙ্গিকভাবে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া–নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে এই আপোষ তিনি করেননি। সিরাজের লেখায় যৌনতার চিত্রময় বিবরণ নেই। তাঁর বেলাগাম হবার পুরো সুযোগ ছিল, কিন্তু হননি। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে কিশোর শফির সঙ্গে যুবতী আসমার মিলনের কথাও সিরাজ সংক্ষিপ্ত বয়ানে উপস্থাপিত করেছেন–"সেই প্রথম নারী শরীরের ভিন্ন এক স্বাদ পেয়েছিলাম। ছটফটে, কোমলতায়, দৃঢ় শ্রমজীবী গ্রামীণ এক যুবতীর শরীর কেন্দ্র করে আনাড়ি, অবোধ এক বিস্ফোরণ মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।"[৭]

বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান সাম্প্রদায়িকতা–ধর্মীয় বিদ্বেষ রয়েছে, রয়েছে একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ। হিন্দু সমাজে সমস্যাটা খুব প্রকট হলেও মুসলমান সমাজ বিশেষ পিছিয়ে নেই, আশরাফ আতরাফ বিরোধ মাঝে মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়ায়। বিষয়টি ব্যথিত করতো সিরাজের মন ও মননকে। এর প্রতিবিধানের জন্য আকুল হতেন তিনি। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান ছিলই। একা কতটুকুই বা করতে পারেন। তবু

হতাশ হননি। সাধ্যমত করেছেন। তাঁর গল্পে উপন্যাসে দরিদ্র, হতভাগ্য মানুষ ঘুরে ফিরে এসেছে। এ আসলে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য জায়মান কিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। সিরাজের মনে হয়েছিল উচ্চবর্ণীয় সমাজ স্বার্থান্ধ। মানুষে মানুষে যদি সত্যকার বন্ধন রচনা করতে হয় তবে নিম্নবর্গকে আশ্রয় করতে হবে বিশেষ করে।

উত্তর পলাশীর যুদ্ধপর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজ এক বিশেষ রকমের সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। বহুদিনের বহু চেষ্টার সূত্র ধরে বিশ শতকের সূচনায় এই সংকটের নিরসনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা নতুন করে নষ্ট হয়ে যায় দেশভাগ ও বঙ্গ বিচ্ছেদের সূত্রে। বাঙালি মুসলমান সমাজে সেদিন যেসব আলোকিত মনন ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় চলে যান ওপার বাংলায়। এপার বাংলার মুসলমান সমাজে তখন শুধুই অন্ধকারের ছড়াছড়ি। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা মোটের উপর তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এই অবস্থায় নতুন করে যাত্রা শুরু করার দায়িত্ব যারা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সিরাজ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শুরুটা করেছিলেন এম আব্দুর রহমান, মোহম্মদ আবদুল বারি-র মতো কয়েকজন। তাঁরা তাদের মতো করে করছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। যে প্রতিভা থাকলে এমন অচল অবস্থা থেকে একটা জাতির জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বার করে আনা যায় সেই প্রতিভা তাদের ছিল না। সিরাজে এসে সমস্যার সমাধান হল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সিরাজ সিদ্ধান্ত করছিলেন আলাদা করে বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্য কোনো সাহিত্যাদর্শ রচনা করে লাভ নেই, যেটা করতে চেয়েছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নজিবর রহমান এর মতো সাহিত্যিক সমাজ। তিনি মুসলমান সমাজের কথা বলার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর, অন্য অর্থে আপোষহীন। কিন্তু তার জন্য নিজের চলার ক্ষেত্রকে কখনো সীমায়িত করে নেননি। মুসলমান সমাজের পাশাপাশি অমুসলমান সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রসারিত হয়েছে তাঁর কলম। আর সে কারণে অন্য সকলকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন অদ্বিতীয়।

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

আকর গ্রন্থ :

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৫।

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১৫।

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ২০১৫।

৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : তৃণভূমি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪০৩।

৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম (করুণা) সংস্করণ, বইমেলা, ১৯৯৮।

৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : স্রোতে ভেসে আছি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৫।

৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : অলীক মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪।

৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-

৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উত্তর জাহ্নবী, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নীল ঘরের নটী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ : ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : হিজলকন্যা, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৩, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রাণীঘাটের বৃত্তান্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : জিরো জিরো নাইন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৯৯।

১৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : একালের বাংলা গল্প, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫।

১৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নির্বাচিত রচনা, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : প্রেমের প্রথম পাঠ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-

০৭, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রোড সাহেব, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০ প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

২০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সোনালী আঙুরগুচ্ছ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

২. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৮।

৩. আলম, মাহবুবুল : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১০।

৪. আলম, মোঃ জাহাঙ্গীর : বাংলা উপন্যাসে খল নর ও নারী চরিত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।

৫. আল, হেলাল বশীর : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা (বাংলাদেশ), দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

৬. আহমদ, ওয়াকিল : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৩।

৭. আচার্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

৮. ইমরান, মাসউদ (সম্পা.) : ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

৯. ইসলাম, আমিনুল : বাঙালি দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মার্চ, ২০১১।

১০. ইসলাম, ড. সা'আদুল : বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০০৩।

১১. ঈগলটন, টেরী : মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা, দীপায়ন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০০৮।

১২. খান, লায়েক আলী : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র,

সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০০।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন : রাজনীতির অভিধান, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৩।

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : লাল মাটি, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : বইমেলা, ১৯৯৮।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : টেনিদা সমগ্র, সংকলন ও সম্পাদনা-প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৪০৫।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : বাংলা গল্প-বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪০১।

১৮. গোস্বামী, অচ্যুত : বাংলা উপন্যাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৯. গোস্বামী, অঞ্জন : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

২০. গুপ্ত, রবীন্দ্র : উপন্যাস জিজ্ঞাসা, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ২৮

আগস্ট ১৯৯৫।

২১. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-১, গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০২।

২২. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-২ গ্রন্থ নিলয়, দ্বিতীয় সংস্করণ : ৮ আগস্ট, ২০০১।

২৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৩, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম সংস্করণ : ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

২৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৪, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০০২।

২৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৫, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

২৬. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর : (প্রথম খণ্ড কথাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প এবং তত্ত্ব), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৭।

২৭. ঘোষ, মহুয়া : হুতোম প্যাঁচার নকশা : নকশার আরশিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮।

২৮. ঘোষ, বিশ্বজিৎ : বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০২।

২৯. ঘোষ, তপোব্রত : শ্রীবিলাসের ডায়ারি, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৩০. ঘোষ, শঙ্খ
আচার্য, নির্মাল্য (সম্পা.) : সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৫।

৩১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০০।

৩২. চন্দ্র, অরূপ (সম্পা.) : বাংলার হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ এবং মুর্শিদাবাদ, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৩. চন্দ্র, অরূপ : মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের কালপঞ্জি, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৪. চন্দ, বীরেন : বিষয় : বাংলা উপন্যাস (সংযোন খণ্ড), উত্তরধ্বনি, ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

৩৫. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, বর্ণালী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

৩৬. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষন, পুস্প, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯।

৩৭. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার : বাংলা সাহিত্যে মা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৩।

৩৮. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পা.) : শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০৩।

৩৯. চক্রবর্তী, রামী : মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৪০. চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

৪১. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পা.) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১৩ (ব.)

৪২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.) : বুদ্ধিজীবীর নোটবই পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৪৩. চক্রবর্তী, ড. শংকরপ্রসাদ : বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্ব (১৯৪২-১৯৪৭), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৪৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল : সাহিত্যের রুপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

৪৫. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-০৯, এপ্রিল, ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

৪৬. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, নবেন্দু (সম্পা.) : অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩।

৪৭. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর : বন্দর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২।

৪৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ : বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬।

৪৯. চট্টোপাধ্যায়, বিমলভূষণ : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬।

৫০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব : শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১৬, পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৮।

৫১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (সম্পা.) : তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেও, বঙ্গীয়

সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাস পূর্ণিমা, ১৪০৭।

৫২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩।

৫৩. চৌধুরী, অজিত : উপনিবেশের হেজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে, অবভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮।

৫৪. চৌধুরী, ড. সুবোধ : সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৮।

৫৫. চৌধুরী, সুশীল : নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৫৬. জাহান, সারোয়ার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূল্যায়নের পালাবদল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

৫৭. ঝা, শক্তিনাথ : আলকাপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৫৮. ঝা, শক্তিনাথ : ঝাঁকসু লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

৫৯. দে, আশিস কুমার : শৈলী ও শৈলী বিজ্ঞান, ভাষা পত্রিকা, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।

৬০. দে, আশিস কুমার : সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

৬১. দত্ত, উত্তম : বর্ণমালার দিব্যি, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬।

৬২. দত্ত, সম্রাট : আখ্যান ব্যাখ্যান ও গদ্যচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দোলযাত্রা, ২০১৭।

৬৩. দত্ত, সম্রাট : বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৬৪. দত্ত, সরোজ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৬।

৬৫. দত্ত, সরোজ : কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

৬৬. দত্ত, বীরেন্দ্র : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৬৭. দত্ত, বিজিতকুমার : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

৬৮. দত্ত, ভবতোষ : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

৬৯. দত্ত, ভবতোষ : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫।

৭০. দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২।

৭১. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.) : স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

৭২. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.) : সৈয়দ খালেদ নৌমন, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

৭৩. দাস, বেলা চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পা.) : বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

৭৪. দাস, সীমারেখা : নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৭৫. দাস, বেলা : বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯।

৭৬. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ : যুগ বদলে বাংলা উপন্যাসে রূপবদল, দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৭৭. দাশগুপ্ত, রাহুল : আখ্যানের দুনিয়া, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১০।

৭৮. দেবী, অনুরূপা : মা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩২১।

৭৯. দেবী, মহাশ্বেতা : অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩১৫।

৮০. নন্দী, রতনকুমার : অরণ্যের অধিকার মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮১. পাল, রবিন : উপন্যাসের উজানে, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭।

৮২. পাল, রবীন : উপন্যাস দ্য ও পাশ্চাত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১১।

৮৩. পাল, প্রশান্তকুমার : রবি জীবনী (সপ্তম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭।

৮৪. ফেরদৌসি, আব্দুর রহমান : মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র : মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড

কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৯।

৮৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : অন্তর্বয়ন : কথা সাহিত্য, একুশে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০।

৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৮৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭২।

৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৩।

৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০ মে, ১৯৯৬।

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।

৯৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতীম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪

৯৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. দেবদ্যুতি : কথাসাহিত্য প্রকরণ, বি. বি. কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৯৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৯৬. বিশ্বাস, ড. মাধুরী : উপন্যাসের কথা : নির্মাণের নতুনরীতি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

৯৭. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : দেশভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদ চরিতাভিধান, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৯. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদে মন্বন্তর, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০০. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : রবীন্দ্রনাথ ও মুর্শিদাবাদ, ছাপাখানার গলি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

১০১. বিশ্বাস, সর্বাণী : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম

প্রকাশ : ২০০৭।

১০২. বেরা, নলিনী : শবর চরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

১০৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন : ইতিবৃত্তে চণ্ডালজীবন, প্রিয়শিল্প প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০৪. বসু, নির্মলকুমার : হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯।

১০৫. বসু, বুদ্ধদেব : রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩।

১০৬. বসু, নৃপেন্দ্রকুমার : ফয়েডের নারী চরিত্র, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮।

১০৭. বসু, বুদ্ধদেব : সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ২০০০।

১০৮. বসু, স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : ২০১৪।

১০৯. বসু, ড. দেবকুমার : কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৪।

১১০. ভদ্র, গৌতম
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) : নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৪, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮, সপ্তম

মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

১১১. ভদ্র, গৌতম : নিসর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৮।

১১২. ভদ্র, গৌতম : ইমান ও নিশান, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

১১৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

১১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দীপাবলী, ২০১০।

১১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৪১২।

১১৬. ভট্টাচার্য, তপপাধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৭।

১১৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : বাখতিন, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০২, এবং মুশায়েরা সংস্করণ আগস্ট, ২০০৯।

১১৮. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন : তারাশংকর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরজশাহ রোড, নতুন দিল্লি-০১, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১১৯. ভট্টাচার্য, বীতশোক : কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৯০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

১২০. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১২১. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন : বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১২২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের আলো আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

১২৩. ভট্টাচার্য, দেবাশীষ : বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিমবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১২৪. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশনাথ : মনোবিদ্যা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭০।

১২৫. ভট্টাচার্য, বিজন : জনপদ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫২।

১২৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০।

১২৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

১২৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৩।

১২৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৪।

১৩০. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৫, তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১২।

১৩১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৩।

১৩২. মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তরুণ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ স্মরণে, চিন্তনে, মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ (ব.)

১৩৩. মুখোপাধ্যায়, জগমোহন : গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

১৩৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১৩।

১৩৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : প্রাক-পলাশী বাংলা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২।

১৩৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০১।

১৩৭. মুখোপাধ্যায়, অশোক : সংসদ বানান অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

১৩৮. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : দুখে কেওড় চরিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০২।

১৩৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্র-জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৯ম মুদ্রণ, ২০১৫।

১৪০. মুখোপাধ্যায়, উর্বী
চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা.) : বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৪১. মুখোপাধ্যায়, উর্বী : অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৬।

১৪২. মুখোপাধ্যায়, সুখময়	:	বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮।
১৪৩. মণ্ডল, তুলসীচরণ	:	আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১৪।
১৪৪. মণ্ডল, সেলিম বক্স	:	বস্তুবাদী সাহিত্যপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।
১৪৫. মণ্ডল, বরেন্দু	:	লিটিল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্ত, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৭।
১৪৬. মণ্ডল, চিত্ত	:	নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬।
১৪৭. মণ্ডল, উৎপল মজুমদার, কামনা (সম্পা.)	:	মহাশ্বেতার গল্প : মহাশ্বেতার সন্ধানে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।
১৪৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার	:	পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তাক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯৮।
১৪৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার	:	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ৩০ শ্রাবণ, ১৩৪৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

১৫০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রুপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩।

১৫১. মজুমদার, কমলকুমার : অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৩।

১৫২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

১৫৩. মান্না, গুণময় : বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাজিক, ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৫।

১৫৪. মুরশিদ, গোলাম : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ : জলাই, ২০১৫।

১৫৫. মিশ্র, বাণীপ্রসন্ন : আবহমান বাঙালি প্রত্যাহ্বান ও প্রত্যনুসন্ধান, গ্রন্থিক, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

১৫৬. মিশ্র, ভগীরথ : মৃগয়া (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

১৫৭. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ : মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

১৫৮. মিত্র, কাশীকান্ত : গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী, রবীন্দ্র লাইব্রেরী,

কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৫।

১৫৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র : ঘনাদা সমগ্র-১, সম্পাদনা-সুরজিৎ দাশগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২।

১৬০. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ : ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১৬১. রায়, অপূর্ব কুমার : শৈলী বিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৬।

১৬২. রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৯।

১৬৩. রায়, অলোক (সম্পা.) : সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১০।

১৬৪. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালিন বাংলা কথাসাহিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

১৬৫. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং,

কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী, ২০০১।

১৬৬. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

১৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, প্রথম বর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৬।

১৬৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০০।

১৬৯. রায়চৌধুরী, লাভলী মোহন : ইতিহাস নানাবিধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১৭।

১৭০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১৭১. রশীদ, ফকির আব্দুর : সুফী দর্শন, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

১৭২. রহমান, ড. শাহীদা : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকারচেতনা, সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

১৭৩. শ, ড. রামেশ্বর	:	আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।
১৭৪. শ', ড. রামেশ্বর ও শ', হেনা (সং, ও সম্পা.)	:	আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৪ শে নভেম্বর, ২০০৮।
১৭৫. সেন মজুমদার, জহর	:	উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।
১৭৬. সরকার, পবিত্র	:	কথা সুত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১০।
১৭৭. সামন্ত, সুবল (সম্পা.)	:	বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অধীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১১।
১৭৮. সেন, দীনেশচন্দ্র	:	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।
১৭৯. সেন, নব্যেন্দু (সম্পা.)	:	পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, রত্নাবলী,

৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৯।

১৮০. সেন মজুমদার, জহর : উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।

১৮১. সেন, অঞ্জন : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, সিংহ, উদয়নারায়ন (সম্পা.) কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০১০।

১৮২. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৮, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ : মার্চ, ২০০৩।

১৮৩. সান্যাল, অরুণ (সম্পা.) : প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

১৮৪. সেন, অভিজিৎ : রহু চণ্ডালের হাড়, জে. এন. চক্রবর্তী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১৮৫. সিকদার, অশ্রুকুমার : ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৬. সিকদার, অশ্রুকুমার : সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৭. হাজরা, দিলীপ : বাংলা উপন্যাসের পালাবদল, বঙ্গীয় সাহিত্য,
বর্মন, অমিতকুমার সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

১৮৮. হাসান, জাহিরুল : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ, পূর্বা, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১৮৯. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৯০. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯১. হাসান, জাহিরুল (সম্পা.) : বিশ শতকের বাঙালি প্রতিভা, মডেল পাবলিশিং হাউস, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৯২. হাসান, মইনুল : আধুনিকতা ও বাংলার মুসলমান সমাজ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪১৭।

১৯৩. হারুণ, শরীফ : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৯।

১৯৪. হারুণ, শরীফ : অস্তিত্ববাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

১৯৫. হোসেন, সোহরাব : বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৪।

১৯৬. হোসেন, সেলিনা : স্বদেশে পরবাসী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

১৯৭. হোসেন, সৈয়দ আকরাম : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯৮. হালিম, মোঃ আব্দুল : দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৩।

১৯৯. হাশমী, তাজুল ইসলাম : ঔপনিবেশিক বাঙলা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৫।

২০০. হাবিব, ইরফান : মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি (৬৫০-১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ), এন. বি. এ. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১১, অনুবাদ : শুভাশিস ঘোষ।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

1. Abrams, M.H. : A Glossary of literary Terms, Sixth Edition, Prism Books Pvt. Ltd, Bangalore, Harcourt Brace & Company.

2. Baba, Homi : Unsatisfied Notes on vernacular compolitanism, Text and Nations : cross Disciplinary Eassays on culturar and National Identities, ed-laura Garcia, Columbia, Sc Camden house, 1996. (www.google.com)

3. Bhattacharji, Sukumari : Myth, Progressive Publishers, Kolkata, Reprint: January, 2018.

4. Baker, Emilie Kip : Stories of old Greece and Rome, New York the Macmillan Company, USA, 1913.

5. Bakthin, Mikhail : 'The Dialogic imagination : Four Eassays', Edt, by Michael Halquist, University of texas Press, Austin and London, 1981, p.366. (www.google.com)

6. Bhartiya (Ed.), Santosh : Dalit and Minority Empowerment, Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2008.

7. Butcher, S. H. : Aristotle's theory of poetry and fine art, (Translated with Kalyani Publishers, New Delhi. 2, critical notes by) Reprinted, 2012.

8. Cuddon, J. A. : The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, New Delhi-11, Reprinted, 1999.

9. Dutt (Ed.), KC : Who's Who of Indian Writers 1999 Vol.2, Sahitya Akademi, New Delhi, 1999.

10. Das, Suranjan : Communal Riots in Bengal 1905-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991.

11. Deen, Hanifa : The Crescent and the Pen: The Strange Journey of Taslima Nasreen, Praeger Publishers, USA, 2006.

12. Forster, F. M. : Aspects of the Novel, Penguin Books, England, Reprinted, 1964.

13. Gupta, Bishan Kumar : Political Movements in Murshidabad 1920-1947, Manisha Granthalaya, 1992.

14. Gastrell, JE : Statistical and Geographical Report of the Moorshedabad District, Bengal Secretariat Office, 1860

15. Glynn, Sarah : Class, Ethnicity and Religion in the Bengali East End : A Political History, Manchester University Press, UK, 2014.

16. Hayat, Abul : Mussalmans of Bengal, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2008.

17. Ikram, S. M. : Indian Muslims and Partition of India,

Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1992.

18. Karim, Abdul : Murshidkuli khan and His Times, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2011.

19. Levi-Strauss : MYTH AND MEANING, SCHOCKEN BOOKS NEWYORK, Foreword Copyright @ 1995.

20. Santosh, de Sousa : Towards a New legal common sense, 2nd Edt. Lexis Nexis Butterworths, London, 2002. (www.google.com)

পত্র-পত্রিকা :

১. অন্য একলব্য : ২০১৩ (জানুয়ারি-মার্চ)

২. অমলকান্তি : ২০১২ (জুলাই)

৩. অর্কেস্ট্রা : ২০১৩ (অক্টোবর, সিরাজ সংখ্যা)

৪. অর্কেস্ট্রা : ২০১৩ (ফেব্রুয়ারি, সিরাজ স্মরণ)

৫. আজকাল : ২০০৩ (২৫ আগস্ট)

৬. আজকাল : ২০১৭ (২০ সেপ্টেম্বর)

৭. আজকাল : ২০১৭ (রবিবাসর, ২২ অক্টোবর)

৮. বইয়ের দেশ : ২০১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)

৯. এই সময় : ২০১০ (এপ্রিল)

১০. ঐক্য পত্রিকা : ২০১৩ (অক্টোবর, বিশেষ সংখ্যা)

১১. সমকালের জিয়নকাঠি	:	২০১৩ (জুলাই-ডিসেম্বর, বিশেষ সংখ্যা)
১২. সান্ধ্য ভাষা	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৩. প্রতিক্ষণ	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৪. দেশ	:	১৯৯৩ (২৪শে এপ্রিল)
১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
১৬. আমার সময়	:	২০১০ (এপ্রিল)
১৭. এবং সংস্কৃতি	:	২০১৬ (জুলাই)
১৮. এবেলা	:	২০১৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি)
১৯. সকালবেলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
২০. নিউজ বাংলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন	:	অলীক মানুষ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১০৯
২. মিশ্র, ভগীরথ	:	মায়া কুসুমের ছায়ানরকেরা, রোববার প্রতিদিন, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ২০
৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	নির্বাচিত রচনা, পুনশ্চ, ২০০৬, পৃ ১৯
৪. দত্ত, হর্ষ	:	বইয়ের দেশ, অক্টোবর ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ ১৩৫
৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	আত্মকথা, সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৩, পৃ ৩৫
৬. দত্ত, হর্ষ	:	বইয়ের দেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ ১৩৮
৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা	:	অলীক মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ ১০৯

পরিশিষ্ট-১

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনপঞ্জি

নাম	-	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।
পিতার নাম	-	সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি।
মাতার নাম	-	আনোয়ারা বেগম।
১৯৩০	-	জন্ম : খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ (১৪ অক্টোবর)।
১৯৪৪-৪৬	-	স্কুলজীবনেই বাম ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।
১৯৪৬	-	ম্যাট্রিক পাস গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়, বর্ধমান।
১৯৪৯	-	সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'আমার বাউল বন্ধুরা' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ।
১৯৫০	-	স্নাতক—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ। 'ইবলিশ' ছদ্মনামে প্রথম গল্প 'কাঁচি' প্রকাশিত হল বহরমপুরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'শেষ অভিসার' কবিতা প্রকাশিত।
১৯৫০-৫৬	-	ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং আলকাপ লোকনাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত।
১৯৫৬	-	শ্রীমতি হাসনে আরা বেগমের সঙ্গে পরিণয়। স্ত্রীর প্রেরণায় সাহিত্যকর্মে মনোযোগী।
১৯৫৯	-	প্রথম পুত্র অভিজিতের জন্ম।
১৯৬২	-	'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন'।

১৯৬৪	-	কলকাতায় বসবাস শুরু।
১৯৬৪-৬৯	-	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখপত্র ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত।
১৯৬৬	-	প্রথম উপন্যাস ‘নীল ঘরের নটী’ প্রকাশিত নবপত্র প্রকাশনের উদ্যোগে।
১৯৬৯	-	আনন্দবাজার পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধাদি রচনা শুরু।
১৯৭১	-	আনন্দবাজার-এর বার্তা বিভাগে স্থায়ী চাকরিতে যোগদান।
১৯৮০	-	আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে চার মাসের জন্য আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে যোগদান।
১৯৯০	-	‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের জন্য ‘ভুয়ালকা পুরস্কার লাভ।
১৯৯৩	-	সাংবাদিকতার পেশায় অবসর গ্রহণ।
১৯৯৩-৯৮	-	সাহিত্য আকাদেমির বাংলা বিভাগে উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য।
১৯৯৪	-	‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের জন্য দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বঙ্কিম পুরস্কার’-এ সম্মানিত।
১৯৯৬	-	আমেরিকার হিউস্টনে অনাবাসী বাঙালি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান।
১৯৯৮-২০০৪	-	জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত।
২০০৮	-	আই. আই. পি.এম-এর তরফে ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের জন্য

আন্তর্জাতিক ‘সুরমা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত।

২০০৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ‘ডি. লিট’ খেতাবে সম্মানিত করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

২০১০ - শিশু-সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত। কেন্দ্রীয় সরকারের রবীন্দ্র জন্মসার্ধশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যপদে মনোনীত।

২০১১ - কেন্দ্রীয় সরকারের স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্য পদে মনোনীত।

২০১২ - প্রয়াণ কলকাতার নাইটিঙ্গেল হাসপাতাল (৪ সেপ্টেম্বর)। শেষকৃত্য জন্মভূমি খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর।

পরিশিষ্ট-২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রন্থতালিকা

নং গ্রন্থের নাম	প্রকাশন/প্রকাশনী	প্রকাশকাল
১. নীল ঘরের নটী	নবপত্র প্রকাশন	১৯৬৬
২. পিঞ্জর সোহাগিনী	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৬
৩. আসমানতারা	নিরীক্ষা প্রকাশনী	১৯৬৬
৪. নিশিলতা	বার্ণিক প্রকাশনী	১৯৬৭
৫. হিজলকন্যা	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৭
৬. প্রেমের প্রথম পাঠ	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৭
৭. কিংবদন্তীর নায়ক	কথাশিল্পী	১৯৬৯
৮. বন্যা	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৬৯
৯. নিশিমৃগয়া	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৭০
১০. জলতরঙ্গ	বিচিত্রা প্রকাশনী	১৯৭০
১১. তৃণভূমি	রূপরেখা	১৯৭০
১২. জোয়ারের দিন	হরফ প্রকাশনী	১৯৭০
১৩. কামনার সুখদুঃখ	প্রফুল্ল গ্রন্থালয়	১৯৭১

১৪. ছায়া পড়ে	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৭১
১৫. একদা অরণ্যে	হরফ প্রকাশনী	১৯৭১
১৬. এখন অন্ধকার	হরফ প্রকাশনী	১৯৭১
১৭. সবুজ নক্ষত্র	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭১
১৮. বনকরবী	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭১
১৯. নিষিদ্ধ প্রান্তর	অনন্য প্রকাশন	১৯৭১
২০. কলকাতার কেঁদো	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭২
২১. এক বোন পারুল	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭২
২২. মায়ামৃদঙ্গ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭২
২৩. সীমান্ত বাঘিনী	সাহিত্যিকা	১৯৭২
২৪. নির্বাসনের দিন	দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ	১৯৭২
২৫. অন্ধ ত্রাস	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭২
২৬. বিমূর্ত পাপ	রামায়ণী প্রকাশনী	১৯৭৩
২৭. আমাজনের অরণ্যে	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৩
২৮. অসবর্ণ	প্রকাশ ভবন	১৯৭৩
২৯. উত্তরজাহ্নবী	প্রকাশ ভবন	১৯৭৪
৩০. মা নিষাদ	সাহিত্য প্রকাশ	১৯৭৪

৩১. হাঙর	পুস্তক প্রকাশনী	১৯৭৪
৩২. গোপনে নির্জনে	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৪
৩৩. কেন ভালোবাসা	রূপরেখা প্রকাশনী	১৯৭৪
৩৪. নীল শূন্য	জ্যোতি প্রকাশনী	১৯৭৫
৩৫. নান্টুমামার গাড়ি	অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস	১৯৭৫
৩৬. একালের বাংলা গল্প	রামায়ণী প্রকাশনী	১৯৭৫
৩৭. সোনার পিতলমূর্তি	পূর্ণ প্রকাশন	১৯৭৫
৩৮. গোয়েন্দা কর্ণেল	প্রফুল্ল গ্রন্থাগার	১৯৭৫
৩৯. জানালার নীচে একটা লোক	অন্তরা প্রকাশন	১৯৭৫
৪০. কিছু অলৌকিক	পুস্তক প্রকাশনী	১৯৭৫
৪১. প্রেম ঘৃণা দাহ	রবীন্দ্র লাইব্রেরী	১৯৭৫
৪২. বিবাদী বাগ	অনন্য প্রকাশন	১৯৭৫
৪৩. বনের আসর	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭৫
৪৪. আনন্দমেলা	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭৬
৪৫. নৃশংস	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৬
৪৬. নিলয় না জানি	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৬
৪৭. নীল ঘোড়া	সৌরভ প্রকাশনী	১৯৭৬

৪৮. তোমার বসন্ত দিনে	আশা প্রকাশনী	১৯৭৬
৪৯. বিষাক্ত সুন্দর	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭৬
৫০. জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর গন্ধ	বঙ্গবাণী প্রকাশনী	১৯৭৬
৫১. হলুদবাংলো	শরৎ পাবলিশিং হাউস	১৯৭৭
৫২. বহুবর্ণ	পাত্রজ পাবলিকেশনস	১৯৭৭
৫৩. হেমন্ত ও বনশ্রী	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৭
৫৪. সোনালী আঙুরগুচ্ছ	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৮
৫৫. বিভ্রান্ত	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স	১৯৭৮
৫৬. সে এক অদ্ভুত দ্বীপ	পত্রলেখা	১৯৭৮
৫৭. অনুসন্ধান	স্বরলিপি	১৯৭৮
৫৮. নিঝুমরাতের আতঙ্ক	দে’জ পাবলিশিং	১৯৭৯
৫৯. কনকচাঁপা	দেব সাহিত্যকুটির	১৯৭৯
৬০. অমৃত ছিল না	মিত্র ও ঘোষ	১৯৭৯
৬১. স্বপ্নের মতো	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬২. টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬৩. ভয়ভুতুড়ে	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬৪. কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮০

৬৫. সংশপ্তক	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮০
৬৬. নির্জন গঙ্গা	প্রকাশ ভবন	১৯৮০
৬৭. মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া ভূত	মুখার্জী ব্রাদার্স	১৯৮০
৬৮. আগুনের চারপাশে	করুণা প্রকাশনী	১৯৮০
৬৯. অলৌকিক চাকতিরহস্য	মুখার্জী ব্রাদার্স	১৯৮১
৭০. রোডসাহেব	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮১
৭১. মাকাসিকোর ছায়ামানুষ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮১
৭২. কালো বাক্সর রহস্য	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮২
৭৩. স্বপ্নের নিচে দাঁড়িয়ে	মৌসুমী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৪. কোদণ্ডের টঙ্কার	নির্মল বুক এজেন্সি	১৯৮৩
৭৫. অরূপরতন	প্রকাশ ভবন	১৯৮৩
৭৬. এক যে ছিল পায়রা	পক্ষীরাজ প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৭. জীবনসঙ্গিনী	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৮. ম্যাজিশিয়ান মামা	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৯. রূপ রস গন্ধ	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৮০. আপন ঘর	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৮১. পেছনের আততায়ী	মালিনী প্রকাশনী	১৯৮৩

৮২. তিন বসন্ত	সাহিত্যম	১৯৮৪
৮৩. অশরীরী ঝড়	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৮৪
৮৪. অকাল মৃগয়া	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮৪
৮৫. রাজপুত্র মন্ত্রী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৪
৮৬. নদীর মতন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৪
৮৭. ওয়াগন ব্রেকার	সংবাদ প্রকাশন	১৯৮৪
৮৮. বিপজ্জনক ১১	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৮৯. তখন কুয়াশা ছিল	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৯০. বাসস্থান	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৯১. মড়া যদি জ্যান্ত হয়	গীতাঞ্জলি প্রকাশনী	১৯৮৫
৯২. ফাগুনে আগুন	যুগ প্রকাশনী	১৯৮৫
৯৩. কিশোর ভৌতিক অমনিবাস	কামিনী প্রকাশন	১৯৮৫
৯৪. কালো পাথর	আদিত্য প্রকাশনী	১৯৮৫
৯৫. কালো মানুষ নীল চোখ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৫
৯৬. বসন্ততৃষ্ণা	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৬
৯৭. হাট্টিম রহস্য	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৬
৯৮. সবুজ ভবনের ভয়ঙ্কর	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৬

৯৯. তখন অনেক রাত	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৮৬
১০০. সাহারার সন্ত্রাস	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৮৬
১০১. ওজরাকের পাঞ্জা	নির্মল বুক এজেন্সি	১৯৮৬
১০২. মোতিবিবির দরগা	শরৎ পাবলিশিং হাউস	১৯৮৬
১০৩. হায়েনার গুহা	মুখার্জী পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৪. একদা বর্ষার রাতে	জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৫. গল্পসমগ্র ১ম	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৬
১০৬. রানীরঘাটের বৃত্তান্ত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৭. দারুব্রহ্মকথা	রেণুকা	১৯৮৭
১০৮. বিশাখা তোমার নামে	এস আই এন্টারপ্রাইজ	১৯৮৭
১০৯. বিবর্ণ অর্কিড	অমৃতধারা	১৯৮৭
১১০. কালো গোখরো	জগদ্ধাত্রী প্রকাশনী	১৯৮৭
১১১. গল্পসমগ্র ২য়	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৭
১১২. গোপন সত্য	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৭
১১৩. স্বর্গের বাহন	শশধর প্রকাশনী	১৯৮৭
১১৪. বলে গেছেন রামশন্না	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৭
১১৫. প্লাবন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৭

১১৬. গোয়েন্দা কর্ণেল	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৮
১১৭. সবুজ সঙ্কেত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৮
১১৮. হেমন্তের বর্ণমালা	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৮
১১৯. অলীক মানুষ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৮
১২০. অমর্ত্য প্রেমকথা	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮৮
১২১. বসন্তরাতের ঝড়	মডার্ণ কলাম	১৯৮৯
১২২. রাতের দরজা	প্রত্যয় প্রকাশনী	১৯৮৯
১২৩. কাগজে রক্তের দাগ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৪. রহস্য রোমাঞ্চ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৫. ছয় নায়িকা	সাহিত্যম	১৯৮৯
১২৬. কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৭. এখন এই সময় (সম্পাদিত)	ক্রান্তিক	১৯৮৯
১২৮. ছবির মানুষ	সাহিত্য সংস্থা	১৯৮৯
১২৯. নিষিদ্ধ অরণ্য	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৯
১৩০. জানমারি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৯
১৩১. কালের প্রহরী	জগদ্ধাত্রী প্রকাশনী	১৯৮৯
১৩২. সোনার ঠাকুর	শশধর প্রকাশনী	১৯৮৯

১৩৩. রেশমীর আত্মচরিত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৪. এককুড়ি ভূতের গল্প	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯০
১৩৫. অপারেশন রেড হেরিং	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৬. কর্ণেলরহস্য অমনিবাস	করুণা প্রকাশনী	১৯৯০
১৩৭. খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯০
১৩৮. পিছনে পায়ের শব্দ	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৯. আমার প্রিয় গল্প	মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স	১৯৯০
১৪০. ভালুক ভায়া আর ভুণ্ডু নাপিত	শিশু পাঠভবন	১৯৯০
১৪১. বিষাক্ত সুন্দর ফুল	মডার্ণ কলাম	১৯৯১
১৪২. ইভনিং ভিলা	মিত্র ও ঘোষ	১৯৯১
১৪৩. কিশোর গোয়েন্দা অমনিবাস	পুনশ্চ	১৯৯১
১৪৪. অ্যাডভেঞ্চার অমনিবাস	নন্দিতা পাবলিশার্স	১৯৯১
১৪৫. কঙ্কগড়ের কঙ্কাল	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৬. নটী নয়নতারা	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯২
১৪৭. জনপদ জনপদ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৮. আসমানতারা	নাথ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৯. কর্ণেলের তিন রহস্য	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯২

১৫০. আসমানতারা	নাথ পাবলিশার্স	১৯৯২
১৫১. রহস্যভেদী কর্ণেল	ছন্দম প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং	১৯৯২
১৫২. ভূত নয় অদ্ভুত	কামিনী প্রকাশনালয়	১৯৯২
১৫৩. বেদবতী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৫৪. নগ্ন নির্জন হাত	মডার্ণ কলাম	১৯৯২
১৫৫. ভূত বনাম গোয়েন্দা	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৩
১৫৬. তিন নক্ষত্র	সাহিত্যম	১৯৯৩
১৫৭. কর্ণেল সমগ্র ১	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৫৮. সেরা কিশোর কর্ণেল রহস্য	অসীম প্রিন্টার্স	১৯৯৪
১৫৯. শ্রেষ্ঠ গল্প	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬০. নাগমিথুন	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৪
১৬১. রূপবতী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬২. মুসলিম চিত্রকলার আদি পর্ব এবং অন্যান্য	মিত্র ও ঘোষ	১৯৯৪
১৬৩. জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর ঘ্রাণ	প্রত্যয় প্রকাশনী	১৯৯৪
১৬৪. কোকোদ্বীপের বিভীষিকা	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬৫. ভালোবাসা	মডার্ণ কলাম	১৯৯৪
১৬৬. কর্ণেল সমগ্র ২	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪

১৬৭. গল্প সমগ্র ৩	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৪
১৬৮. কুয়াশার রং নীল	অপর্ণা বুক ডিপো	১৯৯৫
১৬৯. কর্ণেল সমগ্র ৩	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭০. স্বর্ণচাপার উপাখ্যান	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭১. একান্ত গোপনে	মডার্ণ কলাম	১৯৯৫
১৭২. হনিমুন লজ	নাথ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭৩. সেরা বারো	রূপা প্রকাশনী	১৯৯৫
১৭৪. কর্ণেল সমগ্র ৪	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭৫. ডমরু ডিহির ভূত	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৬
১৭৬. অপারেশন এক্সফাইল	দেব সাহিত্য	১৯৯৬
১৭৭. গল্পসমগ্র ৪	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৬
১৭৮. তৃণভূমি	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৬
১৭৯. কর্ণেল সমগ্র ৫	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৬
১৮০. কবরের অন্ধকারে	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৯৭
১৮১. জিরো জিরো নাইন	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৭
১৮২. লাল সাগরের আতঙ্ক	পুষ্প প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৩. প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৭

১৮৪. কর্ণেল সমগ্র ৬	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৭
১৮৫. নিষিদ্ধ প্রান্তর	ভাষা ও সাহিত্য	১৯৯৭
১৮৬. ভূতের গল্প ভয়ংকর	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৭. হিকরি ডিকরি ডক রহস্য	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৮. রোডসাহেব ও পুর্বাসন	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৮
১৮৯. সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৮
১৯০. ইনস্পেক্টর ব্রহ্ম	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৮
১৯১. কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৮
১৯২. কালো নেকড়ে	সাহিত্যম	১৯৯৮
১৯৩. অকাল মৃগয়া	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৯৯
১৯৪. কর্ণেল সমগ্র ৭	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৯
১৯৫. কর্ণেল সমগ্র ৮	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৯
১৯৬. কর্ণেলের চার রহস্য	পত্রভারতী	১৯৯৯
১৯৭. কর্ণেলের নাম নন্দনকানন	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৯৯
১৯৮. সব ভূত অদ্ভুত	বসাক বুক স্টোর	১৯৯৯
১৯৯. কিশোর রহস্য সম্ভার	সূর্য পাবলিশার্স	১৯৯৯
২০০. স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	মডেল পাবলিশিং	১৯৯৯

২০১. কর্ণেল সমগ্র ৯	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০২. কর্ণেলের এক ডজন	পত্রভারতী	২০০০
২০৩. থ্রিলার সপ্তক	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৪. সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৫. কর্ণেল সমগ্র ১০	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৬. প্রেমের নিষাদ	পুষ্প প্রকাশনী	২০০০
২০৭. বাহান্ন ভূতের গল্প	পুষ্প প্রকাশনী	২০০০
২০৮. ছায়ার আড়ালে	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	২০০০
২০৯. মুখোশের রঙ লাল	অঞ্জলি প্রকাশনী	২০০০
২১০. গোপনে নির্জনে	এডুকেশন ফোরাম	২০০০
২১১. কর্ণেল সমগ্র ১১	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২১২. দশটি উপন্যাস	করুণা প্রকাশনী	২০০০
২১৩. তারা অশরীরী	দে'জ পাবলিশিং	২০০১
২১৪. কর্ণেলের ৫ রহস্য	পত্রভারতী	২০০১
২১৫. আততায়ী পাশেই ছিল	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০১
২১৬, স্বনির্বাচিত সেরা বারো	বিকাশ গ্রন্থভবন	২০০১
২১৭. হিজল কন্যা	সৃষ্টি প্রকাশন	২০০১

২১৮. কর্ণেল সমগ্র ১২	দে’জ পাবলিশিং	২০০১
২১৯. অদ্বিতীয় কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০২
২২০. অদ্ভুত যত ভূত	সৃষ্টি প্রকাশন	২০০২
২২১. গল্প সমগ্র ৫	করুণা প্রকাশনী	২০০২
২২২. উপন্যাস সমগ্র ১	দে’জ পাবলিশিং	২০০২
২২৩. উপন্যাস সমগ্র ২	দে’জ পাবলিশিং	২০০২
২২৪. থ্রিলার পঞ্চম	দে’জ পাবলিশিং	২০০৩
২২৫. কর্ণেলের অভিযান	শৈব্যা পুস্তকালয়	২০০৩
২২৬. অশরীরী ঝড়	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৩
২২৭. তিতলি পুরের জঙ্গলে	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৩
২২৮. উড়ো পাখির ছায়া	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০৩
২২৯. একডজন কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০৩
২৩০. নায়িকার ভূমিকায়	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০৪
২৩১. বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তর অভিযান	শৈব্যা প্রকাশন	২০০৪
২৩২. কর্ণেল ৩	দেবসাহিত্য কুটির	২০০৪
২৩৩. কর্ণেলের একদিন	দে’জ পাবলিশিং	২০০৪
২৩৪. নীল শূন্য	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৪

২৩৫. সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত	শৈব্যা প্রকাশন	২০০৪
২৩৬. ভৌতিক গল্পসমগ্র	পত্রভারতী	২০০৪
২৩৭. রেনবো অর্কিড রহস্য	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	২০০৪
২৩৮. সিন্দুক ও প্রতিমা রহস্য	পত্রভারতী	২০০৪
২৩৯. আশ্রয়	এ পি পি	২০০৪
২৪০. রাজার ঘাটের উপাখ্যান	অপর্ণা বুক	২০০৪
২৪১. কর্ণেলের তিনটি রহস্য	পত্রভারতী	২০০৫
২৪২. আরও এক ডজন কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০৫
২৪৩. পাঁচটি রহস্য উপন্যাস	পত্রভারতী	২০০৫
২৪৪. লালুবাবুর অন্তর্ধান রহস্য	দে'জ পাবলিশিং	২০০৫
২৪৫. মেঘের পরে রোদ	অপর্ণা বুক	২০০৫
২৪৬. স্রোতে ভেসে আছি	করুণা প্রকাশনী	২০০৫
২৪৭. পঞ্চাশটি গল্প	দে'জ পাবলিশিং	২০০৭
২৪৮. কথামালা ১	কারিগর	২০১২

পরিশিষ্ট-৩

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বংশতালিকা

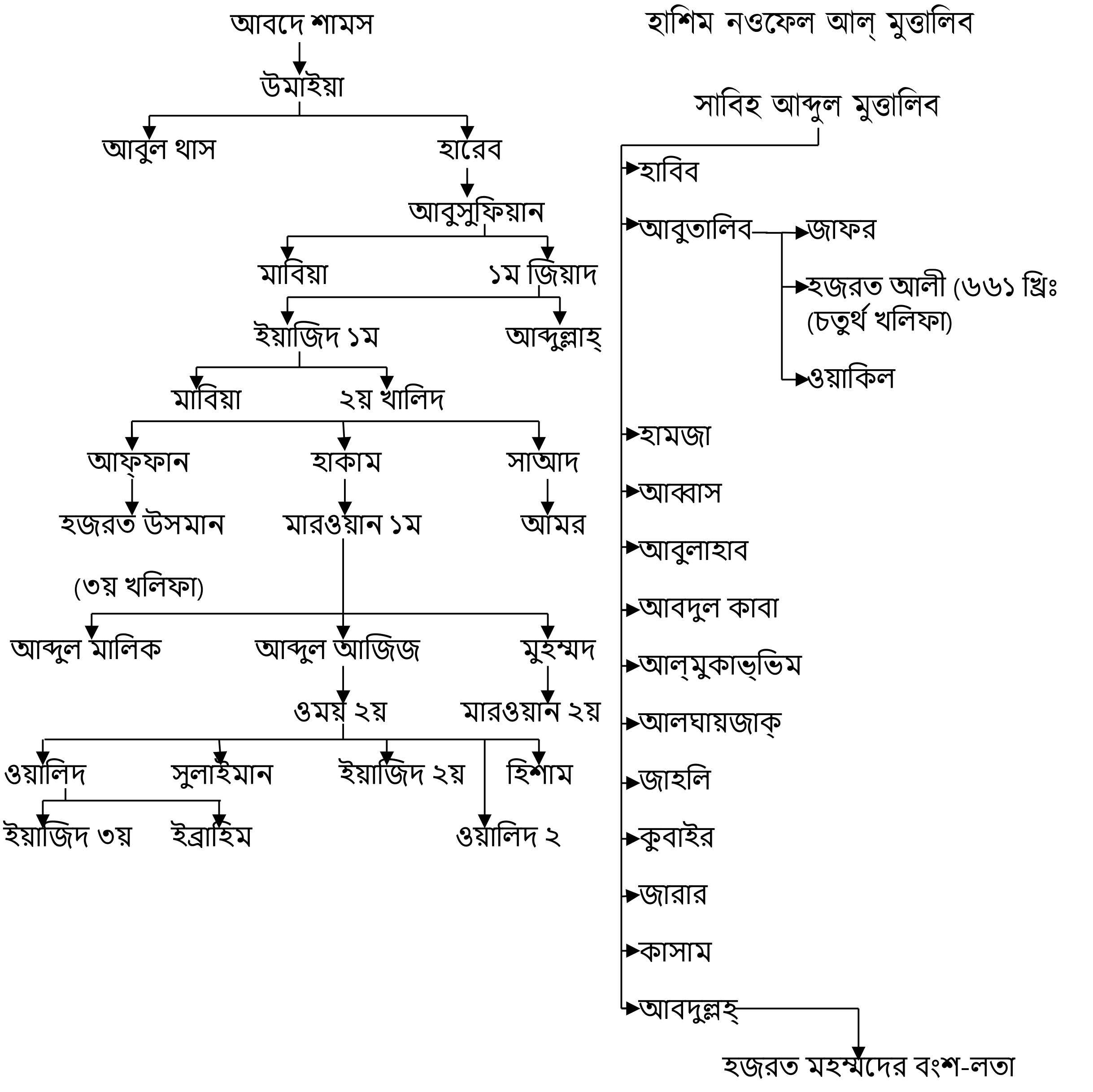

১. হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)

+হজরত খাদিজা বিন্তে খোয়েল্‌দ্

২. হজরত ফতিমা জোহ্‌রা

২. হজরত ফতিমা জোহ্‌রা

হজরত আলি মরতাজা

ইমাম হাসান   জয়নাব   ৩. ইমাম হুসাইন   উম্মে কুল্‌সুম   রুকাইয়া   মুহ্‌সীন

+শাহার বানু

মুহম্মদ   আউয়াল

কাসিম   ইবনে হাসান মুসান্না   আবদুল্লাহ্

ইবনে হাসান মুসান্না

আবদুল্লাহ্

মুহম্মদ নফসে জাকিয়া   ইদ্‌রিস   ইব্রাহিম

হাসান

সকিনা   আলী আকবর   আলী আওসাদ   খাতিমা সুগরা   আলী আস্‌গর

৪. আলী ইমাম সানী

ওরফে জয়নুল আবিদীন

৫. ইমাম মুহম্মদ আল্ বাকির   ইমাম জায়েদ

৬. ইমাম জাফ্‌র আস্‌সাদিক   ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া

ইমাম ইসমাইল   ৭. ইমাম মুসা আল্ কাজিম

মুহাম্মদ বিন্ ইসমাইল   ৮. ইমাম আলী আর্ রিজা

জাফর আল্ মুসাদ্দিক   ইমাম তকী অল্ জওয়াদ

হাসান ইব্‌নে জাফর   ইমাম আলী আন্ নকী

আলী ইব্‌নে হাসান   ইমাম হাসান আল্ আশকারী

ইমাম মুহম্মদ আল্ মাহ্‌দী

(আল্ মন্তাজার

মুহম্মদ আল্ হাবিব   মাহ্‌বুব আল্ মুস্তাফা   উম্মেতাহিরা

জহুরা আন্ নাসিমা   ৯. ইমাম আহ্‌মদ আন নাজী

ওবায়দুল্লাহ্ অল্ মাহদী   ১০. ইমাম মুহম্মদ আশ্‌শাফী

(আফ্রিকায় ফাতিমীয় খিলাফৎ   ১১. ইমাম মাহ্‌মুদ আর্ রাজী

ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা)

ওবায়দুল্লাহ্ অল্ মাহদী
(আফ্রিকায় ফাতিমীয় খিলাফৎ
ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা)
আল্ কায়িম
আল্ মন্সুর
আল্ মাঈজ
আল্ আজিজ
আল্ হাকিম
আজ্ জাহির
আল্ মাস্তান্সীর
আল্ মোস্তালী মহম্মদ আল্ মুস্তাফা নাজার
আল আমীর আজ্ হাফিজ
আল্ ইউনূস আল্ জাফির
আল্ আজিদ আল্ ফাইজ

১২. ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আল্হাদী
১৩. ইমাম সৈয়দ আবুজাফর আল্ খাজিন
১৪. সৈয়দ আবুল আলিম মুহম্মদ হুসাইন
১৫. সৈয়দ আবুল কাসিদম আলী ইব্নে হুসাইন
১৬. সৈয়দ আবুল ফজল আহ্মদ আলী
১৭. সৈয়দ আবু রায়হান মাহ্মুদ হুসাইন
১৮. সৈয়দ আবু ইউসুফ্ নস্র তুল্লাহ্
১৯. সৈয়দ আবু তাইয়ের আমানুল্লাহ্
২০. সৈয়দ আল ফয়েজ শহীদ হুসাইন
২১. সৈয়দ আবু জাফর মুহম্মদ সবনুল্ হুসাইন
২২. সৈয়দ আবুল হাসান জাবির আল্ এফ্লাহ্
২৩. সৈয়দ আবুল হাশিম মুহিউদ্দীন
২৪. সৈয়দ আবুলফজল জামাল-উদ্দীন
২৫. সৈয়দ আবুল খায়ের মাম্লেহ্-উদ্দীন
২৬. সৈয়দ আলাউদ্দীন
২৭. সৈয়দ গিয়াস-উদ্দীন
২৮. সৈয়দ মিনহাজ-উদ্দীন
২৯. সৈয়দ মঈন-উদ্দীন
৩০. সৈয়দ জয়্নুল্ আবিদীন
৩১. সৈয়দ আঈনুল্ আরিফীন
৩২. সৈয়দ মুর্শিদুল মুয়াহিদীন
৩৩. সৈয়দ মমতাজ-উদ্দীন
৩৪. সৈয়দ রশীদ-উদ্দীন
৩৫. সৈয়দ মিসবাহ্ উদ্দীন
৩৬. সৈয়দ মুস্তাফারহ্মতুল্লাহ্
৩৭. সৈয়দ মুহম্মদ নিয়ামতুল্লাহ্
৩৮. সৈয়দ আমানুতুল্লাহ
৩৯. সৈয়দ আলী আতাউল্লাহ্
৪০. সৈয়দ আবুল কালাম মুহম্মদ

৪১. সৈয়দ আলীইব্‌নে মুহম্মদ

৪২. সৈয়দ হাসান আস্‌গর

৪৩. সৈয়দ আলী আকবর

৪৪. সৈয়দ রফিউদ্দীন

৪৫. সৈয়দ আহ্‌মদ জমিল

৪৬. সৈয়দ কমর্‌-উজ্জমান

৪৭. সৈয়দ হাশ্মত জালাল

৪৮. সৈয়দ রওশন জমীর

৪৯. সৈয়দ শওকত জাহান

৫০. সৈয়দ কওসর আলম

৫১. সৈয়দ গুল্‌জার হুসাইন

৫২. সৈয়দ গুল্‌ মুহম্মদ্‌ আকরম হুসাইন

৫৪. সৈয়দ আহ্‌দ আলী হুসাসন   সৈয়দ মুর্তজা আলী হুসাইন   সৈয়দ মাহ্‌মুদ আলী হুসাইন

সৈয়দ জাহিদুন্নিসা বেগম   সৈয়দ আবদুস সামাদ   সৈয়দ আতাউল হক   সৈয়দ আবদুল গফুর   সৈয়দ আবদুস সবুর

হাজি নূর মুহম্মদ ওরফে আবদুল কাদের   সৈয়দ নেকনিসা বেগম

আনোয়ার হুসাইন   নাসিমা তুন্‌নিসা   তাহিরা   খাদিজা (খুদোন বিবি)

বদিউন্নিসা আবুল বাশার জমিলা (হাবোল)   আবু রাশেদ

৫৫. সৈয়দ আবদুল আহাদ

- আবদুস সালাম
- আশ্‌রাফুন্নিসা
- আবুল কালাম
- জুবাইদা
- তশ্‌রীফুন্নিসা
- মুশার্রিফুন্নিসা
- আবদুল আজিজ
- আমিনা খাতুন

৫৬. আবদুল রহমান ফেরদৌসি

- ৫৭. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
- আনোয়ার আলম
  - সৈয়দ সুশোভন রফি
  - সৈয়দ নীলাঞ্জন শফি
  - সৈয়দা রেবেকা নাজনীন শম্পা (পিসি)
- শামসুল্ আজাদ
- মতীন হায়দার
- খালেদ নৌমান
- কওসর জামাল
- আহ্‌সান জমীল
- শাহ্‌মত জালাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

- অভিজিৎ সিরাজ — নমিতা সিরাজ
  - বৃষ্টিকণা সিরাজ
- অমিতাভ সিরাজ — সম্পা সিরাজ
  - সবুজশ্রী সিরাজ
- নিনা সিরাজ
- পুতুল সিরাজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আব্দুর রহমান ফেরদৌসি প্রণীত পারিবারিক গ্রন্থ ‘মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ’।

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

আকর গ্রন্থ :

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৫।

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১৫।

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ২০১৫।

৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : তৃণভূমি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪০৩।

৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম (করুণা) সংস্করণ, বইমেলা, ১৯৯৮।

৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : স্রোতে ভেসে আছি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৫।

৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : অলীক মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪।

৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-

৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উত্তর জাহ্নবী, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নীল ঘরের নটী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ : ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : হিজলকন্যা, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৩, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রাণীঘাটের বৃত্তান্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : জিরো জিরো নাইন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৯৯।

১৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : একালের বাংলা গল্প, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫।

১৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নির্বাচিত রচনা, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : প্রেমের প্রথম পাঠ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-

০৭, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রোড সাহেব, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০ প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

২০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সোনালী আঙুরগুচ্ছ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

২. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৮।

৩. আলম, মাহবুবুল : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১০।

৪. আলম, মোঃ জাহাঙ্গীর : বাংলা উপন্যাসে খল নর ও নারী চরিত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।

৫. আল, হেলাল বশীর : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা (বাংলাদেশ), দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

৬. আহমদ, ওয়াকিল : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৩।

৭. আচার্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

৮. ইমরান, মাসউদ (সম্পা.) : ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

৯. ইসলাম, আমিনুল : বাঙালি দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মার্চ, ২০১১।

১০. ইসলাম, ড. সা'আদুল : বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০০৩।

১১. ঈগলটন, টেরী : মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা, দীপায়ন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০০৮।

১২. খান, লায়েক আলী : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র,

সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০০।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন : রাজনীতির অভিধান, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৩।

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : লাল মাটি, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : বইমেলা, ১৯৯৮।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : টেনিদা সমগ্র, সংকলন ও সম্পাদনা-প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৪০৫।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : বাংলা গল্প-বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪০১।

১৮. গোস্বামী, অচ্যুত : বাংলা উপন্যাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৯. গোস্বামী, অঞ্জন : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

২০. গুপ্ত, রবীন্দ্র : উপন্যাস জিজ্ঞাসা, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ২৮

আগস্ট ১৯৯৫।

২১. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-১, গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০২।

২২. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-২ গ্রন্থ নিলয়, দ্বিতীয় সংস্করণ : ৮ আগস্ট, ২০০১।

২৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৩, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম সংস্করণ : ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

২৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৪, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০০২।

২৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৫, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

২৬. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর : (প্রথম খণ্ড কথাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প এবং তত্ত্ব), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৭।

২৭. ঘোষ, মহুয়া : হুতোম প্যাঁচার নকশা : নকশার আরশিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮।

২৮. ঘোষ, বিশ্বজিৎ : বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০২।

২৯. ঘোষ, তপোব্রত : শ্রীবিলাসের ডায়ারি, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৩০. ঘোষ, শঙ্খ : সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা,
আচার্য, নির্মাল্য (সম্পা.) প্রথম প্রকাশ : ১৪০৫।

৩১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০০।

৩২. চন্দ্র, অরূপ (সম্পা.) : বাংলার হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ এবং মুর্শিদাবাদ, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৩. চন্দ্র, অরূপ : মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের কালপঞ্জি, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৪. চন্দ, বীরেন : বিষয় : বাংলা উপন্যাস (সংযোন খণ্ড), উত্তরধ্বনি, ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

৩৫. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, বর্ণালী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

৩৬. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষন, পুস্প, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯।

৩৭. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার : বাংলা সাহিত্যে মা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৩।

৩৮. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পা.) : শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০৩।

৩৯. চক্রবর্তী, রামী : মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৪০. চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

৪১. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পা.) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১৩ (ব.)

৪২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.) : বুদ্ধিজীবীর নোটবই পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৪৩. চক্রবর্তী, ড. শংকরপ্রসাদ : বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্ব (১৯৪২-১৯৪৭), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৪৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল : সাহিত্যের রুপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

৪৫. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-০৯, এপ্রিল, ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

৪৬. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, নবেন্দু (সম্পা.) : অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩।

৪৭. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর : বন্দর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২।

৪৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ : বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬।

৪৯. চট্টোপাধ্যায়, বিমলভূষণ : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬।

৫০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব : শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১৬, পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৮।

৫১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (সম্পা.) : তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেও, বঙ্গীয়

সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাস পূর্ণিমা, ১৪০৭।

৫২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩।

৫৩. চৌধুরী, অজিত : উপনিবেশের হেজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে, অবভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮।

৫৪. চৌধুরী, ড. সুবোধ : সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৮।

৫৫. চৌধুরী, সুশীল : নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৫৬. জাহান, সারোয়ার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূল্যায়নের পালাবদল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

৫৭. ঝা, শক্তিনাথ : আলকাপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৫৮. ঝা, শক্তিনাথ : ঝাঁকসু লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

৫৯. দে, আশিস কুমার : শৈলী ও শৈলী বিজ্ঞান, ভাষা পত্রিকা, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।

৬০. দে, আশিস কুমার : সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

৬১. দত্ত, উত্তম : বর্ণমালার দিব্যি, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬।

৬২. দত্ত, সম্রাট : আখ্যান ব্যাখ্যান ও গদ্যচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দোলযাত্রা, ২০১৭।

৬৩. দত্ত, সম্রাট : বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৬৪. দত্ত, সরোজ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৬।

৬৫. দত্ত, সরোজ : কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

৬৬. দত্ত, বীরেন্দ্র : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৬৭. দত্ত, বিজিতকুমার : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

৬৮. দত্ত, ভবতোষ : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

৬৯. দত্ত, ভবতোষ : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫।

৭০. দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২।

৭১. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.) : স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

৭২. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.) : সৈয়দ খালেদ নৌমন, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

৭৩. দাস, বেলা
চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পা.) : বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

৭৪. দাস, সীমারেখা : নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৭৫. দাস, বেলা : বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯।

৭৬. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ : যুগ বদলে বাংলা উপন্যাসে রূপবদল, দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৭৭. দাশগুপ্ত, রাহুল : আখ্যানের দুনিয়া, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১০।

৭৮. দেবী, অনুরূপা : মা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩২১।

৭৯. দেবী, মহাশ্বেতা : অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩১৫।

৮০. নন্দী, রতনকুমার : অরণ্যের অধিকার মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮১. পাল, রবিন : উপন্যাসের উজানে, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭।

৮২. পাল, রবীন : উপন্যাস দ্য ও পাশ্চাত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১১।

৮৩. পাল, প্রশান্তকুমার : রবি জীবনী (সপ্তম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭।

৮৪. ফেরদৌসি, আব্দুর রহমান : মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র : মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড

কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৯।

৮৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : অন্তর্বয়ন : কথা সাহিত্য, একুশে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০।

৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৮৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭২।

৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৩।

৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০ মে, ১৯৯৬।

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।

৯৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতীম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪

৯৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. দেবদ্যুতি : কথাসাহিত্য প্রকরণ, বি. বি. কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৯৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৯৬. বিশ্বাস, ড. মাধুরী : উপন্যাসের কথা : নির্মাণের নতুনরীতি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

৯৭. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : দেশভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদ চরিতাভিধান, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৯. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদে মন্বন্তর, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০০. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : রবীন্দ্রনাথ ও মুর্শিদাবাদ, ছাপাখানার গলি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

১০১. বিশ্বাস, সর্বাণী : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম

প্রকাশ : ২০০৭।

১০২. বেরা, নলিনী : শবর চরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

১০৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন : ইতিবৃত্তে চণ্ডালজীবন, প্রিয়শিল্প প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০৪. বসু, নির্মলকুমার : হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯।

১০৫. বসু, বুদ্ধদেব : রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩।

১০৬. বসু, নৃপেন্দ্রকুমার : ফয়েডের নারী চরিত্র, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮।

১০৭. বসু, বুদ্ধদেব : সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ২০০০।

১০৮. বসু, স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : ২০১৪।

১০৯. বসু, ড. দেবকুমার : কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৪।

১১০. ভদ্র, গৌতম : নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স,
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) কলকাতা-১৪, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮, সপ্তম

মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

১১১. ভদ্র, গৌতম : নিসর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৮।

১১২. ভদ্র, গৌতম : ইমান ও নিশান, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

১১৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

১১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দীপাবলী, ২০১০।

১১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৪১২।

১১৬. ভট্টাচার্য, তপপাধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৭।

১১৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : বাখতিন, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০২, এবং মুশায়েরা সংস্করণ আগস্ট, ২০০৯।

১১৮. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন : তারাশংকর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরজশাহ রোড, নতুন দিল্লি-০১, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১১৯. ভট্টাচার্য, বীতশোক : কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৯০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

১২০. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১২১. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন : বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১২২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের আলো আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

১২৩. ভট্টাচার্য, দেবাশীষ : বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিমবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১২৪. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশনাথ : মনোবিদ্যা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭০।

১২৫. ভট্টাচার্য, বিজন : জনপদ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫২।

১২৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০।

১২৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

১২৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৩।

১২৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৪।

১৩০. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৫, তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১২।

১৩১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৩।

১৩২. মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তরুণ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ স্মরণে, চিন্তনে, মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ (ব.)

১৩৩. মুখোপাধ্যায়, জগমোহন : গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

১৩৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১৩।

১৩৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : প্রাক-পলাশী বাংলা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২।

১৩৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০১।

১৩৭. মুখোপাধ্যায়, অশোক : সংসদ বানান অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

১৩৮. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : দুখে কেওড় চরিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০২।

১৩৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্র-জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৯ম মুদ্রণ, ২০১৫।

১৪০. মুখোপাধ্যায়, উর্বী
চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা.) : বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৪১. মুখোপাধ্যায়, উর্বী : অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৬।

১৪২. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮।

১৪৩. মণ্ডল, তুলসীচরণ : আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১৪।

১৪৪. মণ্ডল, সেলিম বক্স : বস্তুবাদী সাহিত্যপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৪৫. মণ্ডল, বরেন্দু : লিটিল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্ত, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৭।

১৪৬. মণ্ডল, চিত্ত : নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬।

১৪৭. মণ্ডল, উৎপল মজুমদার, কামনা (সম্পা.) : মহাশ্বেতার গল্প : মহাশ্বেতার সন্ধানে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১৪৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তাক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯৮।

১৪৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ৩০ শ্রাবণ, ১৩৪৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

১৫০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩।

১৫১. মজুমদার, কমলকুমার : অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৩।

১৫২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

১৫৩. মান্না, গুণময় : বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাজিক, ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৫।

১৫৪. মুরশিদ, গোলাম : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ : জলাই, ২০১৫।

১৫৫. মিশ্র, বাণীপ্রসন্ন : আবহমান বাঙালি প্রত্যাহ্বান ও প্রত্যনুসন্ধান, গ্রন্থিক, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

১৫৬. মিশ্র, ভগীরথ : মৃগয়া (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

১৫৭. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ : মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

১৫৮. মিত্র, কাশীকান্ত : গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী, রবীন্দ্র লাইব্রেরী,

কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৫।

১৫৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র : ঘনাদা সমগ্র-১, সম্পাদনা-সুরজিৎ দাশগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২।

১৬০. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ : ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১৬১. রায়, অপূর্ব কুমার : শৈলী বিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৬।

১৬২. রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৯।

১৬৩. রায়, অলোক (সম্পা.) : সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১০।

১৬৪. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালিন বাংলা কথাসাহিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

১৬৫. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং,

কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী, ২০০১।

১৬৬. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

১৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, প্রথম বর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৬।

১৬৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০০।

১৬৯. রায়চৌধুরী, লাভলী মোহন : ইতিহাস নানাবিধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১৭।

১৭০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১৭১. রশীদ, ফকির আব্দুর : সুফী দর্শন, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

১৭২. রহমান, ড. শাহীদা : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকারচেতনা, সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

১৭৩. শ, ড. রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

১৭৪. শ', ড. রামেশ্বর ও শ', হেনা (সং, ও সম্পা.) : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৪ শে নভেম্বর, ২০০৮।

১৭৫. সেন মজুমদার, জহর : উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।

১৭৬. সরকার, পবিত্র : কথা সুত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১০।

১৭৭. সামন্ত, সুবল (সম্পা.) : বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অধীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১১।

১৭৮. সেন, দীনেশচন্দ্র : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।

১৭৯. সেন, নব্যেন্দু (সম্পা.) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, রত্নাবলী,

৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৯।

১৮০. সেন মজুমদার, জহর : উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।

১৮১. সেন, অঞ্জন
সিংহ, উদয়নারায়ন (সম্পা.) : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০১০।

১৮২. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৮, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ : মার্চ, ২০০৩।

১৮৩. সান্যাল, অরুণ (সম্পা.) : প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

১৮৪. সেন, অভিজিৎ : রহু চণ্ডালের হাড়, জে. এন. চক্রবর্তী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১৮৫. সিকদার, অশ্রুকুমার : ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৬. সিকদার, অশ্রুকুমার : সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৭. হাজরা, দিলীপ : বাংলা উপন্যাসের পালাবদল, বঙ্গীয় সাহিত্য,
বর্মন, অমিতকুমার সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

১৮৮. হাসান, জাহিরুল : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ, পূর্বা, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১৮৯. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৯০. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯১. হাসান, জাহিরুল (সম্পা.) : বিশ শতকের বাঙালি প্রতিভা, মডেল পাবলিশিং হাউস, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৯২. হাসান, মইনুল : আধুনিকতা ও বাংলার মুসলমান সমাজ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪১৭।

১৯৩. হারুণ, শরীফ : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৯।

১৯৪. হারুণ, শরীফ : অস্তিত্ববাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

১৯৫. হোসেন, সোহরাব : বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৪।

১৯৬. হোসেন, সেলিনা : স্বদেশে পরবাসী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

১৯৭. হোসেন, সৈয়দ আকরাম : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯৮. হালিম, মোঃ আব্দুল : দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৩।

১৯৯. হাশমী, তাজুল ইসলাম : ঔপনিবেশিক বাঙলা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৫।

২০০. হাবিব, ইরফান : মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি (৬৫০-১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ), এন. বি. এ. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১১, অনুবাদ : শুভাশিস ঘোষ।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

1. Abrams, M.H. : A Glossary of literary Terms, Sixth Edition, Prism Books Pvt. Ltd, Bangalore, Harcourt Brace & Company.

2. Baba, Homi : Unsatisfied Notes on vernacular compolitanism, Text and Nations : cross Disciplinary Eassays on culturar and National Identities, ed-laura Garcia, Columbia, Sc Camden house, 1996. (www.google.com)

3. Bhattacharji, Sukumari : Myth, Progressive Publishers, Kolkata, Reprint: January, 2018.

4. Baker, Emilie Kip : Stories of old Greece and Rome, New York the Macmillan Company, USA, 1913.

5. Bakthin, Mikhail : 'The Dialogic imagination : Four Eassays', Edt, by Michael Halquist, University of texas Press, Austin and London, 1981, p.366. (www.google.com)

6. Bhartiya (Ed.), Santosh : Dalit and Minority Empowerment, Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2008.

7. Butcher, S. H. : Aristotle's theory of poetry and fine art, (Translated with Kalyani Publishers, New Delhi. 2, critical notes by) Reprinted, 2012.

8. Cuddon, J. A. : The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, New Delhi-11, Reprinted, 1999.

9. Dutt (Ed.), KC : Who's Who of Indian Writers 1999 Vol.2, Sahitya Akademi, New Delhi, 1999.

10. Das, Suranjan : Communal Riots in Bengal 1905-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991.

11. Deen, Hanifa : The Crescent and the Pen: The Strange Journey of Taslima Nasreen, Praeger Publishers, USA, 2006.

12. Forster, F. M. : Aspects of the Novel, Penguin Books, England, Reprinted, 1964.

13. Gupta, Bishan Kumar : Political Movements in Murshidabad 1920-1947, Manisha Granthalaya, 1992.

14. Gastrell, JE : Statistical and Geographical Report of the Moorshedabad District, Bengal Secretariat Office, 1860

15. Glynn, Sarah : Class, Ethnicity and Religion in the Bengali East End : A Political History, Manchester University Press, UK, 2014.

16. Hayat, Abul : Mussalmans of Bengal, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2008.

17. Ikram, S. M. : Indian Muslims and Partition of India,

		Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1992.
18. Karim, Abdul	:	Murshidkuli khan and His Times, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2011.
19. Levi-Strauss	:	MYTH AND MEANING, SCHOCKEN BOOKS NEWYORK, Foreword Copyright @ 1995.
20. Santosh, de Sousa	:	Towards a New legal common sense, 2nd Edt. Lexis Nexis Butterworths, London, 2002. (www.google.com)

পত্র-পত্রিকা :

১. অন্য একলব্য	:	২০১৩ (জানুয়ারি-মার্চ)
২. অমলকান্তি	:	২০১২ (জুলাই)
৩. অর্কেস্ট্রা	:	২০১৩ (অক্টোবর, সিরাজ সংখ্যা)
৪. অর্কেস্ট্রা	:	২০১৩ (ফেব্রুয়ারি, সিরাজ স্মরণ)
৫. আজকাল	:	২০০৩ (২৫ আগস্ট)
৬. আজকাল	:	২০১৭ (২০ সেপ্টেম্বর)
৭. আজকাল	:	২০১৭ (রবিবাসর, ২২ অক্টোবর)
৮. বইয়ের দেশ	:	২০১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
৯. এই সময়	:	২০১০ (এপ্রিল)
১০. ঐক্য পত্রিকা	:	২০১৩ (অক্টোবর, বিশেষ সংখ্যা)

১১. সমকালের জিয়নকাঠি	:	২০১৩ (জুলাই-ডিসেম্বর, বিশেষ সংখ্যা)
১২. সান্ধ্য ভাষা	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৩. প্রতিক্ষণ	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৪. দেশ	:	১৯৯৩ (২৪শে এপ্রিল)
১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
১৬. আমার সময়	:	২০১০ (এপ্রিল)
১৭. এবং সংস্কৃতি	:	২০১৬ (জুলাই)
১৮. এবেলা	:	২০১৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি)
১৯. সকালবেলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
২০. নিউজ বাংলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)

পরিশিষ্ট-১

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনপঞ্জি

নাম	-	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।
পিতার নাম	-	সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি।
মাতার নাম	-	আনোয়ারা বেগম।
১৯৩০	-	জন্ম : খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ (১৪ অক্টোবর)।
১৯৪৪-৪৬	-	স্কুলজীবনেই বাম ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।
১৯৪৬	-	ম্যাট্রিক পাস গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়, বর্ধমান।
১৯৪৯	-	সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'আমার বাউল বন্ধুরা' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ।
১৯৫০	-	স্নাতক—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ। 'ইবলিশ' ছদ্মনামে প্রথম গল্প 'কাঁচি' প্রকাশিত হল বহরমপুরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'শেষ অভিসার' কবিতা প্রকাশিত।
১৯৫০-৫৬	-	ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং আলকাপ লোকনাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত।
১৯৫৬	-	শ্রীমতি হাসনে আরা বেগমের সঙ্গে পরিণয়। স্ত্রীর প্রেরণায় সাহিত্যকর্মে মনোযোগী।
১৯৫৯	-	প্রথম পুত্র অভিজিতের জন্ম।
১৯৬২	-	'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন'।

১৯৬৪	-	কলকাতায় বসবাস শুরু।
১৯৬৪-৬৯	-	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত।
১৯৬৬	-	প্রথম উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' প্রকাশিত নবপত্র প্রকাশনের উদ্যোগে।
১৯৬৯	-	আনন্দবাজার পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধাদি রচনা শুরু।
১৯৭১	-	আনন্দবাজার-এর বার্তা বিভাগে স্থায়ী চাকরিতে যোগদান।
১৯৮০	-	আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে চার মাসের জন্য আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে যোগদান।
১৯৯০	-	'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য 'ভুয়ালকা পুরস্কার লাভ।
১৯৯৩	-	সাংবাদিকতার পেশায় অবসর গ্রহণ।
১৯৯৩-৯৮	-	সাহিত্য আকাদেমির বাংলা বিভাগে উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য।
১৯৯৪	-	'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার'-এ সম্মানিত।
১৯৯৬	-	আমেরিকার হিউস্টনে অনাবাসী বাঙালি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান।
১৯৯৮-২০০৪	-	জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত।
২০০৮	-	আই. আই. পি.এম-এর তরফে 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য

আন্তর্জাতিক ‘সুরমা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত।

২০০৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ‘ডি. লিট’ খেতাবে সম্মানিত করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

২০১০ - শিশু-সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত। কেন্দ্রীয় সরকারের রবীন্দ্র জন্মসার্ধশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যপদে মনোনীত।

২০১১ - কেন্দ্রীয় সরকারের স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্য পদে মনোনীত।

২০১২ - প্রয়াণ কলকাতার নাইটিঙ্গেল হাসপাতাল (৪ সেপ্টেম্বর)। শেষকৃত্য জন্মভূমি খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর।

পরিশিষ্ট-২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রন্থতালিকা

নং গ্রন্থের নাম	প্রকাশন/প্রকাশনী	প্রকাশকাল
১. নীল ঘরের নটী	নবপত্র প্রকাশন	১৯৬৬
২. পিঞ্জর সোহাগিনী	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৬
৩. আসমানতারা	নিরীক্ষা প্রকাশনী	১৯৬৬
৪. নিশিলতা	বার্ণিক প্রকাশনী	১৯৬৭
৫. হিজলকন্যা	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৭
৬. প্রেমের প্রথম পাঠ	হরফ প্রকাশনী	১৯৬৭
৭. কিংবদন্তীর নায়ক	কথাশিল্পী	১৯৬৯
৮. বন্যা	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৬৯
৯. নিশিমৃগয়া	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৭০
১০. জলতরঙ্গ	বিচিত্রা প্রকাশনী	১৯৭০
১১. তৃণভূমি	রূপরেখা	১৯৭০
১২. জোয়ারের দিন	হরফ প্রকাশনী	১৯৭০
১৩. কামনার সুখদুঃখ	প্রফুল্ল গ্রন্থালয়	১৯৭১

১৪. ছায়া পড়ে	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৯৭১
১৫. একদা অরণ্যে	হরফ প্রকাশনী	১৯৭১
১৬. এখন অন্ধকার	হরফ প্রকাশনী	১৯৭১
১৭. সবুজ নক্ষত্র	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭১
১৮. বনকরবী	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭১
১৯. নিষিদ্ধ প্রান্তর	অনন্য প্রকাশন	১৯৭১
২০. কলকাতার কেঁদো	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭২
২১. এক বোন পারুল	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭২
২২. মায়ামৃদঙ্গ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭২
২৩. সীমান্ত বাঘিনী	সাহিত্যিকা	১৯৭২
২৪. নির্বাসনের দিন	দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ	১৯৭২
২৫. অন্ধ ত্রাস	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭২
২৬. বিমূর্ত পাপ	রামায়ণী প্রকাশনী	১৯৭৩
২৭. আমাজনের অরণ্যে	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৩
২৮. অসবর্ণ	প্রকাশ ভবন	১৯৭৩
২৯. উত্তরজাহ্নবী	প্রকাশ ভবন	১৯৭৪
৩০. মা নিষাদ	সাহিত্য প্রকাশ	১৯৭৪

৩১. হাঙর	পুস্তক প্রকাশনী	১৯৭৪
৩২. গোপনে নির্জনে	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৪
৩৩. কেন ভালোবাসা	রূপরেখা প্রকাশনী	১৯৭৪
৩৪. নীল শূন্য	জ্যোতি প্রকাশনী	১৯৭৫
৩৫. নান্টুমামার গাড়ি	অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস	১৯৭৫
৩৬. একালের বাংলা গল্প	রামায়ণী প্রকাশনী	১৯৭৫
৩৭. সোনার পিতলমূর্তি	পূর্ণ প্রকাশন	১৯৭৫
৩৮. গোয়েন্দা কর্ণেল	প্রফুল্ল গ্রন্থাগার	১৯৭৫
৩৯. জানালার নীচে একটা লোক	অন্তরা প্রকাশন	১৯৭৫
৪০. কিছু অলৌকিক	পুস্তক প্রকাশনী	১৯৭৫
৪১. প্রেম ঘৃণা দাহ	রবীন্দ্র লাইব্রেরী	১৯৭৫
৪২. বিবাদী বাগ	অনন্য প্রকাশন	১৯৭৫
৪৩. বনের আসর	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭৫
৪৪. আনন্দমেলা	দে'জ পাবলিশিং	১৯৭৬
৪৫. নৃশংস	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৬
৪৬. নিলয় না জানি	শৈব্যা পুস্তকালয়	১৯৭৬
৪৭. নীল ঘোড়া	সৌরভ প্রকাশনী	১৯৭৬

৪৮. তোমার বসন্ত দিনে	আশা প্রকাশনী	১৯৭৬
৪৯. বিষাক্ত সুন্দর	সাহিত্য সংস্থা	১৯৭৬
৫০. জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর গন্ধ	বঙ্গবাণী প্রকাশনী	১৯৭৬
৫১. হলুদবাংলো	শরৎ পাবলিশিং হাউস	১৯৭৭
৫২. বহুবর্ণ	পাত্রজ পাবলিকেশনস	১৯৭৭
৫৩. হেমন্ত ও বনশ্রী	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৭
৫৪. সোনালী আঙুরগুচ্ছ	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	১৯৭৮
৫৫. বিভ্রান্ত	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স	১৯৭৮
৫৬. সে এক অদ্ভুত দ্বীপ	পত্রলেখা	১৯৭৮
৫৭. অনুসন্ধান	স্বরলিপি	১৯৭৮
৫৮. নিঝুমরাতের আতঙ্ক	দে’জ পাবলিশিং	১৯৭৯
৫৯. কনকচাঁপা	দেব সাহিত্যকুটির	১৯৭৯
৬০. অমৃত ছিল না	মিত্র ও ঘোষ	১৯৭৯
৬১. স্বপ্নের মতো	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬২. টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬৩. ভয়ভুতুড়ে	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮০
৬৪. কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮০

৬৫. সংশপ্তক	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮০
৬৬. নির্জন গঙ্গা	প্রকাশ ভবন	১৯৮০
৬৭. মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া ভূত	মুখার্জী ব্রাদার্স	১৯৮০
৬৮. আগুনের চারপাশে	করুণা প্রকাশনী	১৯৮০
৬৯. অলৌকিক চাকতিরহস্য	মুখার্জী ব্রাদার্স	১৯৮১
৭০. রোডসাহেব	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮১
৭১. মাকাসিকোর ছায়ামানুষ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮১
৭২. কালো বাক্সর রহস্য	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮২
৭৩. স্বপ্নের নিচে দাঁড়িয়ে	মৌসুমী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৪. কোদণ্ডের টঙ্কার	নির্মল বুক এজেন্সি	১৯৮৩
৭৫. অরূপরতন	প্রকাশ ভবন	১৯৮৩
৭৬. এক যে ছিল পায়রা	পক্ষীরাজ প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৭. জীবনসঙ্গিনী	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৮. ম্যাজিশিয়ান মামা	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৭৯. রূপ রস গন্ধ	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৮০. আপন ঘর	কামিনী প্রকাশনী	১৯৮৩
৮১. পেছনের আততায়ী	মালিনী প্রকাশনী	১৯৮৩

৮২. তিন বসন্ত	সাহিত্যম	১৯৮৪
৮৩. অশরীরী ঝড়	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৮৪
৮৪. অকাল মৃগয়া	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮৪
৮৫. রাজপুত্র মন্ত্রী	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৪
৮৬. নদীর মতন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৪
৮৭. ওয়াগন ব্রেকার	সংবাদ প্রকাশন	১৯৮৪
৮৮. বিপজ্জনক ১১	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৮৯. তখন কুয়াশা ছিল	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৯০. বাসস্থান	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৫
৯১. মড়া যদি জ্যান্ত হয়	গীতাঞ্জলি প্রকাশনী	১৯৮৫
৯২. ফাগুনে আগুন	যুগ প্রকাশনী	১৯৮৫
৯৩. কিশোর ভৌতিক অমনিবাস	কামিনী প্রকাশন	১৯৮৫
৯৪. কালো পাথর	আদিত্য প্রকাশনী	১৯৮৫
৯৫. কালো মানুষ নীল চোখ	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৫
৯৬. বসন্ততৃষ্ণা	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৬
৯৭. হাট্টিম রহস্য	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৬
৯৮. সবুজ ভবনের ভয়ঙ্কর	দে’জ পাবলিশিং	১৯৮৬

৯৯. তখন অনেক রাত	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৮৬
১০০. সাহারার সন্ত্রাস	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৮৬
১০১. ওজরাকের পাঞ্জা	নির্মল বুক এজেন্সি	১৯৮৬
১০২. মোতিবিবির দরগা	শরৎ পাবলিশিং হাউস	১৯৮৬
১০৩. হায়েনার গুহা	মুখার্জী পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৪. একদা বর্ষার রাতে	জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৫. গল্পসমগ্র ১ম	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৬
১০৬. রানীরঘাটের বৃত্তান্ত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৬
১০৭. দারুব্রহ্মকথা	রেণুকা	১৯৮৭
১০৮. বিশাখা তোমার নামে	এস আই এন্টারপ্রাইজ	১৯৮৭
১০৯. বিবর্ণ অর্কিড	অমৃতধারা	১৯৮৭
১১০. কালো গোখরো	জগদ্ধাত্রী প্রকাশনী	১৯৮৭
১১১. গল্পসমগ্র ২য়	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৭
১১২. গোপন সত্য	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৭
১১৩. স্বর্গের বাহন	শশধর প্রকাশনী	১৯৮৭
১১৪. বলে গেছেন রামশন্না	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৭
১১৫. প্লাবন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৭

১১৬. গোয়েন্দা কর্ণেল	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৮
১১৭. সবুজ সঙ্কেত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৮
১১৮. হেমন্তের বর্ণমালা	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৮
১১৯. অলীক মানুষ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৮
১২০. অমর্ত্য প্রেমকথা	মিত্র ও ঘোষ	১৯৮৮
১২১. বসন্তরাতের ঝড়	মডার্ণ কলাম	১৯৮৯
১২২. রাতের দরজা	প্রত্যয় প্রকাশনী	১৯৮৯
১২৩. কাগজে রক্তের দাগ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৪. রহস্য রোমাঞ্চ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৫. ছয় নায়িকা	সাহিত্যম	১৯৮৯
১২৬. কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৯
১২৭. এখন এই সময় (সম্পাদিত)	ক্রান্তিক	১৯৮৯
১২৮. ছবির মানুষ	সাহিত্য সংস্থা	১৯৮৯
১২৯. নিষিদ্ধ অরণ্য	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৯
১৩০. জানমারি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৯
১৩১. কালের প্রহরী	জগদ্ধাত্রী প্রকাশনী	১৯৮৯
১৩২. সোনার ঠাকুর	শশধর প্রকাশনী	১৯৮৯

১৩৩. রেশমীর আত্মচরিত	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৪. এককুড়ি ভূতের গল্প	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯০
১৩৫. অপারেশন রেড হেরিং	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৬. কর্ণেলরহস্য অমনিবাস	করুণা প্রকাশনী	১৯৯০
১৩৭. খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯০
১৩৮. পিছনে পায়ের শব্দ	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯০
১৩৯. আমার প্রিয় গল্প	মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স	১৯৯০
১৪০. ভালুক ভায়া আর ভুণ্ডু নাপিত	শিশু পাঠভবন	১৯৯০
১৪১. বিষাক্ত সুন্দর ফুল	মডার্ণ কলাম	১৯৯১
১৪২. ইভনিং ভিলা	মিত্র ও ঘোষ	১৯৯১
১৪৩. কিশোর গোয়েন্দা অমনিবাস	পুনশ্চ	১৯৯১
১৪৪. অ্যাডভেঞ্জার অমনিবাস	নন্দিতা পাবলিশার্স	১৯৯১
১৪৫. কঙ্কগড়ের কঙ্কাল	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৬. নটী নয়নতারা	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯২
১৪৭. জনপদ জনপদ	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৮. আসমানতারা	নাথ পাবলিশিং	১৯৯২
১৪৯. কর্ণেলের তিন রহস্য	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯২

১৫০. আসমানতারা	নাথ পাবলিশার্স	১৯৯২
১৫১. রহস্যভেদী কর্ণেল	ছন্দম প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং	১৯৯২
১৫২. ভূত নয় অদ্ভুত	কামিনী প্রকাশনালয়	১৯৯২
১৫৩. বেদবতী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯২
১৫৪. নগ্ন নির্জন হাত	মডার্ণ কলাম	১৯৯২
১৫৫. ভূত বনাম গোয়েন্দা	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৩
১৫৬. তিন নক্ষত্র	সাহিত্যম	১৯৯৩
১৫৭. কর্ণেল সমগ্র ১	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৫৮. সেরা কিশোর কর্ণেল রহস্য	অসীম প্রিন্টার্স	১৯৯৪
১৫৯. শ্রেষ্ঠ গল্প	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬০. নাগমিথুন	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৪
১৬১. রূপবতী	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬২. মুসলিম চিত্রকলার আদি পর্ব এবং অন্যান্য	মিত্র ও ঘোষ	১৯৯৪
১৬৩. জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর ঘ্রাণ	প্রত্যয় প্রকাশনী	১৯৯৪
১৬৪. কোকোদ্বীপের বিভীষিকা	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪
১৬৫. ভালোবাসা	মডার্ণ কলাম	১৯৯৪
১৬৬. কর্ণেল সমগ্র ২	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৪

১৬৭. গল্প সমগ্র ৩	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৪
১৬৮. কুয়াশার রং নীল	অপর্ণা বুক ডিপো	১৯৯৫
১৬৯. কর্ণেল সমগ্র ৩	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭০. স্বর্ণচাপার উপাখ্যান	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭১. একান্ত গোপনে	মডার্ণ কলাম	১৯৯৫
১৭২. হনিমুন লজ	নাথ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭৩. সেরা বারো	রূপা প্রকাশনী	১৯৯৫
১৭৪. কর্ণেল সমগ্র ৪	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৫
১৭৫. ডমরু ডিহির ভূত	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৬
১৭৬. অপারেশন এক্সফাইল	দেব সাহিত্য	১৯৯৬
১৭৭. গল্পসমগ্র ৪	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৬
১৭৮. তৃণভূমি	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৬
১৭৯. কর্ণেল সমগ্র ৫	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৬
১৮০. কবরের অন্ধকারে	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৯৭
১৮১. জিরো জিরো নাইন	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৭
১৮২. লাল সাগরের আতঙ্ক	পুষ্প প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৩. প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৭

১৮৪. কর্ণেল সমগ্র ৬	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৭
১৮৫. নিষিদ্ধ প্রান্তর	ভাষা ও সাহিত্য	১৯৯৭
১৮৬. ভূতের গল্প ভয়ংকর	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৭. হিকরি ডিকরি ডক রহস্য	কামিনী প্রকাশনী	১৯৯৭
১৮৮. রোডসাহেব ও পুর্বাসন	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৮
১৮৯. সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৮
১৯০. ইনস্পেক্টর ব্রহ্ম	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	১৯৯৮
১৯১. কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি	করুণা প্রকাশনী	১৯৯৮
১৯২. কালো নেকড়ে	সাহিত্যম	১৯৯৮
১৯৩. অকাল মৃগয়া	নিউ বেঙ্গল প্রেস	১৯৯৯
১৯৪. কর্ণেল সমগ্র ৭	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৯
১৯৫. কর্ণেল সমগ্র ৮	দে’জ পাবলিশিং	১৯৯৯
১৯৬. কর্ণেলের চার রহস্য	পত্রভারতী	১৯৯৯
১৯৭. কর্ণেলের নাম নন্দনকানন	দেব সাহিত্য কুটির	১৯৯৯
১৯৮. সব ভূত অদ্ভুত	বসাক বুক স্টোর	১৯৯৯
১৯৯. কিশোর রহস্য সম্ভার	সূর্য পাবলিশার্স	১৯৯৯
২০০. স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	মডেল পাবলিশিং	১৯৯৯

২০১. কর্ণেল সমগ্র ৯	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০২. কর্ণেলের এক ডজন	পত্রভারতী	২০০০
২০৩. থ্রিলার সপ্তক	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৪. সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৫. কর্ণেল সমগ্র ১০	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২০৬. প্রেমের নিষাদ	পুষ্প প্রকাশনী	২০০০
২০৭. বাহান্ন ভূতের গল্প	পুষ্প প্রকাশনী	২০০০
২০৮. ছায়ার আড়ালে	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	২০০০
২০৯. মুখোশের রঙ লাল	অঞ্জলি প্রকাশনী	২০০০
২১০. গোপনে নির্জনে	এডুকেশন ফোরাম	২০০০
২১১. কর্ণেল সমগ্র ১১	দে'জ পাবলিশিং	২০০০
২১২. দশটি উপন্যাস	করুণা প্রকাশনী	২০০০
২১৩. তারা অশরীরী	দে'জ পাবলিশিং	২০০১
২১৪. কর্ণেলের ৫ রহস্য	পত্রভারতী	২০০১
২১৫. আততায়ী পাশেই ছিল	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০১
২১৬, স্বনির্বাচিত সেরা বারো	বিকাশ গ্রন্থভবন	২০০১
২১৭. হিজল কন্যা	সৃষ্টি প্রকাশন	২০০১

২১৮. কর্ণেল সমগ্র ১২	দে'জ পাবলিশিং	২০০১
২১৯. অদ্বিতীয় কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০২
২২০. অদ্ভুত যত ভূত	সৃষ্টি প্রকাশন	২০০২
২২১. গল্প সমগ্র ৫	করুণা প্রকাশনী	২০০২
২২২. উপন্যাস সমগ্র ১	দে'জ পাবলিশিং	২০০২
২২৩. উপন্যাস সমগ্র ২	দে'জ পাবলিশিং	২০০২
২২৪. থ্রিলার পঞ্চম	দে'জ পাবলিশিং	২০০৩
২২৫. কর্ণেলের অভিযান	শৈব্যা পুস্তকালয়	২০০৩
২২৬. অশরীরী ঝড়	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৩
২২৭. তিতলি পুরের জঙ্গলে	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৩
২২৮. উড়ো পাখির ছায়া	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০৩
২২৯. একডজন কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০৩
২৩০. নায়িকার ভূমিকায়	সুপ্রিম পাবলিশার্স	২০০৪
২৩১. বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তর অভিযান	শৈব্যা প্রকাশন	২০০৪
২৩২. কর্ণেল ৩	দেবসাহিত্য কুটির	২০০৪
২৩৩. কর্ণেলের একদিন	দে'জ পাবলিশিং	২০০৪
২৩৪. নীল শূন্য	ঊর্বশী প্রকাশন	২০০৪

২৩৫. সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত	শৈব্যা প্রকাশন	২০০৪
২৩৬. ভৌতিক গল্পসমগ্র	পত্রভারতী	২০০৪
২৩৭. রেনবো অর্কিড রহস্য	অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স	২০০৪
২৩৮. সিন্দুক ও প্রতিমা রহস্য	পত্রভারতী	২০০৪
২৩৯. আশ্রয়	এ পি পি	২০০৪
২৪০. রাজার ঘাটের উপাখ্যান	অপর্ণা বুক	২০০৪
২৪১. কর্ণেলের তিনটি রহস্য	পত্রভারতী	২০০৫
২৪২. আরও এক ডজন কর্ণেল	পত্রভারতী	২০০৫
২৪৩. পাঁচটি রহস্য উপন্যাস	পত্রভারতী	২০০৫
২৪৪. লালুবাবুর অন্তর্ধান রহস্য	দে'জ পাবলিশিং	২০০৫
২৪৫. মেঘের পরে রোদ	অপর্ণা বুক	২০০৫
২৪৬. স্রোতে ভেসে আছি	করুণা প্রকাশনী	২০০৫
২৪৭. পঞ্চাশটি গল্প	দে'জ পাবলিশিং	২০০৭
২৪৮. কথামালা ১	কারিগর	২০১২

পরিশিষ্ট-৩

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বংশতালিকা

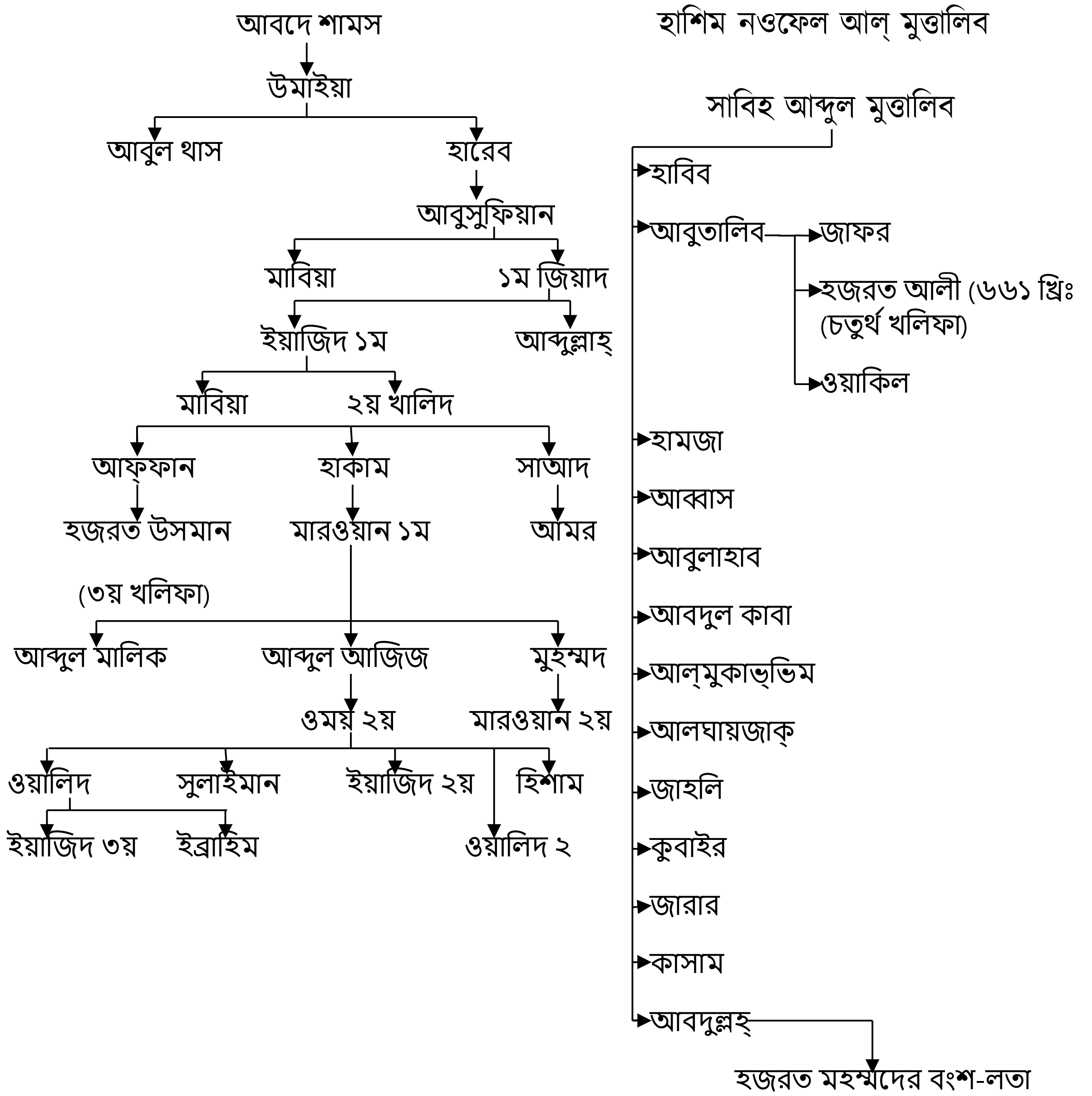

হজরত মহম্মদের বংশ-লতা

১. হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)

+হজরত খাদিজা বিন্তে খোয়েল্‌দ্

২. হজরত ফতিমা জোহ্‌রা

২. হজরত ফতিমা জোহ্‌রা

হজরত আলি মরতাজা

ইমাম হাসান   জয়নাব   ৩. ইমাম হুসাইন   উম্মে কুল্‌সুম   রুকাইয়া   মুহ্‌সীন

+শাহার বানু

মুহম্মদ   আউয়াল

কাসিম   ইবনে হাসান মুসান্না   আবদুল্লাহ্

ইবনে হাসান মুসান্না

আবদুল্লাহ্

মুহম্মদ নফসে জাকিয়া   ইদ্‌রিস   ইব্রাহিম

হাসান

সকিনা   আলী আকবর   আলী আওসাদ   খাতিমা সুগরা   আলী আস্‌গর

৪. আলী ইমাম সানী

ওরফে জয়নুল আবিদীন

৫. ইমাম মুহম্মদ আল্ বাকির   ইমাম জায়েদ

৬. ইমাম জাফর আস্‌সাদিক   ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া

ইমাম ইসমাইল   ৭. ইমাম মুসা আল্ কাজিম

মুহাম্মদ বিন্ ইসমাইল   ৮. ইমাম আলী আর্ রিজা

জাফর আল্ মুসাদ্দিক   ইমাম তকী অল্ জওয়াদ

হাসান ইব্‌নে জাফর   ইমাম আলী আন্ নকী

আলী ইব্‌নে হাসান   ইমাম হাসান আল্ আশকারী

ইমাম মুহম্মদ আল্ মাহ্‌দী

(আল্ মন্তাজার

মুহম্মদ আল্ হাবিব   মাহ্‌বুব আল্ মুস্তাফা   উম্মেতাহিরা

জহুরা আন্ নাসিমা   ৯. ইমাম আহ্‌মদ আন নাজী

ওবায়দুল্লাহ্ অল্ মাহদী   ১০. ইমাম মুহম্মদ আশ্‌শাফী

(আফ্রিকায় ফাতিমীয় খিলাফৎ   ১১. ইমাম মাহ্‌মুদ আর্ রাজী

ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা)

ওবায়দুল্লাহ্ অল্ মাহদী
(আফ্রিকায় ফাতিমীয় খিলাফৎ
ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা)
আল্ কায়িম
আল্ মন্সুর
আল্ মাঈজ
আল্ আজিজ
আল্ হাকিম
আজ্ জাহির
আল্ মাস্তান্সীর
আল্ মোস্তালী মহম্মদ আল্ মুস্তাফা নাজার
আল আমীর আজ্ হাফিজ
আল্ ইউনূস আল্ জাফির
আল্ আজিদ আল্ ফাইজ

১২. ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আল্হাদী
১৩. ইমাম সৈয়দ আবুজাফর আল্ খাজিন
১৪. সৈয়দ আবুল আলিম মুহম্মদ হুসাইন
১৫. সৈয়দ আবুল কাসিদম আলী ইব্নে হুসাইন
১৬. সৈয়দ আবুল ফজল আহ্মদ আলী
১৭. সৈয়দ আবু রায়হান মাহ্মুদ হুসাইন
১৮. সৈয়দ আবু ইউসুফ্ নস্র তুল্লাহ্
১৯. সৈয়দ আবু তাইয়ের আমানুল্লাহ্
২০. সৈয়দ আল ফয়েজ শহীদ হুসাইন
২১. সৈয়দ আবু জাফর মুহম্মদ সবনুল্ হুসাইন
২২. সৈয়দ আবুল হাসান জাবির আল্ এফ্লাহ্
২৩. সৈয়দ আবুল হাশিম মুহিউদ্দীন
২৪. সৈয়দ আবুলফজল জামাল-উদ্দীন
২৫. সৈয়দ আবুল খায়ের মাম্লেহ্-উদ্দীন
২৬. সৈয়দ আলাউদ্দীন
২৭. সৈয়দ গিয়াস-উদ্দীন
২৮. সৈয়দ মিনহাজ-উদ্দীন
২৯. সৈয়দ মঈন-উদ্দীন
৩০. সৈয়দ জয়্নুল্ আবিদীন
৩১. সৈয়দ আঈনুল্ আরিফীন
৩২. সৈয়দ মুর্শিদুল মুয়াহিদীন
৩৩. সৈয়দ মমতাজ-উদ্দীন
৩৪. সৈয়দ রশীদ-উদ্দীন
৩৫. সৈয়দ মিসবাহ্ উদ্দীন
৩৬. সৈয়দ মুস্তাফারহ্মতুল্লাহ্
৩৭. সৈয়দ মুহম্মদ নিয়ামতুল্লাহ্
৩৮. সৈয়দ আমানুতুল্লাহ
৩৯. সৈয়দ আলী আতাউল্লাহ্
৪০. সৈয়দ আবুল কালাম মুহম্মদ

৪১. সৈয়দ আলীইব্নে মুহম্মদ

৪২. সৈয়দ হাসান আস্গর

৪৩. সৈয়দ আলী আকবর

৪৪. সৈয়দ রফিউদ্দীন

৪৫. সৈয়দ আহ্মদ জমিল

৪৬. সৈয়দ কমর্-উজ্জমান

৪৭. সৈয়দ হাশ্মত জালাল

৪৮. সৈয়দ রওশন জমীর

৪৯. সৈয়দ শওকত জাহান

৫০. সৈয়দ কওসর আলম

৫১. সৈয়দ গুল্জার হুসাইন

৫২. সৈয়দ গুল্ মুহম্মদ আকরম হুসাইন

৫৪. সৈয়দ আহ্দ আলী হুসাসন সৈয়দ মুর্তজা আলী হুসাইন সৈয়দ মাহ্মুদ আলী হুসাইন

সৈয়দ জাহিদুন্নিসা বেগম | সৈয়দ আবদুস সামাদ | সৈয়দ আতাউল হক | সৈয়দ আবদুল গফুর | সৈয়দ আবদুস সবুর

হাজি নূর মুহম্মদ ওরফে আবদুল কাদের | সৈয়দ নেকনিসা বেগম

আনোয়ার হুসাইন | নাসিমা তুন্নিসা | তাহিরা | খাদিজা (খুদোন বিবি)

বদিউন্নিসা আবুল বাশার জমিলা (হাবোল) | আবু রাশেদ

৫৫. সৈয়দ আবদুল আহাদ

- আবদুস সালাম
- আশ্‌রাফুন্নিসা
- আবুল কালাম
- জুবাইদা
- তশ্‌রীফুন্নিসা
- মুশার্রিফুন্নিসা
- আবদুল আজিজ
- আমিনা খাতুন

৫৬. আবদুল রহমান ফেরদৌসি

- ৫৭. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
- আনোয়ার আলম
  - সৈয়দ সুশোভন রফি
  - সৈয়দ নীলাঞ্জন শফি
  - সৈয়দা রেবেকা নাজনীন শম্পা (পিসি)
- শামসুল্ আজাদ
- মতীন হায়দার
- খালেদ নৌমান
- কওসর জামাল
- আহ্‌সান জমীল
- শাহ্‌মত জালাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

- অভিজিৎ সিরাজ — নমিতা সিরাজ
  - বৃষ্টিকণা সিরাজ
- অমিতাভ সিরাজ — সম্পা সিরাজ
  - সবুজশ্রী সিরাজ
- নিনা সিরাজ
- পুতুল সিরাজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আব্দুর রহমান ফেরদৌসি প্রণীত পারিবারিক গ্রন্থ 'মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ'।

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

আকর গ্রন্থ :

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৫।

২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১৫।

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উপন্যাস সমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ২০১৫।

৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : তৃণভূমি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪০৩।

৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম (করুণা) সংস্করণ, বইমেলা, ১৯৯৮।

৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : স্রোতে ভেসে আছি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৫।

৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : অলীক মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪।

৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-

৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : উত্তর জাহ্নবী, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নীল ঘরের নটী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ : ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : হিজলকন্যা, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৩, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রাণীঘাটের বৃত্তান্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।

১৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : জিরো জিরো নাইন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৯৯।

১৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : একালের বাংলা গল্প, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫।

১৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নির্বাচিত রচনা, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : প্রেমের প্রথম পাঠ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-

০৭, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : রোড সাহেব, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০ প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

২০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সোনালী আঙুরগুচ্ছ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

২. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস : আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৮।

৩. আলম, মাহবুবুল : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১০।

৪. আলম, মোঃ জাহাঙ্গীর : বাংলা উপন্যাসে খল নর ও নারী চরিত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।

৫. আল, হেলাল বশীর : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা (বাংলাদেশ), দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

৬. আহমদ, ওয়াকিল : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৩।

৭. আচার্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

৮. ইমরান, মাসউদ (সম্পা.) : ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

৯. ইসলাম, আমিনুল : বাঙালি দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মার্চ, ২০১১।

১০. ইসলাম, ড. সা'আদুল : বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০০৩।

১১. ঈগলটন, টেরী : মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা, দীপায়ন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০০৮।

১২. খান, লায়েক আলী : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র,

সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০০।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন : রাজনীতির অভিধান, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৩।

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : লাল মাটি, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : বইমেলা, ১৯৯৮।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : টেনিদা সমগ্র, সংকলন ও সম্পাদনা-প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৪০৫।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : বাংলা গল্প-বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪০১।

১৮. গোস্বামী, অচ্যুত : বাংলা উপন্যাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮।

১৯. গোস্বামী, অঞ্জন : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

২০. গুপ্ত, রবীন্দ্র : উপন্যাস জিজ্ঞাসা, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ২৮

আগস্ট ১৯৯৫।

২১. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-১, গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০২।

২২. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-২ গ্রন্থ নিলয়, দ্বিতীয় সংস্করণ : ৮ আগস্ট, ২০০১।

২৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৩, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম সংস্করণ : ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

২৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৪, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০০২।

২৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৫, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

২৬. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর : (প্রথম খণ্ড কথাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প এবং তত্ত্ব), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৭।

২৭. ঘোষ, মহুয়া : হুতোম প্যাঁচার নকশা : নকশার আরশিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮।

২৮. ঘোষ, বিশ্বজিৎ : বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০২।

২৯. ঘোষ, তপোব্রত : শ্রীবিলাসের ডায়ারি, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৩০. ঘোষ, শঙ্খ
আচার্য, নির্মাল্য (সম্পা.) : সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৫।

৩১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০০।

৩২. চন্দ্র, অরূপ (সম্পা.) : বাংলার হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ এবং মুর্শিদাবাদ, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৩. চন্দ্র, অরূপ : মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের কালপঞ্জি, বাসভুমি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৩৪. চন্দ, বীরেন : বিষয় : বাংলা উপন্যাস (সংযোন খণ্ড), উত্তরধ্বনি, ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

৩৫. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, বর্ণালী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

৩৬. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষন, পুস্প, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯।

৩৭. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার : বাংলা সাহিত্যে মা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৩।

৩৮. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পা.) : শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০৩।

৩৯. চক্রবর্তী, রামী : মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৪০. চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

৪১. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পা.) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১৩ (ব.)

৪২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.) : বুদ্ধিজীবীর নোটবই পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৪৩. চক্রবর্তী, ড. শংকরপ্রসাদ : বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্ব (১৯৪২-১৯৪৭), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৪৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল : সাহিত্যের রুপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

৪৫. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-০৯, এপ্রিল, ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

৪৬. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, নবেন্দু (সম্পা.) : অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩।

৪৭. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর : বন্দর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২।

৪৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ : বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬।

৪৯. চট্টোপাধ্যায়, বিমলভূষণ : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬।

৫০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব : শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১৬, পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৮।

৫১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (সম্পা.) : তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেও, বঙ্গীয়

সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাস পূর্ণিমা, ১৪০৭।

৫২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩।

৫৩. চৌধুরী, অজিত : উপনিবেশের হেজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে, অবভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮।

৫৪. চৌধুরী, ড. সুবোধ : সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৮।

৫৫. চৌধুরী, সুশীল : নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৫৬. জাহান, সারোয়ার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূল্যায়নের পালাবদল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

৫৭. ঝা, শক্তিনাথ : আলকাপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৫৮. ঝা, শক্তিনাথ : ঝাঁকসু লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

৫৯. দে, আশিস কুমার : শৈলী ও শৈলী বিজ্ঞান, ভাষা পত্রিকা, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।

৬০. দে, আশিস কুমার : সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

৬১. দত্ত, উত্তম : বর্ণমালার দিব্যি, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬।

৬২. দত্ত, সম্রাট : আখ্যান ব্যাখ্যান ও গদ্যচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দোলযাত্রা, ২০১৭।

৬৩. দত্ত, সম্রাট : বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৬৪. দত্ত, সরোজ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৬।

৬৫. দত্ত, সরোজ : কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

৬৬. দত্ত, বীরেন্দ্র : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮।

৬৭. দত্ত, বিজিতকুমার : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

৬৮. দত্ত, ভবতোষ	:	চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।
৬৯. দত্ত, ভবতোষ	:	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫।
৭০. দাস, অরূপকুমার	:	ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২।
৭১. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.)	:	স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।
৭২. দাস, কল্যাণকুমার (সম্পা.)	:	সৈয়দ খালেদ নৌমন, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।
৭৩. দাস, বেলা চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পা.)	:	বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।
৭৪. দাস, সীমারেখা	:	নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।
৭৫. দাস, বেলা	:	বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯।
৭৬. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ	:	যুগ বদলে বাংলা উপন্যাসে রূপবদল, দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

৭৭. দাশগুপ্ত, রাহুল : আখ্যানের দুনিয়া, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১০।

৭৮. দেবী, অনুরূপা : মা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩২১।

৭৯. দেবী, মহাশ্বেতা : অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩১৫।

৮০. নন্দী, রতনকুমার : অরণ্যের অধিকার মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮১. পাল, রবিন : উপন্যাসের উজানে, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭।

৮২. পাল, রবীন : উপন্যাস দ্য ও পাশ্চাত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১১।

৮৩. পাল, প্রশান্তকুমার : রবি জীবনী (সপ্তম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭।

৮৪. ফেরদৌসি, আব্দুর রহমান : মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র : মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড

কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৯।

৮৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : অন্তর্বয়ন : কথা সাহিত্য, একুশে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০।

৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৭।

৮৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭২।

৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৩।

৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০ মে, ১৯৯৬।

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।

৯৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতীম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪

৯৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. দেবদ্যুতি : কথাসাহিত্য প্রকরণ, বি. বি. কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৬।

৯৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

৯৬. বিশ্বাস, ড. মাধুরী : উপন্যাসের কথা : নির্মাণের নতুনরীতি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

৯৭. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : দেশভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদ চরিতাভিধান, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

৯৯. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : মুর্শিদাবাদে মন্বন্তর, আকাশ, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০০. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস : রবীন্দ্রনাথ ও মুর্শিদাবাদ, ছাপাখানার গলি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩।

১০১. বিশ্বাস, সর্বাণী : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম

প্রকাশ : ২০০৭।

১০২. বেরা, নলিনী : শবর চরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫।

১০৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন : ইতিবৃত্তে চণ্ডালজীবন, প্রিয়শিল্প প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১০৪. বসু, নির্মলকুমার : হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯।

১০৫. বসু, বুদ্ধদেব : রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩।

১০৬. বসু, নৃপেন্দ্রকুমার : ফয়েডের নারী চরিত্র, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ট সংস্করণ, ২০০৮।

১০৭. বসু, বুদ্ধদেব : সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ২০০০।

১০৮. বসু, স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : ২০১৪।

১০৯. বসু, ড. দেবকুমার : কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৪।

১১০. ভদ্র, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) : নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৪, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮, সপ্তম

মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১২।

১১১. ভদ্র, গৌতম : নিসর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৮।

১১২. ভদ্র, গৌতম : ইমান ও নিশান, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

১১৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

১১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দীপাবলী, ২০১০।

১১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৪১২।

১১৬. ভট্টাচার্য, তপপাধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৭।

১১৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : বাখতিন, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০২, এবং মুশায়েরা সংস্করণ আগস্ট, ২০০৯।

১১৮. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন : তারাশংকর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরজশাহ রোড, নতুন দিল্লি-০১, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১১৯. ভট্টাচার্য, বীতশোক : কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৯০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

১২০. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১২১. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন : বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১২২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের আলো আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।

১২৩. ভট্টাচার্য, দেবাশীষ : বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিমবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১২৪. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশনাথ : মনোবিদ্যা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭০।

১২৫. ভট্টাচার্য, বিজন : জনপদ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫২।

১২৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০।

১২৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

১২৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৩।

১২৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৪।

১৩০. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৫, তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১২।

১৩১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৩।

১৩২. মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তরুণ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ স্মরণে, চিন্তনে, মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ (ব.)

১৩৩. মুখোপাধ্যায়, জগমোহন : গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৯২।

১৩৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১৩।

১৩৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : প্রাক-পলাশী বাংলা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২।

১৩৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০১।

১৩৭. মুখোপাধ্যায়, অশোক : সংসদ বানান অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

১৩৮. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : দুখে কেওড় চরিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০২।

১৩৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্র-জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৯ম মুদ্রণ, ২০১৫।

১৪০. মুখোপাধ্যায়, উর্বী
চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা.) : বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৪১. মুখোপাধ্যায়, উর্বী : অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৬।

১৪২. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮।

১৪৩. মণ্ডল, তুলসীচরণ : আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১৪।

১৪৪. মণ্ডল, সেলিম বক্স : বস্তুবাদী সাহিত্যপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৪৫. মণ্ডল, বরেন্দু : লিটিল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্ত, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৭।

১৪৬. মণ্ডল, চিত্ত : নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬।

১৪৭. মণ্ডল, উৎপল
মজুমদার, কামনা (সম্পা.) : মহাশ্বেতার গল্প : মহাশ্বেতার সন্ধানে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১৪৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তাক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯৮।

১৪৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ৩০ শ্রাবণ, ১৩৪৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

১৫০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রুপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩।

১৫১. মজুমদার, কমলকুমার : অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৩।

১৫২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

১৫৩. মান্না, গুণময় : বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাজিক, ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৫।

১৫৪. মুরশিদ, গোলাম : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ : জলাই, ২০১৫।

১৫৫. মিশ্র, বাণীপ্রসন্ন : আবহমান বাঙালি প্রত্যাহ্বান ও প্রত্যনুসন্ধান, গ্রন্থিক, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

১৫৬. মিশ্র, ভগীরথ : মৃগয়া (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

১৫৭. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ : মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

১৫৮. মিত্র, কাশীকান্ত : গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী, রবীন্দ্র লাইব্রেরী,

কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৫।

১৫৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র : ঘনাদা সমগ্র-১, সম্পাদনা-সুরজিৎ দাশগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২।

১৬০. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ : ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।

১৬১. রায়, অপূর্ব কুমার : শৈলী বিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৬।

১৬২. রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৯।

১৬৩. রায়, অলোক (সম্পা.) : সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১০।

১৬৪. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালিন বাংলা কথাসাহিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।

১৬৫. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং,

কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী, ২০০১।

১৬৬. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৩।

১৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, প্রথম বর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ২০০৬।

১৬৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০০।

১৬৯. রায়চৌধুরী, লাভলী মোহন : ইতিহাস নানাবিধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১৭।

১৭০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।

১৭১. রশীদ, ফকির আব্দুর : সুফী দর্শন, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

১৭২. রহমান, ড. শাহীদা : রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকারচেতনা, সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

১৭৩. শ, ড. রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

১৭৪. শ', ড. রামেশ্বর ও শ', হেনা (সং, ও সম্পা.) : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৪ শে নভেম্বর, ২০০৮।

১৭৫. সেন মজুমদার, জহর : উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।

১৭৬. সরকার, পবিত্র : কথা সুত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১০।

১৭৭. সামন্ত, সুবল (সম্পা.) : বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অধীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১১।

১৭৮. সেন, দীনেশচন্দ্র : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।

১৭৯. সেন, নব্যেন্দু (সম্পা.) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, রত্নাবলী,

৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৯।

১৮০. সেন মজুমদার, জহর : উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০১।

১৮১. সেন, অঞ্জন
সিংহ, উদয়নারায়ন (সম্পা.) : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০১০।

১৮২. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৮, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ : মার্চ, ২০০৩।

১৮৩. সান্যাল, অরুণ (সম্পা.) : প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।

১৮৪. সেন, অভিজিৎ : রহু চণ্ডালের হাড়, জে. এন. চক্রবর্তী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০।

১৮৫. সিকদার, অশ্রুকুমার : ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৬. সিকদার, অশ্রুকুমার : সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

১৮৭. হাজরা, দিলীপ
বর্মন, অমিতকুমার : বাংলা উপন্যাসের পালাবদল, বঙ্গীয় সাহিত্য, সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

১৮৮. হাসান, জাহিরুল : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ, পূর্বা, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১৮।

১৮৯. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫।

১৯০. হাসান, জাহিরুল : বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯১. হাসান, জাহিরুল (সম্পা.) : বিশ শতকের বাঙালি প্রতিভা, মডেল পাবলিশিং হাউস, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০০১।

১৯২. হাসান, মইনুল : আধুনিকতা ও বাংলার মুসলমান সমাজ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪১৭।

১৯৩. হারুণ, শরীফ : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৯।

১৯৪. হারুণ, শরীফ : অস্তিত্ববাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

১৯৫. হোসেন, সোহরাব : বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৪।

১৯৬. হোসেন, সেলিনা : স্বদেশে পরবাসী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

১৯৭. হোসেন, সৈয়দ আকরাম : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১।

১৯৮. হালিম, মোঃ আব্দুল : দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৩।

১৯৯. হাশমী, তাজুল ইসলাম : ঔপনিবেশিক বাঙলা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৫।

২০০. হাবিব, ইরফান : মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি (৬৫০-১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ), এন. বি. এ. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১১, অনুবাদ : শুভাশিস ঘোষ।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

1. Abrams, M.H. : A Glossary of literary Terms, Sixth Edition, Prism Books Pvt. Ltd, Bangalore, Harcourt Brace & Company.

2. Baba, Homi : Unsatisfied Notes on vernacular compolitanism, Text and Nations : cross Disciplinary Eassays on culturar and National Identities, ed-laura Garcia, Columbia, Sc Camden house, 1996. (www.google.com)

3. Bhattacharji, Sukumari : Myth, Progressive Publishers, Kolkata, Reprint: January, 2018.

4. Baker, Emilie Kip : Stories of old Greece and Rome, New York the Macmillan Company, USA, 1913.

5. Bakthin, Mikhail : 'The Dialogic imagination : Four Eassays', Edt, by Michael Halquist, University of texas Press, Austin and London, 1981, p.366. (www.google.com)

6. Bhartiya (Ed.), Santosh : Dalit and Minority Empowerment, Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2008.

7. Butcher, S. H. : Aristotle's theory of poetry and fine art, (Translated with Kalyani Publishers, New Delhi. 2, critical notes by) Reprinted, 2012.

8. Cuddon, J. A. : The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, New Delhi-11, Reprinted, 1999.

9. Dutt (Ed.), KC : Who's Who of Indian Writers 1999 Vol.2, Sahitya Akademi, New Delhi, 1999.

10. Das, Suranjan : Communal Riots in Bengal 1905-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991.

11. Deen, Hanifa : The Crescent and the Pen: The Strange Journey of Taslima Nasreen, Praeger Publishers, USA, 2006.

12. Forster, F. M. : Aspects of the Novel, Penguin Books, England, Reprinted, 1964.

13. Gupta, Bishan Kumar : Political Movements in Murshidabad 1920-1947, Manisha Granthalaya, 1992.

14. Gastrell, JE : Statistical and Geographical Report of the Moorshedabad District, Bengal Secretariat Office, 1860

15. Glynn, Sarah : Class, Ethnicity and Religion in the Bengali East End : A Political History, Manchester University Press, UK, 2014.

16. Hayat, Abul : Mussalmans of Bengal, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2008.

17. Ikram, S. M. : Indian Muslims and Partition of India,

Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1992.

18. Karim, Abdul : Murshidkuli khan and His Times, Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2011.

19. Levi-Strauss : MYTH AND MEANING, SCHOCKEN BOOKS NEWYORK, Foreword Copyright @ 1995.

20. Santosh, de Sousa : Towards a New legal common sense, 2nd Edt. Lexis Nexis Butterworths, London, 2002. (www.google.com)

পত্র-পত্রিকা :

১. অন্য একলব্য : ২০১৩ (জানুয়ারি-মার্চ)

২. অমলকান্তি : ২০১২ (জুলাই)

৩. অর্কেস্ট্রা : ২০১৩ (অক্টোবর, সিরাজ সংখ্যা)

৪. অর্কেস্ট্রা : ২০১৩ (ফেব্রুয়ারি, সিরাজ স্মরণ)

৫. আজকাল : ২০০৩ (২৫ আগস্ট)

৬. আজকাল : ২০১৭ (২০ সেপ্টেম্বর)

৭. আজকাল : ২০১৭ (রবিবাসর, ২২ অক্টোবর)

৮. বইয়ের দেশ : ২০১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)

৯. এই সময় : ২০১০ (এপ্রিল)

১০. ঐক্য পত্রিকা : ২০১৩ (অক্টোবর, বিশেষ সংখ্যা)

১১. সমকালের জিয়নকাঠি	:	২০১৩ (জুলাই-ডিসেম্বর, বিশেষ সংখ্যা)
১২. সান্ধ্য ভাষা	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৩. প্রতিক্ষণ	:	১৯৯৫ (ফেব্রুয়ারি)
১৪. দেশ	:	১৯৯৩ (২৪শে এপ্রিল)
১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
১৬. আমার সময়	:	২০১০ (এপ্রিল)
১৭. এবং সংস্কৃতি	:	২০১৬ (জুলাই)
১৮. এবেলা	:	২০১৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি)
১৯. সকালবেলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)
২০. নিউজ বাংলা	:	২০১২ (৫.৯.২০১২)

‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা
অক্টোবর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষ

আলিপনুর আহমেদ

সাহিত্যিক সিরাজকে (১৯৩০-২০১২) আমরা অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখেছি 'শিল্পী' সিরাজ তাঁর জীবনের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতি তাঁর ভালোলাগা ও ভালোবাসার জায়গা। মাঠে-ঘাটে, মেলায়-পার্বণে ঘুরতে ঘুরতে সিরাজ আলকাপ দেখেছেন। আলকাপের প্রতি এক দুর্নিবার টান অনুভব করেছেন। 'আল' কথার অর্থ বন্ধনী, 'কাপ' মানে নাটক। যে নাটক দর্শকের বন্ধনীর মধ্যে শুরু হয়, তাকে বলা হয় আলকাপ। আলকাপ জীবনের এই অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচনা করেছেন কালজয়ী উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ'। কিংবদন্তীর নায়ক' উপনাসের মধ্য দিয়ে সিরাজের পথ চলা শুরু। যদিও 'নীল ঘরের নটী' (১৯৬৬) তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। নিম্নে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি অবলম্বনে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'তৃণভূমি' উপন্যাসে দ্বারকা নদী গ্রামবাংলার জীবন প্রবাহ রূপেই দেখা দিয়েছে। লৌকিক পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ গ্রামজীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতীকরূপেও নদীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা এই উপন্যাসে শিল্প স্বীকৃতি পেয়েছে। ধনী শুভেন্দু-পরাশরের দলের কাছে গরিব বিলচরা মানুষেরা পরাভূত হয়। হেরে যায় টুড়ু-মানিক-অরুন্ধতী। খড়ের বনে তারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। হেরে যায় মাঠচরানী বেদে, সাঁওতাল, খেতমজুরের দল। নিশানাথের মনে হয় এমনি করেই থাকতে হবে শুধু এবং এটাই জীবন— এই নির্বেদ, এই ক্ষমাতীত অস্তিত্ব। আগুনে পোড়া মৃত্যুমুখী অরুন্ধতীকে দেখে নিশানাথের চোখে জল আসে। মনে হয় "তোমার নরম বুকে ওদের জন্য এত ভালোবাসা ছিল অরুন্ধতী!"[১] নিশানাথ চরিত্রটি যেন প্রকৃতির প্রতিলিপি। তাই আধুনিকতার জটিল মোড়কে প্রবৃত্তিকে দমন করতে শেখেনি। নিশানাথই বলতে পারে "ভালোবাসার জন্যই হয়তো মানুষকে বারবার জন্মাতে হয়।"[২] এই ভালোবাসাকে মূলধন করেই সে অদম্য জেদ আর দূরবর্তী স্থির লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলে। স্থান-কাল-চরিত্রের পার্থক্য সত্ত্বেও নিশানাথ যেন মনে করিয়ে দেয় ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশোকে। আগামী উজ্জ্বল প্রভাতের জন্য নিশানাথ অপেক্ষা করে থাকে।

'তৃণভূমি'-র মতো 'হিজলকন্যা' উপন্যাসেও সমাজ চেতনার নিদর্শন দেখতে পাই। এখানে 'এক নয়া আবাদের কিসস(-র কথা শোনাতে চেয়েছেন লেখক। হিজলকন্যা কথার অর্থ খারাপ মেয়ে, বনচরা মেয়ে। এর অন্য অর্থ সাহসিনী। রাহেলা, ফুলি আর চুমকি তিন

হিজলকন্যা। তিনকন্যা একাকীত্বের নির্মম শিকার। রাহেলা চিরজীবন অন্ধকারে হেঁটে বুড়ি হয়ে গেল। আর ফুলি তার প্রাণপ্রিয় রবার্টকে নিজের অজান্তে হত্যা করে ফেলে। এক সমুদ্র ব্যথা নিয়ে অস্তিত্বের ভার বহনে ক্লান্ত হয়ে হারিয়ে গেছে ফুলি। বহ্নি বুভুক্ষু পতঙ্গের মতো আকাশ চুমকির রহস্যে মুগ্ধ। গন্ধলতার আবিলতায় তারা পথ হারিয়েছে। আশ্চর্য শরীর অরণ্যে রাঢ় অঞ্চলের 'নগরবাহিরি'যে সব নারীরা তাদের জীবনের সমস্ত অপমান আর অন্যায়কে তুচ্ছ করে টিকে থাকার লড়াই চালিয়েছে, সেইসব ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত ফুটে ওঠে সিরাজের লেখনীতে। হিজলকন্যা উপন্যাসের এই অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা, যারা সমাজের আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতোই পড়ে আছে তাদের কথাই বলতে চেয়েছেন লেখক।

জটিলতা, গভীরতা, বিশ্লেষণ, চরিত্রের আত্মসমীক্ষা, বিষণ্ণতা, নানা রহস্যময় মুহূর্ত ফুটে উঠেছে সিরাজের 'বাসস্থান' উপন্যাসে। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীন হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে, যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে আছে আদিম অন্ধকার। এখানে সেই সব চরিত্রেরই দেখা পাই যারা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে চেয়েছে জীবনের স্বাধীন ভূমিতে। এই উপন্যাস স্বাধীনতা অভিলাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার উপাখ্যান। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এইভাবে—"রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়াড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচায়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডঠো ভয় পেয়েছে।"[৩]

'বাসস্থান' উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে শরীরী অনুষঙ্গ, "মাগীরা এতকাল চোখঠার, একঝিলিক হাসি, দোদুল্যমান বক্ষ এবং পশ্চাদ্দেশ দেখিয়েই কত মণ লাক্ষ্য ছিঁড়েছে বলা নয়।"[৪] কিংবা দিয়াড়নীরা যখন নবাবগঞ্জের বাজারে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে তখন "ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টিজনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন তৃষ্ণার দিনে নিটোল তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।"[৫] এখানে প্রতীকের ব্যবহার আলোড়িত করে আমাদের। মনস্তাত্ত্বিক কলেবর বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন সিরাজ।

ডুমুরের সঙ্গে মামুনের প্রেম 'প্লেটোনিক' হয়ে আসতেই পারে না। দিনের দীনতা আর রাতের লিবিডোর সহজ যোগফলেই সেখানে সচল থাকে যূথবদ্ধ জীবন প্রবাহ। তাদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিরাপত্তাহীন জীবনে জৈব তাড়নাই বড় কথা। সেখানে মনের টান সেভাবে নেই। তাই মামুনের অন্তর্বাস্তবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এক চরম সত্য—"ডুমুর তার বউ হবে কী! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্ত মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে। বড় জোর এটা শারীরিক কিছু ঘটানো যায়—কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগানো কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।"[৬] এখানে চরিত্রের সামগ্রিক জীবনচর্যায় যৌনতার যে ভূমিকা স্পষ্ট, তাকে নিতান্ত অতীন্দ্রিয় মনে না করে কেউ

যদি একজন সৃষ্টিশীল মানবের জীবনবোধের সামগ্রিকতায় বিন্যস্ত করতে চান, তাহলে তাকে কিন্তু হেয় করা চলে না।

'তখন কুয়াশা ছিল' এবং 'হেমন্তের বর্ণমালা' ভিন্নধর্মী উপন্যাস। প্রথমটিতে পাই এমন এক সরল, লাজুক একটি ছেলের কথা, যাকে সকলে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে তাকে একটি মেয়ের দায়িত্ব দিলে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জেগে ওঠে পৌরুষ, শুরু হয় তার নয়া রাস্তার অন্বেষণ। এই উপন্যাসের সিরাজ যেন সার্চলাইট ফেলে নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের অন্ধকূপে নিমজ্জমান গ্রামবাংলার ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। অনুভূতি দিয়ে তিনি দেখেছেন, বিজ্ঞানের অন্তহীন সফলতার যুগে গ্রামের মানুষের কাছে নেই জাগতিক আলো। তারা নিরক্ষর, দুবেলা পেঠ ভরে খেতে পায় না। চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যায় হেমন্তের ঝরা পাতার মতো।

উনিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলমান পির পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক জীবনের কাহিনিই 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে উপজীব্য। টুকরো টুকরো কোলাজ মিলে জন্ম নিয়েছে এক অপরূপ চিত্রলিপি। তাঁর বাক্যতত্ত্বের নিজস্ব আবিষ্কারে রয়েছে অসাধারণ কুশলতার পরিচয়। স্বপার্জিত জীবনবোধের দ্বারা লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার প্রতিস্পর্ধী। গতির মাঝখানে সংগ্রামী মানুষ কেমনভাবে অলীক মানুষ হয়ে ওঠে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুটি—ধর্মগুরু বদিউজ্জমান এবং তার নাস্তিক ও বিদ্রোহী পুত্র শফিউজ্জমান. ওদের একজন মনে করেন মানুষের ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর, অন্যজন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা—একথা স্বীকার করেন। কেবল মুসলিম জীবনভাষ্য নয়, একদিকে যেমন মুসলিম ধর্মগুরু, তেমনি অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের পটভূমি এসেছে ঘুরে ফিরে। হিন্দু-মুসলমান আন্তঃসম্পর্ক উদ্ভাসন হয়ে উঠেছে কাহিনির অন্যতম উপকরণ।

বাংলাভাষী মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলিও সিরাজের তীক্ষ্ণ, সাবলীল গদ্যের ভেলায় চড়ে এগিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। বাংলাভাষী মুসলমানদের মুখের ভাষা 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বদিউজ্জমানের এক বিশেষ মুহূর্তের অন্তর্বাস্তব প্রসঙ্গে লেখক বলেন—"চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গন থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসদিজসুদ্ধ তাঁকে যেন 'গায়রত' (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন।"[৭] আবার প্রবৃত্তি বশীভূত শফি-উজ্জমানের পরাভূত হওয়ার ভঙ্গিটিতে সিরাজের সংযম প্রশংসিত। আধুনিক কবিতার পর্যায়ে উন্নীত—"জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিসফিস ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জামবাটিটি তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাস ঢাকা মাটিতে বিধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগল। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন,পুরোপুরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা

হাহাকার করতে করতে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।"[৮]। নিসর্গ আর মানুষ এখানে একাকার। এইখানেই সিরাজের বিশিষ্টতা।

১৯৫০-৫৬ পর্যন্ত ছ'সাতটা বছর সিরাজ ছিলেন আলকাপ দলে। সেখানে তিনি তারাশঙ্করের 'রবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের মতো নেচে নেচে ঝুমুর দলে গান করেছেন। এই দলের মানুষজনকে নিয়েই তার সময় কেটেছে বহু বিচিত্রঅভিজ্ঞতায়। এই সময়ের প্রতিফলনই 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক সনাতন কুমার রায় বা সনাতন মাস্টার। সনাতন সাঁওতালপাড়া আলকাপ দলের মাস্টার। উপন্যাসে সনাতন মাস্টারের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই ঔপন্যাসিকের জীবনাগত। সনাতন একসময় বাঁশি বাজাত এবং হাবোল গোঁসাইয়ের কাছে গান শিখত; যা ঔপন্যাসিকের জীবনেও ঘটেছে। এইভাবে তিনি একের পর এক ঘটনা বুনে বুনে চলেছেন, যা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। এই উপন্যাসের নায়ক অনেকের মাঝখানে থেকেও আশ্চর্য একা। চারদিকে তার নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধ্য বলয়।

উপন্যাসে সাঁওতাল পাড়ার দলের অন্যান্য সদস্যরাও বাস্তব। একমাত্র কালা আর কাবুল ছাড়া প্রত্যেকেই সাঁওতালপাড়ার লোক। কালা, কাদের, নপর আলি স্ব-মহিমায় বর্তমান। সুধাও বাস্তবভিত্তিক চরিত্র। 'মায়ামৃদঙ্গ' সিরাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফল। এই উপন্যাস দুঃখী মানুষের চিরন্তন অপ্রাপ্তির ইতিহাসে পূর্ণ। অ-সুখের অপূর্ণতা তাদের মনের মধ্যে অনুভূতির স্পর্শ আনে। অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শিল্পীত ফর্মে নির্বিশেষ করতে হয়, ব্যক্তিসমূহ এবং ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিকেও নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে একই সঙ্গে আনতে হয়, তার মহৎ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে।

জীবনবোধের গভীরতা সিরাজের ভাষায় কাব্যসৌন্দর্য দিয়েছে। কাহিনিতে 'ক্যারেকটারস পোরশান' কাটা উক্তি-প্রত্যুক্তিতে রচিত। এই প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার নাশে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তাকেও লেখক হাজির করেছেন। এখানে খুঁজে পাই একজিস্টেসিয়ালিজমের অমোঘ ছায়া। 'নিশিলতা' উপন্যাসটি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানীচকের রুদ্রদেবের মেলা-ই এই উপন্যাসের ভিত্তিমূল। সেই মেলাতেই দেখতে পাই পান বিক্রেতা বিনোদিনী ও তার সদ্যযুবতী ভাইজি নিশিলতার। মেলার করুণ অভিজ্ঞতা তাকে দীর্ণ করে। তীক্ষ্ণধী স্রষ্টা তার মননে নিশি-র অন্তর্বাস্তবের অনবদ্য মূলটিকে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন।

'নিশিলতা' উপন্যাসে নিশি ও গোবরা নির্মম একাকীত্বের শিকার। সংকটের তীব্রতার পরিবেশে চরিত্রগুলির অন্তর্বাস্তব থেকে উঠে আসে বিপন্ন অস্তিত্বের অসহায় ক্রন্দন। তাদের আত্মা কাফকা কথিত 'Nihilistic fragment' এর তীব্র যন্ত্রণাবোধে পীড়িত। তাই তারা মনে করেছে 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারে না কেউ। যে মানুষ-মানুষীর দল নিজেদের গভীরতম সংকটময় দুটি সত্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে- গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা তো নিশ্চিতভাবেই জীবন প্রেমিক। শব্দ দিয়ে আঁকা হয়েছে, তা যেন রসঘন হয়ে ছবি মুছে গিয়ে দৃষ্টিতে পরিণত হয়। সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতায়

ছবি এঁকে সংগীতের রণনে তুলে আনলেন নিশির অন্তর্বাস্তবকে।

সিরাজের শহুরে জীবনবোধ সম্পর্কিত উপন্যাসগুলির দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। এখানে সব থেকে প্রথমে যে উপন্যাসের নামটি মনে আসে সেটি প্রেম-ঘৃণা-দাহ; যার পরিবর্তিত নাম 'লাল নক্ষত্র'। এই উপন্যাসের প্রথমেই পাই চারটি মহিলার কথা—রুচি, অশ্রু, বিবি বা বৈজয়ন্তী ব্যানার্জী এবং ঋতু। "রুচির বয়সের গাছপাথর নেই।"[৯] ঋতু মুসলমানের মেয়ে, অশ্রু অর্থাৎ অশ্রুকণা সহকার খ্রিস্টানের মেয়ে। কিন্তু সে মাথার কাচে যিশু বা মেরির ছবি রাখে না, গির্জায় যায় না। অশ্রু নরম ও চাপা স্বভাবের। কেউ কখনো ওকে ভারি বা ভিজে মুখে দুঃখিত হতে দেখেনি। এই চারটি চরিত্রে অন্তর্বাস্তবে রয়েছে নবপদ্ধতি বিন্যাস ঋতু আর রুচি আঁচ করে "ওর পেছনের জীবনে কিছুটা রহস্য আছে।"[১০] "আবার ঋতু বা অশ্রুও ভাবে রুচির পেছনের জীবনটা যত স্বপ্নপরিসর হোক, তা কোনো সাংঘাতিক রহস্যে ভরা। কিন্তু তারা কেউ-ই সেটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাদের মনে হয় "সবার সব রহস্যের চাবিকাঠি বিবির হাতে। যেন বিবি সবই জানে...বিবির ভূমিকা যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মতো।"[১১] তাই রুচির অনুভব "বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তার বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে। অত সুন্দর করে কেউ কথা বলতে জানে না, কেউ অমন সুখে কিংবা দুঃখে বাঁচতেও জানে না। রুচি তার আঠারো বছরের জীবনে—যে জীবন অনেক পোড়খাওয়া, অনেক গোপন কদর্যতার ক্ষত চিহ্নে ভরা—এমন মানুষ দেখেছি। রুচির এত বল এসেছে বুকে, এত সুখ!"[১২] রুচি এই তিনজনের থেকে অন্তত এনাটমির ক্ষেত্রে সুন্দর। বিবির ঝলমলে রং, একরাশ আলুথালু চুল, ছন্দিত শরীরি-রুচির পাশে ফ্যাকাশে লাগে । "এই মহিলা মেসে রুচি একটা শান্ত সৌন্দর্য।"[১৩]

উপন্যাসের এই চারটি চরিত্রের মধ্যে রুচি, অশ্রু আর ঋতুর চিন্তা স্রোতধারাই ঘটনা গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'স্ট্রিম অফ কনশাসনেস'-এর অবাধ যাতায়াত এখানে। তাই অশ্রুর নিভৃত অবচেতন স্তরের মানস-কূটগুলি ক্রমশ ফুটে ওঠে-রুচির চাকরিটা অশ্রু খুব ভালো মনে করে না। যেমন সে বরাবর রুচিকেও খুব একটা নির্ভেজাল মেয়ে মনে করে না। আবার সে ভাবে "রুচি যখন বাসায় থাকে, তখন তার মধ্যে একটা কেমন যেন বিষন্নতা, বালিকাসুলভ ছন্দ আর অসহায়তার আমেজ থাকে যা-রুচির সাতখুন মাফ করত ওস্তাদ।"[১৪] এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে চরিত্রগুলি আলোড়িত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

অশ্রু কেবলই ভাবে, সে আর টিউশনি করবে না। তার মতো হিসেবি মেয়ের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয়। আবার পরমুহূর্তেই তার অনুভব-"কঠিন নয়-কিন্তু...কিন্তু তারপর ? জীবনে তার পরেরটা কি ?...কোথায় পৌছতে চায় সে। একইরকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে অর্থাৎ নিচক বেঁচে থেকে ? তবে পৌছবার একটা জায়গা কেন সে খুঁজে পাচ্ছে না ?"[১৫] মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, নিরাপত্তার অভাব থেকেই অশ্রু গড়ে নিয়েছে স্বপ্ন-অবচেতনা-অনুভবের একটা অন্যভুবন। কখনো তার মনের

অন্দরমহলে ভেসে ওঠে, "সে একটা ছোট্ট পোকার মতো এক জয়গা আটকে থেকে এই স্ফীতি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছে।"[১৬] তখন ফ্রানৎস কাফকার মেটামরফসিস-এর কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে অস্বস্তিকর এক স্বপ্ন দেখে ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে গ্রেগর সামস্যা দ্যাখে সে একটা বিশাল কীটে পরিণত হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়, আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' অশ্রুর 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' খেলা করে।

ঋতুর একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতার বীজ তার চরিত্রের অন্দরমহলেই সম্ভাবিত ছিল। সে ভেবেছে—"তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব ? সে যদি হিন্দু মেয়ে হত, তাহলে কি প্রচুর গভীরতার সঙ্গী পেত তাকে ভালোবাসার মতো ? হিন্দু-মুসলমান কোনো পুরুষই ঋতুর বিদ্রোহী ভাবটা মেনে নিতে পারেনি। তারাও যেন বলতে চেয়েছে, ঋতু, তুমি নিজে মুসলমান মেয়ে। এতখানি তোমার সাজে না! স্মৃতিপ্রবাহ ও চেতনাপ্রবাহ বেয়ে নির্বাচিত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মনের নানা স্তরে চলেছে তার অশান্ত অন্বেষণ। ঋতু তাই বলেছে; মানুষ এটা কেন বোঝে না যে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তারপর ধর্ম বা সম্প্রদায় ?"[১৭]

সিরাজ তার সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি কখনো—তিনি জানেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, এক অদৃশ্য জীবনসংগ্রামে আপাত শিথিল গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে ঋতুর মধ্যে এক অখণ্ড জীবনবোধ গড়ে ওঠে। চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাবিহারের আড়ালে নগ্ন হয়ে রইল তার আত্মকথন। তার মনোগহনের জটিল আঁধারে সিরাজ আলো নিক্ষেপ করেছেন—"মনে মনে বিবিদি মিঠে হাসছে নিঃশব্দে এবং স্নেহে, তার উজ্জ্বল মুখে পৃথিবীর ময়লা ও অসুখ-বিসুখের কোন ছায়াই পড়ে না। রুচি...হ্যাঁ, তার পক্ষে সম্ভব। ...রুচি খুব স্বার্থপর টাইপের। মেয়ে, কুচুটে, সারাক্ষণ তার মনে অন্য এক চালাক চতুর মন নিয়ে সে থাকে—কাকেও জানতে দেয় না।"[১৮]

'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি'-ও সিরাজের শহুরে জীবনবোধের আর এক অভিজ্ঞান। এখানে আছে শহরের কথা, নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বোবা অন্ধকারের কথা। স্কুল শিক্ষক ননী আর কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস। এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে উপন্যাসের অন্দরমহলে। মানব চরিত্রের জটিল, অন্ধকার, গুহায়িত রহস্য সম্পর্কে লেখক আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন। উত্তেজক ঘটনার কুশলী বিবরণ, চরিত্র বিন্যাসের সংস্পর্শ, ঘটনার দ্রুতগতি উপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। ননী মানুকে ভালোবেসেও বিবাহের পথে পা বাড়ায়নি। একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার. কিন্তু কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ও অপমৃত্যু ননীকে বাক্যহারা করে দেয়। মানু তার ভাই জনের অপরিণাম দর্শিতায় লজ্জিত হয়ে ননীর পদতলে আশ্রয় নেয়। শুরু হয় তাদের নতুন দিগন্তের অন্বেষণ। ননীর মর্ত্যলোকে আলোড়িত হয় এক অমোঘ সত্য—"সেক্স মানুকে মেরে ফেলে। ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।"[১৯] এই অন্তর কাঠামোর মধ্যে প্রলম্বিত রয়েছে জগৎ ও জীবনের চলার ছন্দ।

লক্ষণীয় এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের নামই দু-অক্ষরবিশিষ্ট—ননী, কৃষ্ণা, মানু, জন। চরিত্রগুলিকে শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখা হয়েছে। হৃদয়ের গভীরে প্রেমের নিগূঢ় আর্তিকেই সিরাজ নিভৃতে পালন করেছেন। সিরাজের উপন্যাসের কুশী-লবেরা তাদের মিথ ও ভাবনার জগতে বাস করে। তাই গভীর অন্তর্বাস্তব এবং মনস্তত্ত্বিকতার অন্দরমহলে সিরাজের সহজ অভিসার যাত্রা।

লড়াকু গ্রামবাংলার অগ্নি ঈগল উড়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু তাদের পাখার ঝাপটা। পথের বাঁকে ও মোড়ে বিশ্বাসের বালি-ইঁটের শহিদ স্তম্ভ ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে। তবু আজও সিরাজের গ্রাম ও নগরের চরিত্রেরা অস্তিত্বের গভীর থেকে যে জিজ্ঞাসা রেখে যায় তা দুর্মর। পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে তার মোকাবিলা হবেই। কারণ সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি ব্যক্তিমনের ভিড়, অবচেতনের সারাৎসার সেখানে গাঁথা। ভয়, বিষন্নতা, অবসাদের চাপ চাপ ছায়া ঘিরে ধরেছে আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। এই আত্মিক সংকটের চেহারাটাই সিরাজের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র :

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তৃণভূমি', রূপরেখা, পৃ. ৩৮৫।
২. তদেব, : পৃ. ৩৮৬।
৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'বাসস্থান', আনন্দ, ১৯৮৫, পৃ. ১।
৪. তদেব, : পৃ. ২।
৫. তদেব, : পৃ. ৩।
৬. তদেব, : পৃ. ১৪।
৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'অলীক মানুষ', দে'জ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২।
৮. তদেব, : পৃ. ১০১।
৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'প্রেম-ঘৃণা-দাহ', রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭৫, পৃ. ১১।
১০. তদেব, : পৃ. ১২।
১১. তদেব, : পৃ. ১৩।
১২. তদেব, : পৃ. ২।
১৩. তদেব, : পৃ. ১৩.
১৪. তদেব, : পৃ. ৩৬।
১৫. তদেব, : পৃ. ৩৯।
১৬. তদেব, : পৃ. ১১৭।
১৭. তদেব, : পৃ. ৮৫।
১৮. তদেব, : পৃ. ১১৫।
১৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'তৃণভূমি', রূপরেখা, পৃ.